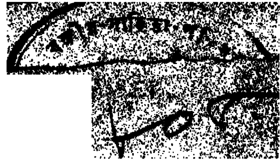
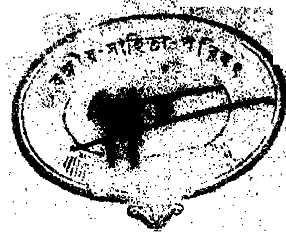
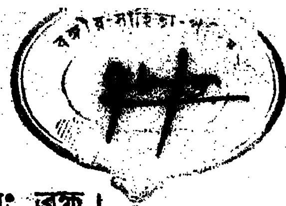





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ



ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক

ত্রৈমাসিক পত্র।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত।

তৃতীয় ভাগ, ১৩০৫।

কলিকাতা

৭৩।১, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, ব্রহ্মতত্ত্ব কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযশোদালাল চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

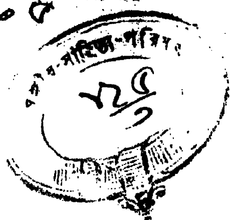
ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

তৃতীয়ভাগের সূচিপত্র।

(বাঙ্গালা প্রবন্ধ।)

(ইংরেজী প্রবন্ধ।)





ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

তৃতীয় ভাগ। প্রথম সংখ্যা।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

হেগেলের ভেদাভেদবাদ।

জর্জ্জ্ উইলহেম্ ফ্রায়েডরিক্ হেগেল ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন অধ্যাপনা ও সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠ শেলিঙের মতাবলম্বী ও সহযোগীরূপে তাঁহার এক সঙ্গে দর্শনপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে দুই জনের মতদ্বৈধ ঘটে। ১৮০৭ সালে তাঁহার প্রথম মৌলিক গ্রন্থ "আত্মার অবস্থা-বিজ্ঞান" প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ সালে তিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ "জ্ঞান-বিজ্ঞান" প্রচার করেন। ১৮১৭ সালে তিনি "দার্শনিক বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থাবলীতে তাঁহার সমগ্র দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ১৮১৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া অবধিই হেগেল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং রাজকীয় সংসারে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হন। উপরি-উক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত হেগেলের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "দর্শনের ইতিবৃত্ত," "ইতিহাস-বিজ্ঞান" ও "ধর্ম্মবিজ্ঞান" প্রধান। ১৮৩১ সালে বিসূচিকা রোগে হেগেলের মৃত্যু হয়।

হেগেল-দর্শনে য়ুরোপীয় অদ্বৈতবাদাত্মক চিন্তা উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক সময়ে সাধারণ দর্শনও হেগেলের হস্তেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদীয় দর্শনতন্ত্র এই কয়েকটী মূল বিভাগে বিভক্ত—(১) জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্তার প্রতিষ্ঠারূপ মূলতত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যা। (২) প্রকৃতি-বিজ্ঞান, (৩) আত্মবিজ্ঞান, অর্থাৎ সামাজিক জীবন, নীতি, ধর্ম্ম,

বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমুদয় বিভাগে মানবাত্মার বিকাশতত্ত্ব। আমরা হেগেল-দর্শনের সমুদয় বিভাগে হস্তক্ষেপ না করিয়া ইহার অন্তর্গত ভেদাভেদ-বাদ ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু বলা আবশ্যক, ততটুকু মাত্র বলিব। আমাদের ব্যাখ্যার সহায় হেগেল-দর্শনের ইংরেজ ব্যাখ্যাকারগণ। ইহাদের বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

জ্ঞানপ্রণালী।—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ঘটিত জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিচারও প্রজ্ঞা এই তিনটী জ্ঞানের উপায় বা অবস্থা। এই তিন উপায় দ্বারা একই বস্তু, এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু, জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু উপায়ভেদে জ্ঞানের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইন্দ্রিয়যোগে বস্তুর যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞান অস্পষ্ট, সে জ্ঞানে বস্তুর প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধ হয় না, অথচ ইহার সমুদায় ভাবই জড়িত আকারে বর্ত্তমান থাকে। বিচারযোগে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ভেদ, আপাত বিরোধ, দৃষ্ট হয়। প্রজ্ঞাযোগে ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে সম্মিলন, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাতেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক বস্তুই এই তিন ভাবে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়-ঘটিত জ্ঞান বস্তুকে স্থূলরূপে স্থাপনা করে, বিচার ইহার আভ্যন্তরীণ ভেদ ও অন্য বস্তুর সহিত ভেদ দর্শন করিয়া এই স্থাপনা খণ্ডন করে। প্রজ্ঞা ভেদ বা বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করে। পাঠক দেখিবেন ফিক্টে * ও হেগেলের জ্ঞানপ্রণালী মূলে একই, তবে হেগেল এই প্রণালীকে বহুল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগদ্বারা বিশদ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রণালীতে দেখা যায় আপাত-বিরুদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যেও মৌলিক একতা রহিয়াছে, সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই দেখিয়া হেগেল "বিরুদ্ধ-সমীকরণ" রূপ মূলসূত্র প্রচার করিলেন। এই "বিরুদ্ধ-সমীকরণ" স্থাপন, খণ্ডন ও সামঞ্জস্য করণাত্মিকা জ্ঞানপ্রণালীর অপর একটী নামমাত্র। ইহার অর্থ এই যে সর্ব্বত্রই ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে সম্মিলন, দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, এই-যে জ্ঞানের ভিতর "বিরুদ্ধ-সমীকরণের" ভাব—স্থাপন, খণ্ডন ও সামঞ্জস্য-করণাত্মক ভাব দেখা গেল, এটা জ্ঞানের প্রকৃতি-সিদ্ধ। জ্ঞান বলিতে এই ভেদাভেদযুক্ত বস্তুই বুঝায়। অন্যবিধ কোন বস্তু, কোন

* ব্রহ্মতত্ত্ব, ২য় ভাগ, চতুর্থ সংখ্যায় আমরা ফিক্টের মত ব্যাখ্যা করিয়াছি।

নিরবচ্ছিন্নরূপে অভেদ নির্ব্বিশেষ বস্তু, জ্ঞান নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানের প্রকাশ যে ভাবেই হউক, জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক, ইহাতে সর্ব্বত্রই যে এই ত্রিবিধ ভাব বর্ত্তমান, হেগেল তাহা নানা প্রকারে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের যে প্রণালী, সত্তারও সেই প্রণালী, কারণ জ্ঞান ও সত্তা একই। হেগেলের মতে জ্ঞান ও সত্তা কেবল মূলে এক নহে, সর্ব্বাঙ্গেই এক। সত্তা জ্ঞানময়ী; থাকা আর জ্ঞানে থাকা একই কথা; জ্ঞানই সত্তা। সুতরাং মানব জীবনে, ব্যক্তিগত মানস জগতে, যে প্রণালী, প্রকৃতিতেও সেই প্রণালী। মানবে জ্ঞানবিকাশের প্রণালী যাহা, প্রকৃতিতে বস্তুবিকাশের প্রণালীও তাহাই। সেখানেও প্রথমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুরূপ অভেদাত্মক স্থূল ভাব, তৎপর বিচারগত জ্ঞানের অনুরূপ ভেদাত্মক ভাব, এবং সর্ব্বশেষে প্রজ্ঞানুরূপ ভেদাভেদাত্মক পূর্ণবিকশিত ভাব। হেগেল প্রকৃতির সমুদয় বিভাগে এই প্রণালীর প্রকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞান।—হেগেলের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচলিত তর্কশাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণবিজ্ঞান নহে। ইহা এই দুই শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ। ইহা সমুদায় বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ মূলতত্ত্ব-বিজ্ঞান। বিষয় যাহাই হউক না কেন, জগতের সকল বিভাগে, বিষয়-নির্ব্বিশেষে, জ্ঞান যে সমস্ত মূলতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়, বিষয় যে সমস্ত সাধারণ ভাব লইয়া জ্ঞানে প্রকাশিত হয়—জ্ঞান ও বিষয়জগতের এই সমস্ত মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন, ইহাই হেগেলের জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত মূলতত্ত্ব কীদৃশ বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। স্থূল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় বস্তু যে ভাবে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট সম্বন্ধের ভাব থাকে না। বস্তুসমূহ পরস্পর হইতে পৃথকভাবে, স্ব স্ব প্রধান ভাবে থাকিতে পারে—ইহাই বোধ হয়। এই অবস্থায়, অস্তি, নাস্তি, গুণ, পরিমাণ, ইত্যাকার ভাবসমূহই বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশঃ বিচারগত জ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার সোপানে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। দেখা যায় বস্তু সমূহের স্বাতন্ত্র্য ভ্রমমূলক, পরস্পরের সম্বন্ধেই ইহাদের অস্তিত্ব। এই অবস্থায় প্রকৃতি ও বিকৃতি, কারণ ও কার্য্য, শক্তি ও প্রকাশ প্রভৃতি মূলতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। অবশেষে দার্শনিক

জ্ঞানের অবস্থায় দেখা যায় এই সকল তত্ত্বও বস্তুব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে; এই সকল তত্ত্বের ভিতরে এমন একটা ভেদ আছে, বিরোধ আছে, যে বিরোধ ভেদাত্মক তত্ত্বসমূহের দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। যথা,—কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে কার্য্য ছাড়া কারণ হয় না, অর্থাৎ কার্য্য ছাড়া কারণের কারণত্ব নাই। কার্য্যের অপেক্ষায়ই কারণের কারণত্ব। সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বস্তুর শেষ ও তৃপ্তিকর মীমাংসা নহে। কার্য্য ও কারণরূপ তত্ত্ব এমন কোন তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট যাহা কার্য্য ও কারণ উভয়রূপে প্রকাশিত অথচ উভয়ের প্রকৃতিগত সসীম ভাবের অতীত, সুতরাং যাহার আর অপর মীমাংসার প্রয়োজন নাই। এই অবস্থাতে একত্ব, বিশেষত্ব, সার্ব্বভৌমিকত্ব, উদ্দেশ্য, জীবন, বিষয়, বিষয়ী প্রভৃতি তত্ত্বের প্রয়োজন হয়। এই শ্রেণীর তত্ত্বসমূহের সর্ব্বোচ্চে আত্মজ্ঞান-রূপ তত্ত্ব বিদ্যমান। এই তত্ত্বে সমুদায় মীমাংসার শেষ হয়, সমুদায় জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়। আত্মজ্ঞানে স্থূল প্রত্যক্ষজ্ঞানগত স্বাধীন অস্তিত্বের ভাব, বিচারগত ভেদের ভাব এবং প্রজ্ঞাগত ভেদাভেদ-সামঞ্জস্যকরণের ভাব, এই তিন ভাবই বর্ত্তমান। আত্মা স্বয়ং ভেদের অতীত অখণ্ড বস্তু, সুতরাং আত্মজ্ঞানই মূলতত্ত্ব সমূহের সর্ব্বমূলতত্ত্ব। এই রূপে হেগেল তদীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে জ্ঞানবস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠন, জ্ঞানের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, এবং যাহার উপর সমুদয় প্রতিষ্ঠিত,—মূলতত্ত্ব মাত্রই যাহার রূপ বা প্রকাশ—সেই আত্মজ্ঞানের ভেদাভেদাত্মক অখণ্ড ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মবাদ।—বিষয়-বিষয়ী পরস্পর হইতে ভিন্ন অথচ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। বিষয়ীর সহিত ভেদেই বিষয়ের বিষয়ত্ব, এবং বিষয়ের সহিত ভেদেই বিষয়ীর বিষয়িত্ব। বিষয়-তত্ত্বের ভিতরে বিষয়ীর সহিত ভেদ নিহিত, বিষয়ি-তত্ত্বের ভিতরে বিষয়ের সহিত ভেদ নিহিত। "বিষয়" অর্থ যাহা বিষয়ী নহে; "বিষয়ী" অর্থ যাহা বিষয় নহে। এই ভেদেই প্রত্যেকের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই ভেদ সম্বন্ধব্যঞ্জক। বিষয় বিষয়ী নহে, এবং বিষয়ী বিষয় নহে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষা রাখে। বিষয়ীর অপেক্ষায়ই বিষয় বিষয়, এবং বিষয়ের অপেক্ষায়ই বিষয়ী বিষয়ী।

বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধবিহীন বিষয় অর্থহীন। তেমনি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-রহিত বিষয়ী অর্থহীন,—জ্ঞেয়ের সহিত সম্বন্ধ-রহিত জ্ঞাতা অর্থহীন। বিষয়কে কোন জ্ঞানের বিষয় হওয়া আবশ্যক; বিষয়ীকে কোন জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা হওয়া আবশ্যক; সুতরাং বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভেদ ও সম্বন্ধের মূল কি? এই যোগ-বিয়োগের সামঞ্জস্য কিরূপে হইল? ইহা সম্ভব হইল এই জন্য যে বিষয়ী এই ভেদের এক দিক্ হইয়াও আবার ইহার অতীত। ইহা কেবল যে আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়কে জানে, তাহা নহে; ইহা বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন অথচ বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া জানে, আপনাকে বিষয়ের জ্ঞাতারূপে জানে। বিষয়ীর এই ভেদাতীত আত্মজ্ঞান থাকাতেই উক্ত ভেদ ও সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিষয়ী এবং জ্ঞাতা বিষয়-বিষয়ীভেদের একদিক্ মাত্র নহে, ইহা এই ভেদের অতীত, এই সীমার অতীত; ইহা অসীম অথচ সীমার হেতু ও আশ্রয়। আপাততঃ বোধ হয় জগৎ ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য বিষয় ও বিষয়ীতে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃও এই ভেদ অস্বীকার্য্য নহে, বিষয় ও বিষয়ি-জগৎ অসংখ্য সসীম বস্তুর আধার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অসংখ্য সসীম বস্তুর মূলে এক অসীম বস্তু বর্ত্তমান। বিষয়মাত্রই বিষয়ীর সহিত সংবদ্ধ এবং বিষয়ীমাত্রেরই ভিতর দিয়া এমন এক বস্তু প্রকাশ পাইতেছেন যিনি বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধের নিদান, এবং বিষয়-বিষয়ীর সীমার অতীত। মানবের শরীর যেমন সসীম, মানবের মানসবিকারও তেমনি সসীম এবং ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। কিন্তু তাহাতে যে বস্তু থাকাতে সে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ জানিতে পারে, সে বস্তু ভেদের অতীত, সীমার অতীত, অথচ সমুদায় ভেদ ও সীমার হেতু ও আশ্রয়। এই সর্ব্বাশ্রয় অথচ সর্ব্বাতীত বস্তুই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে হেগেল এক স্থানে বলিয়াছেন, "ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, যেহেতু তিনি পূর্ণরূপে সর্ব্বব্যাপী বস্তু; (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান, যেহেতু তিনি সমস্ত উৎপাদন করেন এবং সমুদায়ের মধ্যে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করেন। অথবা তিনি বিশ্বের নিত্য স্রষ্টা। (৩) তিনি জ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু তাঁহার শক্তি পবিত্র শক্তি। (৪) তিনি মঙ্গলস্বরূপ, যেহেতু তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (৫) তিনি

ন্যায়স্বরূপ, যেহেতু তিনি প্রত্যেক বস্তুকে অনন্তের সহিত পুনর্ম্মিলিত করেন। ("প্রপিডিউটিক," ৭৫ পৃঃ। ডাঃ হাচিসন্ ষ্টার্লিংকর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত।)

স্পিনোজা ও শেলিঙের সহিত প্রভেদ।—স্পিনোজা ও শেলিঙের অদ্বৈতবাদের সহিত হেগেলের ভেদাভেদবাদের বিশেষ প্রভেদ আছে। উক্ত দার্শনিকদ্বয় ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অভেদ ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপ অভেদ নির্ব্বিশেষ বস্তু হইতে জগতের অসংখ্য ভেদ ও বিশেষত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল এই প্রশ্নের পরিষ্কার বিচার তাঁহাদের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্পিনোজার অভেদ ব্রহ্মবাদ এবং ব্রহ্মের আরোপ-লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি *, পাঠক এ স্থলে তাহা পুনরায় পাঠ করিলে স্পিনোজা-দর্শন ও হেগেল দর্শনের মৌলিক প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। স্পিনোজার অভেদবাদের দোষসমূহ হেগেলের ভেদাভেদবাদে ক্ষালিত হইয়াছে। ভেদপ্রত্যয় যে মানবীয় দুর্ব্বলতা ও ভ্রমের ফল নহে, ভেদের মূল যে পরমাত্মাতেই বর্ত্তমান, নিরপেক্ষ পূর্ণ ভেদ ভ্রমমূলক হইলেও আপেক্ষিক আংশিক ভেদ যে সত্য এবং তাহা অভেদের বিরুদ্ধ নহে, এই কথা হেগেল-দর্শনে পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে। এরূপ আপেক্ষিক ভেদের মূল যখন পারমার্থিক, ব্রহ্মগত, তখন অদ্বৈত ব্রহ্মের সৃষ্ট জগতে ভেদের অস্তিত্ব আর রহস্য নহে। তৎপর, অসীম ও সসীমের, ব্রহ্ম ও জীবের ভেদাভেদ প্রদর্শন করিয়া হেগেল নীতি ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ কোন ক্রমেই এই প্রশংসার উপযুক্ত নহে।

নীতিবিজ্ঞান।—অসীম ইচ্ছার সহিত সসীম ব্যক্তিগত ইচ্ছার যোগই পুণ্য। সসীমের পক্ষে অসীমের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই পাপ। সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত মঙ্গল, সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলের বিপক্ষে ব্যক্তিগত সুখ অন্বেষণই অমঙ্গল। ঈশ্বর স্বাধীন পুরুষ। প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ যোগে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যোগে আবদ্ধ, সুতরাং জগতের কুত্রাপি স্বাধীনতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার মূলহেতু পরমেশ্বর। পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ

* ব্রহ্মতত্ত্ব, ২য় ভাগ ৩য় সংখ্যায়।

ঘটনাবলীর প্রত্যেকেই তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতির প্রকাশ। সুতরাং আপাততঃ যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয় তাহার মূল স্বাধীনতা। মানব সেই ঐশী স্বাধীনতার ভাগী। এই স্বাধীনতার ভাগী বলিয়াই সে সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম, প্রবৃত্তির প্রভাবাতিক্রমে সক্ষম। যে যে-পরিমাণে ঈশ্বরানুকরণে, সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলসাধনে, নিজ শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই তাহার নিজ মঙ্গল, তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি। ঈশ্বর নিজ জীবনকে, নিজ জ্ঞান শক্তিকে, অসংখ্য ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, অসংখ্য জীবনে আত্মদান করিয়াছেন। মানব যে পরিমাণে এইরূপ আত্মত্যাগ, আত্মদান করিতে পারে, সেই পরিমাণেই তাহার প্রকৃত পক্ষে আত্মলাভ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিষয়-জগৎ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা প্রকৃত আত্মত্যাগ নহে, আত্মদান নহে। এরূপ চেষ্টা নিষ্ফল, নিরর্থক। ব্যক্তিগত বাসনা, ব্যক্তিগত সুখানুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত জগতের সহিত এক হইবার চেষ্টা, সাধারণ মঙ্গলকে নিজ মঙ্গলরূপে আলিঙ্গন ও তদনুসরণ,—ইহাই প্রকৃত আত্মদান, এবং ইহাতেই প্রকৃত আত্মলাভ। ইহাই "জীবনোদ্দেশে মরণ" এই খৃষ্টীয় মূলসূত্রের প্রকৃত অর্থ।

খৃষ্ট ধর্ম্ম।—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত্রিনীতিবাদ—পিতা, ও পুত্র পবিত্রাত্মার ভেদ ও অভেদ, বিরুদ্ধ-সমীকরণরূপ মূলতত্ত্বের স্থূল লৌকিক আকার মাত্র। পিতারূপী ঈশ্বর প্রত্যক্ষজ্ঞানগত মূল বস্তু যাহাতে জগতের সমুদয় বিচিত্রতা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান। পুত্ররূপী ঈশ্বর সসীম অসীমের ভেদাবস্থা, বিচার-গোচর ভেদাত্মক জগৎ। পবিত্রাত্মারূপী ঈশ্বর ভেদ-নিরাসক অথচ ভেদের আশ্রয়ীভূত পূর্ণ বস্তু। পুনশ্চ, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথমাবস্থায় স্পষ্ট ভেদোদ্গম নাই, উপাস্য উপাসকে বিরোধ নাই, অবিরোধ প্রাকৃতিক উপাসনা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়াবস্থায় পাপবোধ ও তজ্জনিত বিরোধ,—ভেদবোধ। তৃতীয়াবস্থায় জ্ঞান ও প্রেমের পরিপকতা প্রযুক্ত পুনর্মিলন, শান্তি। এ স্থলেও ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ,—ত্রিনীতি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে এই ত্রিবিধ প্রকাশ স্বীকৃত হওয়াতে ইহাই পূর্ণতম ধর্ম্ম।

অমরত্ব।—ডাঃ হাচিসন ষ্টার্লিঙের মত এই যে হেগেল জীবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ কেহ এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে

ষ্টার্লিঙ্ সাহেব তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য হেগেলের মূল গ্রন্থাবলীর ১৭শ খণ্ডের ২২৬ পৃষ্ঠা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেগেল-দর্শনের একজন প্রতিবাদকারী তদীয় দর্শনে এই মত দেখিতে পান নাই, এই কথা বলাতে হেগেল বলিয়াছেন—"ইহা কি সত্য নহে যে এই দর্শনে আত্মাকে মৃত্যু বিনাশ প্রভৃতি-ঘটিত তত্ত্ব-সমূহের অতীত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তার পর অন্যান্য তত্তুল্য স্পষ্ট উক্তি সমূহের ত কথাই নাই।" তৎপর ষ্টার্লিঙ্ সাহেব হেগেলের নিম্নলিখিত অমরত্ব-ব্যঞ্জিকা উক্তি সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন,—"মৃত্যুরূপ অসত্য," "শরীরের মৃত্যুতে আত্মার জন্ম," "মৃত্যুকালে আত্মা প্রকৃত বস্তু এবং সংসারে সংগৃহীত বস্তুর ভার আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে" ইত্যাদি। হেগেল-কৃত "ধর্ম্মদর্শন" নামক গ্রন্থস্থিত পরকাল-বিষয়িণী আলোচনাও এই বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

ইংলণ্ড ও যুক্ত রাজ্যে হেগেল-দর্শনের প্রভাব।—বিগত কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কোন প্রকার অদ্বৈত মত কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইদানীন্তন সময়েও ইংলণ্ডের কোন অদ্বৈতবাদী য়ুরোপ খণ্ডে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। এই জন্য তত্রত্য অদ্বৈতবাদ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার উপযুক্ত নহে। তবে এ দেশের সহিত ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং ইংরেজ লেখকগণের প্রসাদেই আমরা য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মত অবগত হইয়াছি এবং হইতেছি এই কারণে তথাকার অধুনাতন অদ্বৈতবাদিগণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। বক্ষ্যমাণ অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই হয় হেগেলের শিষ্য না হয় তাঁহার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত, সুতরাং এ স্থলে তাহাদিগের বিষয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অদ্বৈতবাদিগণ প্রধানতঃ কাণ্ট ও হেগেলের ব্যাখ্যায়ই নিযুক্ত। ইঁহাদের প্রণীত অধিকাংশ গ্রন্থ ব্যাখ্যাময়। কিন্তু কেহ কেহ অল্প সংখ্যক মৌলিক গ্রন্থও লিখিয়াছেন। আমরা প্রথমে মৌলিক গ্রন্থ গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া তৎপর প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা গুলির উল্লেখ করিব।

১। "ধর্ম্ম-দর্শনের উপক্রমণিকা" (ইন্‌ট্রডক্‌সন্ টু দি ফিলসফি অব্ রিলিজিয়ন্)—অধ্যক্ষ যহন্ কেয়ার্ড্ সাহেব-প্রণীত। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও এক খানি সুলিখিত গ্রন্থ।

২। "নীতিবিজ্ঞানালোচনা"।—("এথিক্যাল্ ষ্টাডিজ্) এফ্, এচ্, ব্র্যাড্লী-প্রণীত। ইহাতে হেগেল-প্রবর্ত্তিত নীতিবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সেই ভূমি হইতে অন্যান্য নীতি-বিজ্ঞানের সমালোচনা আছে। শেষ ভাগে আধ্যাত্মিক সাধন-তত্ত্বেরও আভাস আছে।

৩। "জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা।"—(ষ্টাডিজ্ ইন্ লজিক্) উপরি-উক্ত লেখক-প্রণীত। ইহা এক খানি গভীর গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪। "প্রাতিভাসিক সত্তা ও প্রকৃত সত্তা"।—("য়্যাপিয়ারেন্স্ য়্যাণ্ড্ রিয়া-লিটি) উপরিউক্ত লেখক-প্রণীত। এই পুস্তক অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লেখক হেগেলীয় মত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া বেদান্ত-মতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্তদর্শনের নিকট কোন ঋণ স্বীকার করেন নাই। পুস্তকের প্রথমাংশে প্রকৃত সত্তা স্ববিরোধাতীত, এই মূলসূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেশকালগত বস্তু সম্বন্ধীয় আমাদের যাবতীয় ধারণা স্ববিরোধিতা-দোষে দূষিত, সুতরাং সমুদয় জগৎ, সসীম আত্ম-জগৎ পর্য্যন্ত, প্রাতিভাসিক; কিছুরই প্রকৃত সত্তা নাই। দ্বিতীয় অংশে (১) অনন্তের অস্তিত্ব, (২) অনন্তের স্বরূপলক্ষণ, (৩) অনন্তে সসীমের অভেদ ভাবে স্থিতি, (৪) সগুণ ব্রহ্মভাবের আপেক্ষিক সত্য, (৫) নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (৬) অমরত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু হেগেলের ন্যায় সেই জ্ঞানকে ভেদযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মের জ্ঞান সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক ও ভেদশূন্য; ভেদ কেবল সসীম জ্ঞানেই আছে। তিনি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। জগতের দুঃখরাশি ব্রহ্মের আনন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া আছে যে, তাহা আর দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরভাব সম্বন্ধে আমাদের যে অভ্যস্ত ধারণা, তাহা লেখকের মতে অপরিহার্য্য এবং সাধারণের অন্যান্য ধারণা অপেক্ষা সত্যতর, সুতরাং দৈনন্দিন কার্য্যে অপরিত্যাজ্য। লেখক নীতি ও আধ্যাত্মিক ভাবযোগে ধর্ম্মসাধন, এমন কি ঈশ্বরের সহিত একতা-সাধন, অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অমরত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। "নীতিবিজ্ঞানের মূল-সূত্রাবলী"।—(প্রোলেগোমেনা টু এথিক্স্) টমাস হিল্ গ্রীণ-প্রণীত। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রথমাংশে হেগেলীয় ভেদাভেদাত্মক অদ্বৈতবাদ সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াংশে নীতির দার্শনিক ভিত্তি ও নৈতিক জীবনের বিকাশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৬। "ধর্ম্মের বিকাশ"।—(ইবলিউসন্ অব্ রিলিজিয়ন্) এড্বার্ড্ কেয়ার্ড্-প্রণীত। ইহাতে হেগেলীয় মূল-সূত্রানুসারে প্রধান প্রধান ধর্ম্মতন্ত্রের বিকাশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৭। "দর্শনের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দিক্"।—(রিলিজিয়স্ য়্যাস্পেক্ট্ অব্ ফিলসফি") যুক্তরাজ্যবাসী জোসিয়া রয়স্-প্রণীত।

৮। উক্ত রাজ্যবাসী জে, ডিউই-প্রণীত মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ।

৯। নীতিবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা"।—(এলিমণ্ট্স্ অব্ এথিক্স্) এইচ্ মূরহেড্-প্রণীত।

হেগেল-দর্শনের ব্যাখ্যা অথবা হেগেল-দর্শনের ভূমি হইতে মতান্তরের সমালোচনাযুক্ত ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান ঃ—(১) জেম্স্ হচিসন্ ষ্টারলিং-কৃত "সিক্রেট্ অব্ হেগেল" ও (২) "টেক্স্ট্বুক্ টু কাণ্ট্", (৩) টমাস হীল গ্রীণের গ্রন্থাবলী, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ (৪) এড্বার্ড কেয়ার্ড-কৃত "ক্রিটিক্যাল্ ফিলসফি ও কাণ্ট্", (৫) ওয়াট্সন্-কৃত "কাণ্ট্ য়্যাণ্ড্ হিজ্ ইংলিশ্ ক্রিটিক্স্" (৬) ওয়ালেস্-কৃত "প্রোলেগোমেনা টু হেগেল্স্ লজিক্"। (৭) এডবার্ড্ কেয়ার্ড্-কৃত "হেগেল"। এতদ্ব্যতীত বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে হেগেল-প্রণীত গ্রন্থাবলীর প্রায় সমুদায়েরই ইংরেজী অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সমুদায়ের বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক টমাস্ কারলাইল্ এবং যুক্তরাজ্যের পরম শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার র‍্যাল্ফ্ ওয়াল্ডো এমারসন্ অদ্বৈত মতাবলম্বী। ইঁহারা হেগেল-কর্ত্তৃক কতদূর প্রভাবিত বলা যায় না। কিন্তু জর্ম্মণ্ চিন্তার সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা দার্শনিকভাবে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের প্রণীত প্রবন্ধাদি দ্বারা অদ্বৈত মত সরল ও বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এইজন্য সংক্ষেপে ইঁহাদের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক।—পক্ষান্তরে তাহা কি যাহা সর্ব্বদাই আছে? "অবিনাশি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। 'অবিনাশি' অর্থাৎ বিনাশ যাহার স্বভাব নহে। 'তু' শব্দ সৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তদ্বিদ্ধি' তাহাকে জানিবে। কাহাকে জানিবে, না—যে সৎ-নামক ব্রহ্মদ্বারা এই সমস্ত জগৎ 'তত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত আছে, যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ তাহাদের সংশ্লিষ্ট আকাশ সহ মহাকাশদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। 'বিনাশ' অর্থাৎ অদর্শন, অভাব। (কাহার অভাব?)—এই অব্যয়ের—যাহার ব্যয় হয় না, উপচয় অপচয় প্রাপ্তি হয় না, যিনি অব্যয়, তাঁহার অভাব। এই সৎনামক ব্রহ্মের নিজ রূপের কোনও ব্যয় হয় না, অর্থাৎ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, যেহেতু তিনি দেহাদির ন্যায় অবয়বযুক্ত নহেন। তাঁহার আত্মীয় কোন বস্তু সম্বন্ধেও তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় না, যেহেতু তাঁহার আত্মীয় কিছু নাই। যেমন, দেবদত্ত ধনহানি বশতঃ বিচলিত হন, ব্রহ্ম সেরূপে পরিবর্ত্তিত হন না। অতএব এই অব্যয় ব্রহ্মের কেহই বিনাশ করিতে পারে না। কেহই আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না। ঈশ্বরও পারেন না, যেহেতু আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মবিনাশ অসম্ভব এইজন্যও বটে যে, নিজ আত্মাতে নিজে ক্রিয়া করা স্ববিরুদ্ধ ব্যাপার।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক।—পক্ষান্তরে সেই অসৎই বা কি যাহা নিজ সত্তাকে পরিবর্ত্তিত করে? 'অন্তবন্ত' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাহা বলিতেছেন। 'অন্ত' অর্থাৎ বিনাশ আছে যাহাদের তাহারা অন্তবন্ত, যেমন মৃগতৃষ্ণিকাদিতে উৎপন্না সৎবুদ্ধি প্রমাণ নিরূপণান্তে বিনষ্ট হয়; সেই বিনাশই তাহার অন্ত; সেই প্রকার, নিত্য, শরীরী অর্থাৎ শরীরবান্, অনাশী, অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণা-গোচর আত্মার এই সমস্ত স্বপ্ন-মায়াদির ন্যায় দেহ বিবেকিগণকর্ত্তৃক অন্তবন্ত অর্থাৎ বিনাশশীল বলিয়া উক্ত হয়। 'নিত্য ও অনাশী', এরূপ বলাতে পুনরুক্তি হয় নাই। কারণ সংসারে নিত্যত্ব এবং নাশ দুই প্রকার। যেমন দেহ ভস্মীভূত

হইয়া অদর্শন প্রাপ্ত হইলে ইহা নষ্ট হইয়াছে বলা হয়; আর যেমন বিদ্যমান থাকিলেও যদি রোগাদিযুক্ত হইয়া অন্য প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও লোকে তাহাকে নষ্ট বলে। এস্থলে 'অনাশী' এবং 'নিত্য' এই দুই বিশেষণদ্বারা এই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার অর্থাৎ এই আত্মার উভয় প্রকার নাশের সঙ্গে অসম্বন্ধ। তাহা না হইলে বলা যাইতে পারিত যে আত্মা পৃথিব্যাদির ন্যায় নিত্য; যাহাতে এই আপত্তি না হইতে পারে সেই জন্য বলিয়াছেন আত্মা নিত্য এবং অনাশী। অপ্রমেয় কি? না, যাহা প্রমেয় নহে অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ আয়ত্ত নহে। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে আত্মাকে আগম দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়, তাহার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও আত্মা পরিচ্ছেদ্য। না—তাহা নহে, কারণ আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। প্রমাণ-কর্ত্তাতে আত্মা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত থাকাতেই প্রমাণান্বেষণকারীর পক্ষে প্রমাণান্বেষণ সম্ভব হয়। "ইহাই আত্মা", ইহা পূর্ব্বে না জানিয়া কেহ প্রমেয় আত্মাকে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মা কাহারও অজ্ঞাত নহেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শেষ প্রমাণ যে শাস্ত্র, তিনিও, আত্মাতে যে সমুদয় অনাত্ম-ধর্ম্ম আরোপিত হয় কেবল তাহারই নিবর্ত্তনদ্বারা আত্মার প্রমাতৃত্ব প্রতিপাদন করেন; অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপন দ্বারা নহে। (আত্মাকে জানিবার জন্য শেষ প্রমাণ শাস্ত্র। যদিও শেষ প্রমাণ শাস্ত্র, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে আত্মা কি নহেন, তাহা মাত্র জানাইয়া দেন, আত্মা যে আছেন এই জ্ঞান আমাদিগকে দেন না। এই জ্ঞান আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। আমরা ভ্রমবশতঃ যে সমুদয় কাল্পনিক গুণ আত্মাতে আরোপ করি, শাস্ত্র তাহা দূর করিয়া দিয়া তাঁহার স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করেন।) এই বিষয়ে শ্রুতি এই বলেন "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা।" যেহেতু আত্মা এই প্রকারে নিত্য এবং অবিক্রিয়, সেই জন্য যুদ্ধ কর, যুদ্ধ হইতে বিরত হইও না। ভগবান্ এখানে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন নাই। তিনি অর্থাৎ অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবান্ তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিবন্ধের অপনয়ন মাত্র করিয়াছেন। অতএব "যুদ্ধ কর" ইহা অনুবাদ মাত্র, ইহা বিধি নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক।—গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য শোক-মোহাদি সংসার-কারণ নিবৃত্ত করা, কার্য্যে প্রবৃত্ত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই কথা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের সম্মুখে দুটী মন্ত্র আনয়ন করিলেন। (১৯শ এবং ২০শ শ্লোক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে।) তুমি যে মনে কর যে, যুদ্ধে ভীষ্মাদি তোমাকর্ত্তৃক হত হইবেন এবং তুমি তাহাদের হনন কর্ত্তা হইবে, তোমার এই প্রকার বুদ্ধি মিথ্যা; কি প্রকারে মিথ্যা? 'য এনং' ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতেছেন। যিনি এই প্রকরণস্থ অর্থাৎ উল্লিখিত দেহীকে অর্থাৎ আত্মাকে হন্তা অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানেন; এবং অন্য যিনি আত্মাকে হত মনে করেন, দেহহনন-দ্বারা আত্মা হত অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ম্মভূত বলিয়া জানেন, তাঁহারা উভয়েই আত্মাকে জানেন না। অবিবেকবশতঃ যাঁহারা আত্ম-প্রত্যয়-বিষয়ীভূত আত্মাকে "আমি হনন কর্ত্তা" এবং "আমি হত" অর্থাৎ দেহহনন-দ্বারা "আমি হত হই" এরূপ মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই আত্ম-স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ জানেন না; যেহেতু আত্মার অবিক্রিয়ত্ব বশতঃ অর্থাৎ আত্মার পরিবর্ত্তন না থাকা হেতু এই আত্মা হনন করেন না, হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন না, এবং হতও হয়েন না, হনন ক্রিয়ার কর্ম্মও হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০শ শ্লোক।—আত্মা কি প্রকারে অবিক্রিয় তাহা 'ন জায়তে' ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা বলিতেছেন। আত্মার জন্ম অর্থাৎ উৎপাদন নাই। জন্মরূপ যে বস্তুর পরিবর্ত্তন তাহা আত্মার নাই। এবং সেই প্রকার তিনি মরেনও না। এ স্থলে 'বা' শব্দ 'এবং' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মরেনও না' ইহাতে শেষ বিনাশরূপ যে মৃত্যু তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। 'কদাচিৎ' অর্থাৎ কখনও শব্দটী সমুদয় বিক্রিয়া-প্রতিষেধের সঙ্গেই সংযোগ করিতে হইবে; যথা, কখনও জন্মেন না, কখনও মরেন না ইত্যাদি। যেহেতু আত্মা হইয়া, ভবন ক্রিয়া অনুভব করিয়া, পরে আবার অভাব প্রাপ্ত হন না, সেই হেতু তিনি মরেন না। যে হইয়া অভাব প্রাপ্ত হয় লোকে তাহারই মৃত্যু হয় বলে। বা শব্দ এবং ন শব্দ দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, আত্মা দেহের ন্যায় একবার হইয়া পুনরায় অভাবগ্রস্ত হন না, অতএব জন্মেন

না। যাহা না হইয়া হয় অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না এখন হইল তাহা-কেই লোকে জন্মিয়াছে বলে। আত্মা এই প্রকার নহেন, অতএব তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না। যেহেতু এই প্রকার, সেই জন্য তিনি অজ; যেহেতু তিনি মরেন না সেই জন্য তিনি নিত্য। যদিও আদ্যন্ত বিক্রিয়ার প্রতিষেধদ্বারা সমুদয় বিক্রিয়ার প্রতিষেধ সূচিত হইয়াছে অর্থাৎ যখন আত্মার জন্ম পরিগ্রহণ ও মৃত্যু নাই তখন তাঁহার আর কোনও প্রকারে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সম্ভব নহে, তথাপি মধ্যভাবী বিক্রিয়াসমূহের অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়ের বিক্রিয়াসমূহের প্রতিষেধ সেই সেই অর্থ-প্রকাশক নিজ নিজ শব্দদ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ে অনুক্ত যৌবনাদি সমস্ত বিক্রিয়ার প্রতিষেধ যাহাতে হইতে পারে, 'শাশ্বত' ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহা বলিতেছেন। 'শাশ্বত', ইহা-দ্বারা অপক্ষয়-লক্ষণা বিক্রিয়ার প্রতিষেধ হইতেছে অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বকালে একরূপ, তাঁহার ক্ষয় কখনও হয় না। 'শশ্বৎ ভব' অর্থাৎ সর্ব্বকালে আছেন যিনি, নিরবয়বত্ব ও নির্গুণত্ব হেতু তাঁহার নিজ স্বরূপের কোনও প্রকার ক্ষয় হয় না। গুণের ক্ষয়েই অপক্ষয়, অপক্ষয়ের বিপরীত বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া; 'পুরাণ' এই কথাদ্বারা তাহার প্রতিষেধ হইতেছে, অর্থাৎ 'পুরাণ' এই কথা দ্বারা বুঝাইতেছে যে আত্মার বৃদ্ধি হয় না। অবয়বের আগমদ্বারা যাহার উপচয় হয়, সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অভিনবও বলে; এই আত্মা নিরবয়বত্ব বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই নব, অতএব পুরাণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। সেই প্রকার তিনি অন্যকর্ত্তৃক বিপরিণমনও প্রাপ্ত হন না; শরীর নষ্ট হইলেও তাঁহার কোনও বিক্রিয়ত্ব প্রাপ্তি হয় না। 'হন্তি' এই ক্রিয়ার উল্লেখে পুনরুক্তি হয় নাই, যেহেতু ইহা বিপরিণামার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আত্মা বিপরিণত হন না, ইহাই অর্থ। এই মন্ত্রদ্বারা ষড়্‌ভাববিকাররূপ যে সাংসারিক বস্তুবিক্রিয়া, সেই সমস্ত আত্মার সম্বন্ধে প্রতিষেধ করিতেছেন। আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত ইহাই বাক্যার্থ। যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু 'উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ'—পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ইহার এই সম্বন্ধ।

রামমোহনরায়-চতুষ্পাঠ্যাঃ কস্যচিচ্ছাত্রস্য।

মুক্তি ও অনন্ত উন্নতির সামঞ্জস্য।

সত্যই ব্রাহ্মের অনাদি ও অপৌরুষেয় শাস্ত্র, একমাত্র সত্যের দাবীই তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। যেই মতবিশেষের সত্যতা প্রমাণিত, অমনই তাহা তাঁহার গ্রাহ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদার শিক্ষায় ব্রাহ্ম মতের জাতিগোত্র-বিচার-শূন্য। তাঁহার নিকট, মতের ব্রাহ্মণজাতি, শাণ্ডিল্য বা ভরদ্বাজ গোত্র যাহা, গ্রীক্‌জাতি, প্লেটো বা সক্রেটিস্ গোত্রও তাহাই। তাই এখানে প্রতীচ্য অনন্ত উন্নতিবাদ প্রাচ্য মুক্তিবাদের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপদেশে মুক্তির কথাও আছে, অনন্ত উন্নতির কথাও আছে। ব্রাহ্মসাধারণ যুগপৎ দুয়েতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসাহিত্যে মতদুটি যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত, তাহাতে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে উঠে নাই। মুক্তিবাদ ও অনন্ত উন্নতিবাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে কৈ কেহ ত তাহা বলে না। আর বলে না বলিয়াই এ বিষয়ে সত্য শুধু উপলব্ধির নহে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র হইতেও অনেক দূরে।

পণ্ডিতবর বেকন বলিয়াছেন, Sometimes a negative is more pregnant with directions to truth than a barren positive, as ashes are more productive than dusts.

বালুকা অপেক্ষা ভস্মাবশেষ যেমন অধিক উর্ব্বর, তেমনই অসার 'হাঁ' অপেক্ষা 'না' অনেক সময় সত্যলাভ পক্ষে অধিক কার্য্যকর। আমি এই অসার হাঁকে অতিক্রম করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনার প্রথমে মুক্তি ও অনন্ত উন্নতির প্রচলিত ব্যাখ্যার পরস্পর অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া, পরে প্রকৃত ব্যাখ্যার উচ্চতর ভূমিতে দুয়ের সামঞ্জস্য দেখাইব। সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া শাস্ত্র গুরুবাক্য বা আচার্য্যোপদেশের সমালোচনা ব্রাহ্মের সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবোধে ভক্তিভাজন আচার্য্যগণের চরণবন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদের মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূজ্যপাদ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশের মধ্যে ৯ম ও ১০ম উপদেশ মুক্তি বিষয়ে। তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বরের উপাসনা

---

* তত্ত্ববিদ্যা সভায় পঠিত প্রবন্ধ।

কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, মুক্তি লাভের নিমিত্তে সেই পণ্ডিতের ন্যায় উত্তর করে। মুক্তিই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান।" সুতরাং তাঁহার মতে মুক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধ্য। এই লক্ষ্য বা সাধ্য মুক্তি কি? মহর্ষি বলেন "ইহার সহজ উত্তর এই—পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। এই উত্তরে মুক্তির সমুদয় ভাব প্রকাশ পায় না। ইহাতে অভাব পক্ষে মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে; পাপের অভাবই যে মুক্তি তাহা নহে। পশুদিগের অবস্থা ও শিশুদিগের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা নহে। যে মনে জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, যে মন আপন বলে সত্যের আশ্রয়ে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্ত।" আরো বলিতেছেন, "আমাদের জ্ঞানের মুক্তাবস্থায় সেই সত্যস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অন্ন হইবেন, তাঁহার মহিমা আরো উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব। আমাদের ভাব সকল তখন মুক্ত হইবে, যখন তাহারা ঈশ্বর-প্রীতির রূপ ধারণ করিবে, যখন সত্যেতে মঙ্গলেতে তাহারা সমর্পিত হইবে। ইচ্ছার মুক্তভাব তখন হইবে, যখন তাহা নীচ বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সত্য পূর্ণমঙ্গলের অনুযায়ী হইবে। যখন সত্য জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হইবে, বল, পবিত্রতা ও উন্নত আশা আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে উজ্জ্বলিত করিবে, তখনই মুক্তি।" সর্ব্বোপরি বলিতেছেন,—"আমরা চাতক পক্ষীর ন্যায় ঈশ্বরের প্রেমবিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি, সেই বিন্দু ক্রমে সাগর হইয়া উঠিবে। আমরা যখন সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে শোক মোহ, বিলাপ, ক্রন্দন, পাপ তাপ কিছুই থাকিবে না, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে।" সাধনবলে সাধকের এরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা লাভ যদি সম্ভব হয়, যে অবস্থায় তিনি শোক মোহ বিলাপ ক্রন্দন পাপ তাপের অতীত, তবে তাঁহার অনন্ত উন্নতির পথ রহিল কোথায়? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন,—"ঈশ্বরই একমাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান মোহেতে আচ্ছন্ন নহে; তাঁহার প্রীতির সঙ্গে দ্বেষের যোগ নাই; তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলের বিরোধিনী নহে; কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা তাহা অল্পে অল্পে শুদ্ধভাব ও স্বাধীনভাব ধারণ করে।

অজ্ঞান-পাশ, কুটিলতার পাশ, বিষয়-বন্ধন হইতে আমরা ক্রমে মুক্ত হইব। এই মুক্তি লাভ করা আমাদের অনন্ত কালসাধ্য। ঈশ্বরের পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে আমাদের অনন্ত জীবন গত হইবে।" "আমাদের এ জীবন অনন্তকালের অন্তর্বর্ত্তী। বর্ত্তমান কাল অনন্ত কাল হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এই জীবদ্দশাতেই আমরা মুক্তিপথে পদনিক্ষেপ করিতেছি এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।" উত্তর হইল না। সঙ্গতি কিছুই দেখান হইল না। মুক্তিকে একবার অবস্থাবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে তাহা অস্বীকার করা হইল; ইহাতে মুক্তির মুক্তিত্ব রহিল কৈ? মুক্তি যে তবে অনন্ত উন্নতিপ্রবাহের নামান্তর মাত্র। মুক্তি লাভ করা অনন্ত কালসাধ্য, এ কথার অর্থ কি এই নহে যে মোহ অপ্রেম ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইতে আমাদের অনন্ত কাল লাগিবে, অর্থাৎ কখনও মুক্ত হইব না? এ অদ্ভুত মুক্তিসিদ্ধান্ত মানুষকে অনন্ত বদ্ধতার শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া বলে তোমার পক্ষে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুমি সাধনই কর আর ক্রমোন্নতি লাভই কর, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে; এ আর ঘুচিবার নহে। মুক্তিবাদ ও অনন্ত উন্নতিবাদের কৃত্রিম সংযোগ কি ভয়ানক! ইহা সুসমাচার না দিয়া অভিসম্পাত করিতে আসে। এ বিভীষিকময়া অভিসম্পাত মহর্ষির দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই; হইলে তিনি এই কৃত্রিম সংযোগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া দুয়ের প্রকৃত সমন্বয়ে প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যায় মুক্তি ও অনন্ত উন্নতিবাদের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই দেখিলাম। এখন দেখা যাক্ ধর্ম্মসমন্বয়াচার্য্য কেশবচন্দ্রের হস্তে এ দুয়ের কোন সমন্বয় হইয়াছে কি না। ১৮৬০ সালের জুন মাসে তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখি তিনি বলিতেছেন, "তিক্ত ঔষধ পানে যে প্রকার রোগ বিদূরিত হইয়া স্বাস্থ্য-লাভ হয়, অনুতাপ দণ্ডে পাপ বিনষ্ট হইয়া সেই প্রকার পরিত্রাণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পরিত্রাণ আর কি, পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ।" ইহাকে বিশদ করিয়া পরে তাঁহার "Past Sins" নামক প্রবন্ধে (*Essays*, Vol. I.) একটু বলিতেছেন :—

"True salvation means the emancipation of the human soul

not only from outward vices, but also from carnal propensities, the annihilation of every evil desire and the very liability to temptation and sin". প্রত্যেক কুবাসনা, পাপ ও পাপের সম্ভাবনা নিবৃত্তিই মুক্তি। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর প্রকাশিত তাহার 'যোগ' প্রবন্ধে দেখি তাঁহার মুক্তি বিষয়ক মত খ্রীষ্টীয় পরিত্রাণবাদকে অতিক্রম করিয়া অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যোগের প্রকৃত অর্থব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন :—

"The created soul, in its worldly and sinful condition, lives separate and estranged from the Supreme Soul. A reconciliation is needed; nay, more than mere reconciliation. A harmonious union is sought and realized. This union with the Deity is the real secret of Hindu *yoga*. It is spiritual unification; it is a consciousness of two in one; duality in unity. To the philosophical and thoughtful Hindu, this is the highest heaven. He pants for no other salvation; he seeks no other *mukti* or deliverance. Separation, disunion, estangement, a sense of distinction, duality, the pride of ego, this is to him the root of all sin and suffering; and the only heaven he aspires to is conscious union and oneness with the Deity. He is ever struggling and striving to attain this blessed condition of divine humanity. Once in possession of it, he is above all sorrow and distraction, sin and impurity, and he feels all is serene and tranquil within."

দ্বৈতভাব, অহঙ্কারই সকল পাপের মূল, সকল দুঃখের মূল। ব্রহ্মের সঙ্গে সজ্ঞান মিলন ও একত্ববোধই লক্ষ্য বা সাধ্য। জীবব্রহ্মের এই সজ্ঞান মিলনে ও একত্ববোধেই জীবের ভাগবতী তনু লাভ হয়। একবার ভাগবতী তনু লাভ হইলে জীব শোক মোহ পাপ অপবিত্রতা হইতে উত্তীর্ণ হয় ও অন্তরে চির শান্তি লাভ করে। দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইয়া জীবের divine huma-

nity, ভাগবতী তনুলাভই তাঁহার মতে মুক্তি। এ মতে মুক্তাবস্থায় নর শুধু নরোত্তম নহে, নরনারায়ণ। তাই কবি ত্রৈলোক্যনাথ ভাব্যের অনুরূপে গাহিয়াছেন :—

(খয়রা)।

"হরিপদ ভজে, হরিপ্রেমে মজে,
হ'ব আমি নর-হরি।
আমার আমিত্ব, অসার স্বামিত্ব,
মনুষ্যত্ব পরিহরি।
হরিবোল বলে, যাব স্বর্গে চলে,
ভাগবতী তনু ধরি।
ভেদাভেদ জ্ঞান, আত্ম অভিমান,
মহাযোগে সব হবে অন্তর্দ্ধান।
দোঁহে দোঁহাকার, মিলন বিহার,
কিবা শোভা মরি মরি!
শ্রীহরি দর্পণে রূপ নরহরি, নিরখি আনন্দে দু'নয়ন ভরি,
নিজ-পদ-ধূলি, নিজ মাথে তুলি লইব ভকতি করি।"

এই মুক্তিসিদ্ধান্ত যেমন বিশদ তেমনই গভীর। এতদপেক্ষা গভীরতর সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মসাহিত্যে ত আর দেখি না। ইহাতে বৈদান্তিকের দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব, অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবের বিবর্ত্তবিলাস ও উদার আধ্যাত্মিক খ্রীষ্টানের divine sonship বা দেবনন্দনতত্ত্ব আঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি,' 'Philip, thou hast seen the son, hast thou not seen the Father?' প্রভৃতি শ্রুতি বা মুক্তাত্মাদিগের সাক্ষ্য ইহার সত্যতার অটল প্রমাণ। কেশবচন্দ্র নিজ মুক্তিসিদ্ধান্তের সহিত ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত অনন্ত উন্নতির মতের সঙ্গতি প্রদর্শন করিতে কোথাও প্রয়াস পান নাই। অনন্ত উন্নতির মত যে তিনি মানিতেন না এরূপ মনে হয় না। তাঁহার রচিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধমালার প্রথম প্রবন্ধ 'Harmonious Development' বিষয়ে। যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে আমরা অতি বিশদ মুক্তিসিদ্ধান্ত পাইলেও অনন্ত উন্নতিবাদের সহিত তাহার সমন্বয়ের কোন সঙ্কেত লাভ

করিতেছি না। তাঁহার সাহায্যে মুক্তি ও অনন্ত উন্নতির বিরোধ ভঞ্জন হইতেছে না। বিরোধটা যে কি তাহা পূর্ব্বে একবার দেখাইয়াছি। এখন আবার একটু বিশদ করিয়া বলি। যদি একবার স্বীকার কর মানুষ শোক মোহ পাপ তাপের অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে, তবে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া অসত্য হইতে সত্যেতে, অপ্রেম হইতে প্রেমে ও পাপ হইতে পুণ্যেতে যাইব, এ সব কথা অর্থহীন। কারণ পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, মানুষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মোহ পাপ তাপের অতীত হইতে পারে। তবে কি অনন্ত উন্নতির মত অসত্য? না কখনই নহে। মোহ অপ্রেম ও পাপাতীত অবস্থায়ও উন্নতি সম্ভব। এ সকল বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরে আমি যুক্তি প্রমাণে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

Madame Guyon ফ্রান্স দেশের একজন প্রসিদ্ধা ভগভক্ত ও মুক্তাত্মা মহিলা। তাহার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অনেক আলোক প্রদান করিবে বলিয়া তদীয় জীবন-চরিতের "বসে-গায়ন সংবাদাংশ" এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Madame Guyon—I hope, sir, it will not be regarded as an offence if I indulge the hope and belief that a higher experience, even a much higher one, is practicable than that which we commonly see.

Bossuet—Certainly not; but when we see persons going so far as to speak of a love to God without any regard to self, of the entire sanctification of the heart, and of divine union, have we not reason to fear that there is some illusion? We are told that there is "none that doth good and sinneth not."

Madame Guyon—There is no one except the Saviour, who has not sinned. There is no one who will not always be entirely unworthy. Even when there is a heart which Divine grace has corrected, and has rendered entirely upright, there may still be errors of perception and judgment, which will involve relatively wrong and injurious doing, and render

it necessary, therefore, to apply continually to the blood of Christ. But while I readily concede all this, I cannot forget that we are required to be like Christ; and that the Saviour Himself has laid the injunction upon us to love God with all our heart, and to be perfect, as our heavenly Father is perfect. My own experience has added strength to my conviction.

Bossuet—Personal experience is an important teacher. And as you have thus made a reference to what you have known experimentally, you will not think it amiss, madame, if I ask whether you regard yourself as the subject of this high religious state.

Madame Guyon—If you understand by a holy heart one which is wholly consecrated and devoted to God, I see no reason why I should deny the grace of God, which has wrought in me, as I think, this great salvation.

Bossuet—The Saviour, madame, speaks in high terms of the man who went up into the temple and smote upon his bosom, and said, "God be merciful to me a sinner."

Madame Guyon—It is very true, sir, that this man was a sinner, but it is also true that he prayed that God would be merciful to him; and God, who is the hearer of prayer, did not mock either his sorrows or his petitions, but granted his request. If I may speak of myself, I think I may say that I too have uttered the same prayer; I too have smitten upon my bosom in deep anguish of a rebellious and convicted spirit. I can never forget it. Months and years witnessed the tears which I shed. But deliverance came. My wounds were healed, my tears were dried up, and my soul was crowned,

and I can say with thankfulness, is now crowned, with purity and peace.

Bossuet—There are but few persons who can express themselves so strongly.

Madame Guyon—I regret that it is so, and the more so because it is an evidence of the want of faith. Men pray to God to be merciful, without believing that He is willing to be merciful; they pray for deliverance from sin and for full sanctification, without believing that provision is made for it, and thus insult God in the very prayer they offer. Can one like yourself, who has studied the Scriptures so long and profitably, doubt the the rich provision of the Gospel, and deny, in the long catalogue of the saints of the Catholic Church, that any of them have been sanctified.

মেডাম গেঁয়ো একদিকে যেমন দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন সাধকের পাপ তাপ শোকাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছে, অপর দিকে ইহাও বলিতেছেন, "Even when there is a heart which divine grace has corrected and has rendered entirely upright, there may still be errors of perception and judgment which will involve relatively wrong and injurious doing, and render it necessary therefore to apply continually to the blood of Christ. ভগবৎকৃপায় চিত্ত বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মে স্থিত হইলেও দৃষ্টি ও বিচারসম্ভূত ভ্রম থাকিয়া যায়। এই ভ্রমহেতু আমরা আপেক্ষিক অন্যায় ও ক্ষতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে আত্মা কলুষিত হয়, এবং সে কলুষ-প্রক্ষালন নিরন্তর আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তাবস্থাতেও উন্নতির দ্বার মুক্ত থাকিয়া যাইতেছে। ভ্রম প্রমাদজনিত অন্যায় ও জানিয়া শুনিয়া অন্যায়েতে অনেক প্রভেদ। প্রথমটীতে শ্রেয়ের অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা প্রেয়কে শ্রেয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করে; দ্বিতীয়টিতে শ্রেয়ের উপস্থিতি সত্ত্বে ও প্রেয়ের অনুযায়ী হয়। প্রথমোক্ত

অন্যায় আমাদের সসীম প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল। অভিজ্ঞতার ভ্রম প্রমাদের ক্রমিক তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অন্যায়ের অল্পতা হইয়া আসিবে। অজ্ঞাতসারে হইলেও আধ্যাত্মিক নিয়মলঙ্ঘন হেতু আত্মার যে কলুষিত অবস্থা, আত্মা তাহা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় অধিরোহণ করিবে। একটু বিশেষ করিয়া বলি। 'Love thy neighbour as thyself', তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মত ভাল বাসিবে, ইহা একটী আধ্যাত্মিক নিয়ম। ঈশা প্রমাদবশতঃ জীবনের প্রথমাবস্থায় শুধু ইহুদীদিগকে প্রতিবেশী জ্ঞান করিতেন। সুতরাং ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ব্যবহারে এই প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘিত হইত। এই নিয়মলঙ্ঘন হেতু তাঁহার আত্মার যে অনিষ্ট হইয়াছিল, সাইরোগ্রীক রমণীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। কিন্তু যখন দেখিলেন ইহুদীতে যে বিশ্বাস দেখেন নাই, সেই বিশ্বাস এই হীন রমণীতে বর্ত্তমান, তখন তাঁহার সঙ্কোচিত প্রেম উদারতার উচ্চ স্থান অধিকার করিল। তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ঈশার উক্ত অজ্ঞানকৃত অন্যায় তাঁহার মুক্তির অন্তরায় হয় নাই, কিন্তু তাঁহার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। মুক্তাবস্থায়ও যে প্রেমপুণ্যে উন্নতি সম্ভব, তাহা দেখান হইল। এখনও জ্ঞানের উন্নতির সম্ভাবনা প্রমাণ করিতে বাকি আছে। সাধক মুক্তাবস্থায় মোহের অতীত হন সন্দেহ নাই, কিন্তু অজ্ঞানতার অতীত হন না। অবস্তুতে বস্তুত্বের আরোপ, অনাত্মাতে আত্মবোধই মোহ। যখন সত্যলাভ হইল, প্রকৃত বস্তুজ্ঞান হইল, আত্মাকে চিনিতে পারা গেল তখন আর মোহ রহিল না, কিন্তু বস্তুর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকিয়া গেল। সাধক সত্যকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে কি ঘটিবে তাহা না জানিতে পারেন। অজ্ঞানতা আমাদের সসীম প্রকৃতির দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা। যতই কেন উন্নত হই না, ইহা সম্মুখে থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং উন্নতির পথ ও প্রশস্ত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং মুক্তাবস্থায়ও যে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে অনন্ত উন্নতি সম্ভব, তাহা দেখান হইল। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুক্তিসিদ্ধান্তের সঙ্গে এ অনন্ত উন্নতি-সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

THE PRESUPPOSITIONS OF PSYCHOLOGY.*

It has always seemed to me that the study of Psychology might be greatly facilitated if the presuppositions of the science were explained at the very beginning of a regular study of it. Psychology is not an independent science, a branch of knowledge unconnected with such other branches, a department of inquiry wich may be pursued without taking for granted truths which form the subjects of other branches of inquiry. Apart from Physiology, with which, during recent years, it has been more and more closely associated, its connection with the other philosophical sciences, with Metaphysics, Logic and Theology, is most intimate, for it is a member of this particular family of sciences. Before a systematic study of Psychology begins, its connexion with these sciences should therefore be shown as clearly as possible. If Psychology dealt with a distinct object, an object which was not the object of other branches of inquiry, it might have little to do with other sciences. If mind, which is the object of psychological investigation, were not also the object of Metaphysics, Logic and Theology, Psychology might be studied without any attention being paid to these other sciences. But it is not so. The same object with which Psychology deals is dealt with, from different standpoints, by the sciences just named, so that in dealing with mind, the former comes in constant contact with the latter. The truth established in the other sciences must be treated as presuppositions in psychological investigations, or else investigations which are metaphysical, logical or theological, must be interpolated into inquiries purely psychological. Of late, there has been a studied attempt on the part of a class of philosophers to keep Psychology independ-

---

* The substance of a lecture delivered by the editor of the *Brahmatattva* at the City college, at 3-30 P. M., Monday, the 25th July last, Babu Umeschandra Datta, B. A., Principal of the College, presiding.

dent of the other sciences of the same family, specially Metaphysics and Theology. The attempt is not fundamentally an objectionable one. The very distinction of these sciences makes it necessary that, so far as possible, their functions should not be confused and investigations which are proper to the one should not unnecessarily be intruded into another. But this separation of functions and treatment is only relative, and not absolute ; so that, when it is attempted to be made absolute, the results cannot but be grotesque and almost ridiculous. Few things are more amusing than to see metaphysical problems systematically ignored in certain recent treatises on Psychology as outside its proper object and purpose, and yet those very problems, solved in a particular way, determining all tho theories and doctrines established by the authors in the course of their psychological investigations,—investigations which are professed to be *purely* psychological. There can be no objection, indeed, in laying aside certain investigations as metaphysical and not psychological, and yet using conclusions drawn from such investigations as presuppositions in Psychology. But when conclusions of this nature are made use of without any knowledge or recognition of their being metaphysical, when, moreover, they are held forth as inferences drawn from purely psychological facts, whereas they have all along guided the psychologist in his inquiries as presuppositions, as data and not quesæta,—when such is the case, I say, the result can not but strike one as grotesque and ridiculous. It will be a part of my task in this lecture to hold forth to you some of these subterfuges,—whether conscious or unconscious, God knows—of recent Psychology as studied in some of the schools of Philosophy.

As a part of my to-day's task, I have further to tell you that nothing is more important, in commencing the study of Psychology, than to gain the true psychological standpoint. I have met with people who have gone through a whole course

of psychological study without attaining the point of view from which Psychology looks at things. The result is, as could be expected, that the whole thing has been an unprofitable toil to them, and they feel that it has been unprofitable. I have seen students learning Psychology as they learn history or geography, committing to memory facts which seem to them as remote as the passage of the Israelites through the Red Sea or the Arctic regions explored by Nansen, whereas the facts relate to an object which is their very self. I have heard students ask with wonder why such obviously material and external objects as sound, colour, hardness and extension should be treated as objects of Psychology,—as so many states of consciousness,—and as this feeling of wonder has never ceased at any stage of their psychological study, Psychology itself has seemed to them a false science, a jumble of unmeaning theories and problems, a meddlesome affair which should be put aside in favour of more real and profitable pursuits as soon as one's academical career is over. All this would be impossible if it were once for all made clear at the very commencement of psychological study what is the scope and what are the limitations of Psychology, how this scope and these limitations are what they are and not otherwise, and how the same objects which form matters of inquiry to other sciences, may and do become objects of psychological investigation. Without further introduction, therefore, I proceed to make these points as much clear to you as I can in the course of a short address. Many of you, I know, are just beginning the study of Psychology, and these introductory reflexions on the psychological standpoint may be profitable to them, and not quite unprofitable, I suppose, to those more advanced among you.

I ask you, then, first of all, to conceive a clear distinction in your minds between *being* and *knowing*, between the existence of a thing in itself, and its being known by an intelligent

subject. Perhaps you will be told in course of time that the distinction is only relative, and not absolute, only *vyávahárik* and not *páramárthik*, as our native Philosophy, the Vedánta, says; but that time is yet far off. Though only provisional, the distinction needs to be clearly conceived at the beginning of philosophical study. As Professor Fraser says, in effect, the knowledge and ignorance of the distinction makes all the difference between a philosopher and an ordinary unreflective person. It is one thing for an object to lie unknown and unthought of by intelligence and thus remain unrelated to to it, it is quite another thing for it to be known and thought of by, and thus come in relation to intelligence. So long or in so far as it is in its former condition or capacity, Psychology has nothing to do with it; it is only as something related to mind, related to it as the object of its knowledge, that it is a subject for psychological inquiry. In this capacity, as a known or knowable object, any object, however remote from us, may become a subject for psychological investigation as much as the mind itself. The mind itself is an object of Psychology only because it is, and in so far as it is a known thing. Now, I would ask you, again, to conceive clearly this relation of knowing and known between the mind and its objects. You will find gradually that the relation is far more deep and comprehensive than it at first seems to be. We distinguish between external and internal objects. The distinction is necessary in Psychology, but if you think upon it, you will see that the distinction is made by the mind itself, so that, in one sense, both external and internal objects are internal to the mind, that is, equally related to it as known objects. The mind takes in everything known in its wide sweep. This table before me is known to me. I see its colour, I feel its coldness, I perceive its extension and hardness. These qualities of the table, though the qualities of what we call an external object, are nevertheless related to my mind. Just as

my seeing, my touching, my perceiving are mental acts, and so proper objects of Psychology, so the colour, the coldness, the extension and the hardness that make these acts possible, without which these acts would not be possible, are alike objects of Psychology. You will see, if you think upon the matter, that in the act of perception, and indeed in all mental acts, memory, imagination, judgment, feeling and willing, the subject and object, the mind and the objects conceived as acting upon the mind, are indissolubly connected. You cannot think of the mind acting or being acted upon, as having these various states of consciousness, without thinking of certain objects as related to it, as making these actions possible. You see now that not only the mind itself, but all known and knowable objects come within the comprehensive scope of Psychology. But in saying this, I do not, by any means, mean that Psychology includes all other sciences—that all other sciences are its branches. Apart from the conception, which I at present allow, of objects as lying without being known,—at any rate without being known to us as individuals,—even objects known or knowable to us may be treated of without considering their relation to intelligence. Not that by such treatment those objects are taken out of the sphere of knowledge,--for, if taken out of the sphere of knowledge, they could not be made subjects for any science whatever,—but we may, by an act of mental abstraction, discount their relation to intelligence, ignore this relation for a time, and treat of their relations to one another, or of their qualities, under various relations among themselves. Thus, we may treat of this table, which we have seen to be a proper object of Psychology, as an object in itself, not really thinking of it as an object unrelated to mind, which is impossible, but by abstracting from, by ignoring, this relation. We may treat it as an object in itself and make it a subject for physical investigation—investigation which is proper to the science of

physics. We may deal with its properties in their mutual relations and of the whole object in relation to the objects that surround it. You see that all this is possible only by a process of abstraction. Now, it is this act of abstraction upon which all special sciences are founded. It is not only a fact, but a truism, that no object can be thought of as unrelated to mind, i. e. unrelated to thought, so that there can be no science into which Psychology, in a sense, does not enter. But we may not always explicitly think of the relation of objects to the mind, and that is what makes the natural sciences possible.

Having briefly shown the relation of Psychology to the natural sciences, I shall now speak of the philosophical sciences, sciences with which the relation of Psychology is more intimate. You have seen that everything is comprehended in the wide sweep of knowledge, and as knowledge is the principal function of the mind, everything comes under the scope of Psychology or the science of mind. But knowledge, the light that lighteth everything in the world, shines in us only intermittently. We know objects and we cease to know them. This lecture-room, with all its variety of objects, will cease to be an object of knowledge to us a few minutes hence. At this moment, while you are listening to me, a thousand objects that you have known, are beyond your knowledge. A few hours hence, in the mysterious hours of sleep, what we call our own minds will themselves cease to be objects of our knowledge, and as individuals, as particular vehicles of knowledge, we shall cease to be knowing, thinking beings. But we know that even when unknown to us, objects continue to exist, for when they come back to us, they come as old objects, as the same objects that were known before; and this would not be possible if they had ceased to exist while unknown to us. Here, then, we come in contact with a most strange fact, a fact which does not strike us as

strange on account of its familiarity. It is that though, in one sense, we are limited, individual beings, we can, in another sense, transcend the limits of our individuality—we can know objects which are beyond our individual experience. Thus, this room, with all its varied contents, is the object of our individual consciousness; it forms a part and parcel of our conscious individual life at the present moment. But we also know that it is not merely an aggregate of subjective sensations and ideas confined to the present moment; we know it is an objective reality, not depending for its existence on its momentary appearance to us, but having a basis of existence independent of our intermittent acts of perception. The whole of what we call the material world is such an objective reality, a reality which we do not create by our momentary perceptions of it, but which rather make our perceptions possible. At any rate, this is the belief on which all practical life, and no less all scientific inquiry is based, and for our present purpose, which is the examination of a few presuppositions of psychological study, the belief will serve as well as the reality. Now, what we call our minds, our subjectivity as contrasted with the objectivity of the world, will be found to be, on close examination, as much objective as the world, i. e. as much permanent and real, and as little dependent on momentary perception as the material world. In deep, dreamless sleep, we lose our minds as much as the material world. We are then no more conscious of our minds than of the world. And yet we know that our minds are not destroyed by this temporary suspense of consciousness. It not only rewakes, but also keeps its identity fully in tact. It knows itself as the same mind as it was before and identifies the contents of its consciousness, its ideas and judgments, as the same as it had before. It thus knows itself as an objective reality, a reality having a higher and more lasting basis of existence than its own transitory perceptions and thoughts.

In knowing ourselves, therefore, as much as in knowing the world, we transcend the limits of individuality. Though everything that we know is known through the momentary perceptions and thoughts that constitute individual consciousness, we see that everything that thus comes to our consciousness forms part of a grand world of objective realities. This, then, is one of the presuppositions of Psychology, one which includes all others that we may enumerate. Psychological inquiry, the inquiry into the contents of the individual consciousness, into the nature of these contents and the laws that determine them, presupposes a belief in the objective existence of the mind and the world, their existence independently of their expression in the form of conscious individual life. Consciously or unconsciously, this presupposition guides us at every step of psychological inquiry. You will meet with psychologists who will tell you and undertake to prove to you that our belief in the reality of mind and the world is a later formation, that it is gradually formed out of pure sensations unrelated to any permanent mind, and unconnected by any necessary laws. But if you are shrewd enough, you will see that the presupposition of an objective world guides him as much as you, and that the primary elements, the so-called pure sensations with which he would build the world, are far from pure, that they already contain what he would bring out of them. While professing to think of mere sensations, unrelated to a thinking being and thereby to one another, he really does nothing of the kind. Unconsciously to himself, he, like a juggler, smuggles into them the ideas of permanence, relation, substantiality, causality and so on, and brings them out as the creations of his psychological magic. Whole chapters and even whole treatises on Psychology might be shewn to be vitiated by this psychological jugglery; but for our present purpose what has been said seems enough.

Here we come in sight, then, of the relation of Psycho-

logy to Metaphysics. Psychology, the science of individual consciousness, presupposes a belief in an objective world of facts, and Metaphysics is the science which deals with objective existence. It would be going out of my way to speak at any length on Metaphysics, specially at this stage of your knowledge. But since I have undertaken to speak to you of the presuppositions of Psychology, it would not do for me to stop at the primary presupposition, which I have already mentioned; but it seems incumbent on me to mention a few at least of its applications. I have said that Psychology presupposes the objective existence of the material world, by which I mean nothing but the world that is presented to us in perception. Now, what are the conditions of the objective existence of this world? In actual perception, the world appears to us as one related to knowledge. It is a seen, heard, smelt, tasted and touched world that we know in perception, and the world whose objective existence is the presupposition of psychological inquiry is this perceived world. I say nothing here as to the actual or possible existence of a world unrelated to perception, absolutely unrelated to knowledge. That world, if it exists, is not one with which Psychology has to do anything. It is with a perceived world, a known world, with which Psychology deals, and it is the objective existence of such a world that is presupposed in all psychological investigations. The objective existence of such a world further presupposes, therefore, the existence of an objective Mind, a Mind independent of the changing moods of our individual life,—a Mind related to us, indeed, and the very basis of our conscious life, as we shall see, but which does not forget with our forgetting, and does not sleep with our sleeping, a Mind as much permanent, at any rate, as the world which is related to it. This objective Mind is what we call God in theological parlance, and so you will see that Psychology is based not only on metaphysical, but also on theological

presuppositions. I have often regretted that the study of Psychology brings no spiritual good to our youngmen, whereas the chief motive for the study of the science with the ancients was spiritual improvement. The evil is not due to the science itself, but to the wrong method of teaching it that prevails at the present time. This wrong method is favoured both by a large and perhaps growing class of writers on Psychology and by many of its teachers. I am far from being in favour of obstructing or vitiating the progress of science by burdening it with doctrines of dogmatic Theology. But there is a Theology which is not only consistent with science, which is not only scientific, but on which science itself is based. All sciences comprise some principles which are truly theological. But Psychology does so more than any other science. Even its basal principles imply judgments which are strictly theological, whether you call them by this name or not. I have already exemplified this in part; I shall now furnish one or two instances more. You have seen that what we call our mind is, notwithstanding its intermittent expression, its constant forgetfulness, and its regular and occasional lapses of consciousness, an objective reality, existing with its contents of ideas and judgments even when its expression in an individual form is in abeyance. Now, what does this imply? How is this made possible? You will easily see, if you think on the matter, that ideas can exist only in a thinking mind, only so long as they are thought, and judgments can have existence only in the form of being judged, only in relation to a judging understanding. No material object like the brain can be the receptacle of thoughts and judgments, however necessary it may be for the manifestation of consciousness in a sentient life such as we are endowed with by the Creator. It is only an ever-waking, ever-conscious Mind that can explain the permanence and constant re-appearance of the contents of our conscious

life, a Mind that contains our little minds, and communicates to us all the varied wealth of our intellectual and spiritual life. The presupposition of the existence of this all-containing, all-uniting Mind underlies all those laws of reproduction and association with which Psychology seeks to explain the elaboration of the primary elements of mental life,—the formation of concepts and judgments out of them. These primary elements themselves presuppose such a Mind, and are quite wrongly conceived when this presupposition is ignored. The primary elements of mental life are not, as they are often supposed to be, mere passing sensations unrelated to one another and undetermined by a permanent intellect. If they were such, they could no more be aggregated and formed into concepts and judgments than unextended points into lines and other extensive quantities. If what is called a sensation were the momentary unrelated thing it is represented to be, it could not persist and could not revive. There can be no meaning in the persistence and revival of an object which is confined to the moment in which it is felt. In fact, far from persisting and reviving, it could not even be thought or spoken of; for it is only a determinate object, an object occupying a particular time and a particular place in relation to other objects and thus related to an intelligence uniting those objects in the unity of its consciousness, that can be thought and spoken of. The primary elements of mental life, therefore, are not mere unrelated and momentary sensations, but determinate objects or ideas having necessary connexions with other ideas and implying a permanent Mind as their source or support. Then, as to revival or reproduction, it is only such a fixed idea, as I have already said, and not a momentary sensuous event, that can re-appear in individual life after it has once vanished from it. There can be no meaning in the revival of a sensation when once it has been felt and lost. In another moment it

would be another sensation and not a previous one that would arise. Nor can a mere sensation be similar to another sensation, for similarity implies comparison, and it is only fixed ideas that can be compared, and not fleeting objects of which one vanishes for ever before the other arises. That we can compare our perceptions, for instance a succession of sounds which we shall name *a*, *b*, *c*, shows that they are not mere fleeting sensations, but determinate ideas in an ever-conscious Mind. If *a* were a mere fleeting sensuous event, it would be all over with it before *b* arose in our minds, and the two could not be compared and known to be related to each other as 'before' and 'after' as 'first' and 'second'. The same would happen to the relation of *b* and *c*. Then, as to association, let us suppose that *a* and *b*, two objects, have been associated in my past experience. Does this past association suffice to explain why, on the appearance of *a* in my mind now, *b* follows? How can *b* re-appear at all if it has not persisted in an ever-conscious Mind,—a Mind that has not lost it with its lapse from my individual consciousness,—and how can it now appear in my subjective experience in association with *a* if it has not all along been associated with it in a lasting, objective experience? The laws of subjective association will thus be seen to be based on an objective association,—a necessary and permanent connection of objects in a Mind which is the necessary presupposition of all things, all laws and all events. It would be delightful to a teacher, and interesting to the pupil, and edifying to both thus to read the deeper meanings of the laws of mind in the course of psychological study. These meanings are nowhere absent in the noble science of the mind. It is either ignorance,—an inadequate conception of the nature and scope of the science—or a fashionable but misguided secularism that seeks to banish God from science in the name of civilisation,—I say it is one or the other of these two things that overlooks these higher meanings

hidden in the laws of mental life. However, though the subject is almost inexhaustible, enough, I suppose, has been said in this introductory discourse to convince you that Psychology is intimately connected with Metaphysics and Theology, and that it is suicidal to banish metaphysical and theological principles from psychological investigations. Wishing you every success in the studies which some of you have just commenced and some of you have been pursuing for some time past, I must stop here, though we are, at this moment, only on the threshold of the temple of Psychology.

বৈদান্তিকগণের যুক্তি।

বেদান্ত-ব্যাখ্যাকারগণ জ্ঞান লাভের পক্ষে প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার), নানা প্রকার অনুমান এবং শব্দ (অর্থাৎ শ্রুতিবচন) এই তিন প্রকার উপায় স্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে শব্দপ্রমাণ-গোচর বলিয়া মনে করেন, ইহাতে সহসা বোধ হয় যে তাঁহাদের মতে মানব স্বাভাবিক জ্ঞানবলে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, তিনি কোন অনির্দ্দেশ্য অপ্রাকৃত ভাবে শ্রুতিদ্রষ্টা ঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন; সাধারণ মানব কেবল অবিচারে তাঁহাদের বাক্য গ্রহণ করিয়াই তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে। প্রথমতঃ বেদ বা শব্দকে যে তাঁহারা 'অপৌরুষেয়' বলেন, তাহার অর্থ এই যে বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের উপাদানরূপী 'শব্দের' অব্যক্ত চিৎরূপ যাহা, তাহা নিত্য অবিনাশী, তাহা কাহারও গঠিত নহে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধার ব্রহ্মে সেই জ্ঞানরূপ শব্দের নিত্য অবস্থান; সৃষ্ট জীবে উহার প্রকাশই কেবল কালে ঘটিয়া থাকে। (ব্রহ্মসূত্র, প্রথমাধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ২৮—৩০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মানবে শব্দের প্রকাশ অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ের আকারে অস্ফুটভাবে মানবমাত্রেই আছে, ইহা বৈদান্তিকগণ স্পষ্টই স্বীকার করেন।

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় উক্ত বৈদান্তিকগণ সাধারণ ভাবে শ্রুতিবচনের প্রতি অসীম সম্মান প্রকাশ করা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ অনেক শ্রুতিবচনই পরিহার করিয়া থাকেন, যথা, (১) কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত প্রমাণ ও আদেশ-নিষেধ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে অগ্রাহ্য। (২) অনেক আখ্যায়িকাই প্রকৃততত্ত্ব-বাচিকা বলিয়া গৃহীত না হইয়া রূপক বলিয়া গৃহীত হয়। (৩) ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত অনেক বস্তুতত্ত্ব-বাচিকা উক্তি 'অর্থবাদ' মাত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। তারপর (৪) ব্যাখ্যাপ্রণালীর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ত কথাই নাই; এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়তঃ, ইহারা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে বেদবাক্য শ্রবণের পর তদভিনিবিষ্ট ধ্যান-পরায়ণ সাধকের প্রজ্ঞাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হন। সুতরাং শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে সহসা যে ধারণা হয় তাহা ভ্রমমূলক। অবশেষে এই বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই যে ব্যাখ্যাকারগণের অনেক কথাতে বিচার-শূন্য শাস্ত্রবাদের প্রভাব এবং স্বাধীন চিন্তার অভাব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু উপনিষদ্-বক্তা ঋষিগণ এই সকল দোষের অতীত। তাঁহাদের উক্তিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবই প্রকাশ পায়। তাঁহারা যে কোন বাহ্য শাস্ত্রকে অন্ধভাবে অবিচারে গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের উক্তিসমূহে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। পরন্তু ব্রহ্ম যে অপরোক্ষ নির্ম্মল জ্ঞানের বিষয়, এই সত্য অসংখ্য বেদান্ত-বাক্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা তৃতীয় মুণ্ডক, প্রথমাধ্যায়, অষ্টম শ্রুতিতে—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

অর্থাৎ "পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন; তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা (অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা) বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ঋষিগণ অনুভব-লব্ধ সত্যকে বিচারদ্বারা স্পষ্টীকৃত করিতে প্রায়ই কোন প্রয়াস পান না। বেদান্ত-ব্যাখ্যাকারগণ কোন কোন বিষয়ে বিচার অবলম্বন করেন, কিন্তু অনেকস্থলে শ্রুতিবচনকেই শেষ প্রমাণরূপে উপস্থিত

করেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লেখকগণের উক্তি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা গভীর চিন্তা ও আলোচনা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ ছিল তাহাও যত্ন সহকারে অনেক পরিমাণে আবিষ্কার করা যায়। আমরা কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী তাঁহাদেরই উক্তি-দ্বারা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

১। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান।—আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে মহাত্মা শঙ্কর শারীরক মীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ে, তৃতীয় পাদে, সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে বলিতে-ছেন,—ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। ন হ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি। তস্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণান্যসিদ্ধপ্রমেয়-সিদ্ধয়ে উপাদীয়ন্তে। ন হ্যাকাশাদয়ঃ পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। আত্মা তু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে ন স্বরূপম্। য এব হি নিরাকর্ত্তা তদেব তস্য স্বরূপম্। ন হ্যগ্নেরৌষ্ণ্যমগ্নিনা নিরাক্রিয়তে। তথাহমেবেদানীং জানামি বর্ত্তমানং বস্ত্বহমেবাতীতমতীততরঞ্চাজ্ঞাসিষমহমে-বানাগতমনাগততরঞ্চ জ্ঞাস্যামীত্যতীতানাগতবর্ত্তমানভাবেনান্যথা ভবত্যপি জ্ঞাতব্যো ন জ্ঞাতুরন্যথাভাবোঽস্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। তথা ভস্মী-ভবত্যপি দেহে নাত্মন উচ্ছেদো বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। অন্যথা স্বভাবত্বং বা ন সম্ভাবয়িতুং শক্যম্”। অর্থাৎ—আত্মা কাহারও সম্বন্ধে আগন্তুক নহেন, কারণ তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মা নিজ সম্বন্ধীয় প্রমাণের অপেক্ষায় সিদ্ধ হন না। অসিদ্ধ প্রমাণসাক্ষেপ বিষয়ের সিদ্ধির জন্য তাঁহার (অর্থাৎ আত্মার) আশ্রিত প্রত্য-ক্ষাদি প্রমাণ সমূহ ব্যবহৃত হয়। কেহই স্বীকার করিবেন না যে আকাশাদি পদার্থ প্রমাণনিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্রয় হওয়াতে প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ। এরূপ বস্তুর নিরাকরণ সম্ভব নহে। আগন্তুক বস্তুই নিরাকৃত হইতে পারে, স্বরূপ বস্তু নহে। যিনি নিরা-কর্ত্তা (অর্থাৎ যে আত্মাকে অস্বীকার করে) আত্মবস্তু তাহারই স্বরূপ। অগ্নির উষ্ণতা অগ্নিদ্বারা নিরাকৃত হয় না। আর, আমিই ইদানীং বর্ত্তমান বস্তু জানি-তেছি, আমিই অতীত এবং অতীততর বিষয় জানিয়াছিলাম, আমিই

ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যত্তর বিষয় জানিব, এইরূপে জ্ঞাতব্য বিষয় অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাবে ভিন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞাতার ভিন্নতা নাই, কেন না তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাব। আর দেহ ভস্মীভূত হইলেও আত্মার উচ্ছেদ হয় না, কারণ আত্মা বর্ত্তমানস্বভাব। তাঁহার ভিন্নস্বভাবত্ব স্থাপন করাও অসম্ভব।

নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন সমূহে বিষয় বিষয়ীর ভিন্নীকরণ পূর্ব্বক বিষয়ীকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—আত্মজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে:—"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রুতমিদং শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" (কেনোপনিষদ্, ৪—৮)—অর্থাৎ যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, যাঁহাকর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে এই যে বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে। লোকে যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, যিনি মনকে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদেরা বলেন, তুমি তাঁহাকেই ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিদ্বারা চক্ষুগোচর পদার্থসমূহ দেখিতে পায়, তাঁহাকেই ইত্যাদি। যাঁহাকে লোকে কর্ণদ্বারা শুনিতে পায় না, কিন্তু যাঁহাদ্বারা কর্ণ বিষয়ীকৃত হয়, তাঁহাকেই ইত্যাদি। যাঁহাকে লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আঘ্রাণ করে না, যাঁহার শক্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে, তাঁহাকেই ইত্যাদি।

ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশাধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর ভিন্নীকরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা আপনাকে সর্ব্ব ক্ষেত্রস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥

(২—৩) অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে "ক্ষেত্র বলে" আর যিনি ইহাকে জানেন তাঁহাকে জ্ঞানীগণ "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলেন। আর হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান; এই যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান তাহাই আমার অভিমত জ্ঞান। তৎপর ঐ অধ্যায়েরই ২৬তম শ্লোকে বলিয়াছেন,—"যাবৎ সঞ্জায়তে বস্তু কিঞ্চিৎ স্থাবর-জঙ্গমম্। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ অর্থাৎ—হে ভরতর্ষভ, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎ সমস্তই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ-জনিত বলিয়া জানিবে।" তৎপর ৩৩ তম শ্লোকে,—"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" অর্থাৎ—হে ভারত, একমাত্র সূর্য্য যেমন এই সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে।" এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-বচনে আত্মজ্ঞানের মৌলিকতা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ইহার একতা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

*২। বিষয় অস্বতন্ত্র, জ্ঞানের আশ্রিত।—বিষয়জগৎ যে অস্বতন্ত্র, জ্ঞানাশ্রিত, এতদ্বিষয়ে বেদান্ত-শ্রুতি ও স্মৃতিতে বহুল উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটী মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ঐতরেয় উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত জগতের বিবিধ বস্তুর উল্লেখপূর্ব্বক ঋষি বলিতেছেন,—"সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ—সেই সমস্ত প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই জগৎ প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠা; প্রজ্ঞান ব্রহ্ম। কঠোপনিষদ্, পঞ্চমী বল্লী, ৮ম শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"তস্মিঁল্লোকাঃ-শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।" অর্থাৎ—সমুদায় জগৎ তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রশ্নোপনিষদ্, চতুর্থ প্রশ্ন, সপ্তম শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠন্তে।" অর্থাৎ—হে সৌম্য, যেমন পক্ষিগণ বাসবৃক্ষ আশ্রয় করে, সেইরূপ সেই সমস্তই (অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তু) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ," ইত্যাদি। অর্থাৎ যাঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী,

ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণসহ মন ধৃত রহিয়াছে, সেই অদ্বিতীয়কে জান, ইত্যাদি। এই খণ্ডেরই ১০ম শ্রুতিতে,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" অর্থাৎ—সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎ সমূহ প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায় (লাগে)? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। কৌষিতকি উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রজ্ঞামহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাণ ও প্রজ্ঞার একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা অষ্টম শ্রুতির কিয়দংশের ভাব উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই দশ মূলভূত প্রজ্ঞার আশ্রিত, এবং প্রজ্ঞার (বাগাদি) দশমূল ভূতাশ্রিত। মূলভূত না থাকিলে প্রজ্ঞার মূলসমূহ থাকিত না। প্রজ্ঞার মূলসমূহ না থাকিলে মূলভূত থাকিত না। দুইয়ের এক হইতে কিছুই হইত না। কিন্তু তাহা (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও প্রাণ) বহু নহে, (এক)। যেমন রথচক্রের বৃত্ত অরসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অরসমূহ নাভির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মূলভূতসমূহ প্রজ্ঞার মূলসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজ্ঞার মূলসমূহ প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই প্রজ্ঞা। ইনি জগতের রক্ষক, জগতের রাজা, জগতের প্রভু, ইনি আমার আত্মা।"

'শারীরক মীমাংসা' দ্বিতীয়াধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে, ২৬—৩২তম সূত্রের ভাষ্যে মহাত্মা শঙ্কর অতি বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এই ভাষ্যাংশ পাঠ করিলে সহসা মনে হইতে পারে যে শঙ্কর বিষয়জগতের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন; কারণ তিনি নানা যুক্তিদ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বিষয় বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তু। কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার উক্তিগুলি পাঠ করিলে এবং তাঁহার অন্যত্র ব্যক্ত মতের সহিত সেইগুলির সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় যে বিষয়ের স্বতন্ত্রতা স্থাপন করা তাঁহার ঐ সকল উক্তির উদ্দেশ্য নহে। তিনি যখন অসংখ্য স্থলে সমুদায় বিষয়কে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র প্রকৃতিবাদী সাংখ্য-

দিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাতে বিষয়ের স্বতন্ত্রতাবাদ আরোপ করা যায় না। সুতরাং ঐ স্থলে যে বিষয়ের স্বতন্ত্রতার কথা, বাহ্যতার কথা বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্টতঃ ব্যক্তিগত সসীম বিজ্ঞান সম্বন্ধে—ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান সম্বন্ধে। বৌদ্ধগণ যে বিষয়কে ব্যক্তিগত ক্ষণিক-বিজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, শঙ্কর সেই মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিষয়মাত্রই যে স্থায়ী পরমাত্মার জ্ঞানাশ্রিত এবং সেই স্থায়ী জ্ঞানেই যে তাহা প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়, এই সত্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আশ্রয়রূপী সর্ব্বসাক্ষী স্থায়ী জ্ঞান স্বীকার করা যে অবশ্যম্ভাবী, এই বিষয়ে উক্ত পাদের ৩১তম সূত্রের ভাষ্য হইতে একটী উক্তি উদ্ধৃত করিলাম:—"যদপ্যালয়বিজ্ঞাননাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাদনবস্থিতরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবন্ন বাসনানামধিকরণং ভবিতুমর্হতি। ন হি কালত্রয়সম্বন্ধিন্যেকস্মিন্নন্বয়িন্যসতি কূটস্থে বা সর্ব্বার্থ-দর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষ-বাসনাধীনস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। স্থিররূপত্বে ত্বালয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ।" অর্থাৎ—বৌদ্ধেরা যে বিজ্ঞানাবলীর আশ্রয়স্বরূপ আলয়বিজ্ঞান কল্পনা করেন, তাহাও যখন তাঁহাদের স্বীকার মতেই ক্ষণিক, সুতরাং অস্থায়ী, তখন প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় তাহাও বিজ্ঞানাবলীর আশ্রয় হইতে পারে না। ফলতঃ কালত্রয়-সম্বন্ধী, অপরিবর্ত্তনীয় বা সর্ব্ববিষয়দর্শী একজন সংযোগকারী না থাকিলে দেশকালরূপ নিমিত্তের আশ্রিত বিজ্ঞানপরম্পরার অধীন স্মৃতি ও পরিচয় প্রভৃতি কার্য্য সম্ভব নহে।

ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে কৃষ্ণরূপী ভগবান্ ভূমি জল প্রভৃতি আপনার অষ্টধা প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া তৎপর বলিতেছেন,—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" অর্থাৎ—হে মহাবাহো, ইহা আমার অপরা প্রকৃতি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা অন্য এক প্রকৃতির বিষয় অবগত হও, যাহা জীবভূতা এবং যদ্দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে। এ স্থলে স্পষ্টতঃই জড়রূপা অপরা প্রকৃতিকে জ্ঞানরূপ পরা প্রকৃতির আশ্রিত বলা হইয়াছে।

৩। জীব-ব্রহ্মের একত্ব।—জীব-ব্রহ্মের একত্বসূচক অসংখ্য

শ্রুতি, যথা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (মাণ্ডুক্য) 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য, ষষ্ঠাধ্যায়), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০।) ইত্যাদি উদ্ধৃত হইতে পারে; কিন্তু একত্ব যদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এমন পরিষ্কার ব্যাখ্যা, শ্রুতি বা শ্রুত্যনুসারী স্মৃতি বাহির করা বড় কঠিন। এই বিষয়ক কতিপয় ইঙ্গিত সংগ্রহপূর্ব্বক আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। জীবগত আত্মাকে যদি বৈদান্তিকগণ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তবে কদাচ "সোঽহম্" প্রভৃতি ব্রহ্মাত্মৈক্যসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে তাঁহারা আত্মাকে অতি মহৎ অনন্ত বস্তু বলিয়া বোধ করিতেন। কঠোপনিষদ্ তৃতীয় বল্লীতে এই মহত্ত্ব অনেকটা ইঙ্গিতীকৃত হইয়াছে, যথা—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধি-র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ (১০।১১।) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে (জগতের বীজস্বরূপ) অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; তাহাই শেষ, তাহাই পরা গতি।" ঋষি বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ এই যে বিষয়সমূহ হইতেই, বিষয়োপকরণেই, ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। বিষয়-সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ বিষয় মন-সাপেক্ষ, মনেরই বিকারসমষ্টি মাত্র। শঙ্কর-প্রণীত অথবা শঙ্করের নামে কোন শিষ্যপ্রণীত 'বিবেক-চূড়ামণি'তে বলা হইয়াছে, "তৎ সর্ব্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্," এই সমস্ত বিষয় মনেরই প্রকাশ। তার পর, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ মন সঙ্কল্প-বিকল্পা-ত্মক; বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা; মন অস্থায়ী, কিন্তু বিজ্ঞানাধার বুদ্ধি স্থায়ী মূলতত্ত্বের সমষ্টি। যাহা হউক, মন-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ কালগত জগৎ অতিক্রান্ত হইল; অতঃপর দেশ কালাতীত আত্মজগৎ। তাই ঋষি বলিয়াছেন "বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ"। বুদ্ধি আত্মার শক্তি মাত্র, শক্তি হইতে শক্তিমান্ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই মহান্ আত্মা জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভ। "অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং

মহান্ আত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।" (শঙ্করকৃত উপনিষদ্ভাষ্য)। তৎপর মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, তার কারণ অব্যক্ত অর্থাৎ জগতের বীজশক্তিই জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব-কারণ; কার্য্যাপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ, তাই অব্যক্তের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এই অব্যক্তও পরম পুরুষের শক্তিমাত্র, সুতরাং পরম পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়হইতে পরম পুরুষ পর্য্যন্ত আসা অপরিহার্য্য অবশ্যম্ভাবী চিন্তার ফল, তাই ঋষি এত দূর আসিয়াছেন। যিনি চিন্তাক্ষম, ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাকেই এত দূর আসিতে হইবে। কিন্তু ইহার উপরে আর যাইবার স্থান নাই, কারণ দেশ, কাল, পরিমাণ, আধার-আধেয়, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি সমস্ত মূলতত্ত্বই এই পরম পুরুষে পরিতৃপ্ত, পর্য্যবসিত হয়, তাই ঋষি বলিয়াছেন, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তিনিই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ গতি।

উক্ত উপনিষদেই অন্যত্র (৪।১০) বলিয়াছেন, "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" অর্থাৎ—যিনি এখানে তিনিই সেখানে। যিনি সেখানে তিনিই এখানে। যে ইহাঁকে ভিন্ন বলিয়া দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়। 'এখান-সেখানে'র যোগসূত্র যে আত্মা, সমুদায় ভেদের আশ্রয়রূপী আত্মা যে স্বয়ং অভেদ, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ঋষি এই বচন উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন এবং অভেদ অবিনাশীর সহিত একত্বে অমরত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া থাকিবেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি সূত্রাত্মা অন্তর্যামীকে জানেন কি না। যাজ্ঞবল্ক্য বায়ুকে সূত্রাত্মা রূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক তৎপর অন্তর্যামী সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।" অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, যিনি পৃথিবীর অন্তরস্থিত, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অমৃত। ঠিক এই ভাষায়ই যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র তারকা,

অন্তরীক্ষ, অন্ধকার, তেজ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান ও রেত, এই সমুদায়ের অন্তর্যামী বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই ভাবের শ্রুতি অসংখ্য। অন্তরস্থ আত্মবস্তুকে অসীম বলিয়া অনুভব করাতে সর্ব্বত্রই ঋষিদের আত্মস্ফূর্ত্তি হইত।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ষষ্ঠ প্রপাঠক, ৮ম হইতে ১৬শ খণ্ড পর্য্যন্ত যে "তত্ত্বমসি"র ব্যাখ্যা আছে, তাহার উল্লেখমাত্র করিব। এই ব্যাখ্যা উপমামূলক, সুতরাং ইহার দার্শনিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। তবে যে শ্রুতিটির অন্তে এই "মহাবাক্য" আছে এবং যাহা এই নয় খণ্ডে নয় বার উক্ত হইয়াছে, সেটি উল্লেখযোগ্য। "য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" অর্থাৎ—যিনি এই সূক্ষ্ম বস্তু, সমুদায় জগৎ তাঁহাতেই আত্মবৎ, অর্থাৎ জগৎ তন্ময়; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তিনি তুমি।"

৪। ভূমা—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ষষ্ঠ প্রপাঠকে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে যে ভূমা-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অতীব চিন্তাপূর্ণ। সনৎকুমার নারদের শিক্ষার জন্য ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতর বস্তুপরম্পরা বর্ণনা করিয়া অবশেষে "সুখে" আসিলেন। ঋষির বর্ণিত বস্তুপরম্পরা ঠিক বিজ্ঞানপর্য্যায়ে স্থাপিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহার আদর্শ ও মূল প্রণালী ঠিক। যাহা হউক, সুখে আসার পর সনৎকুমার বলিতেছেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি" (ত্রয়োবিংশ খণ্ড)। অর্থাৎ—"যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। অতএব হে ভগবন্, ভূমার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করুন্।" তৎপর ভূমার সংজ্ঞা দিতেছেন,—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবো কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি।" অর্থাৎ—যাঁহাতে সাধক অন্য কিছু দেখেন না, অন্য কিছু শুনেন না, অন্য কিছু জানেন না, তিনি ভূমা; আর যাঁহাতে তিনি অন্য কিছু দেখেন, অন্য কিছু শুনেন, অন্য

কিছু জানেন, তাহা অল্প। যিনি ভূমা, তিনি অমৃত, যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য। হে ভগবন্, তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত? নারদ এই প্রশ্ন করাতে সনৎকুমার এই উত্তর করিলেন—আপন মহিমাতে, অথবা মহিমাতে নহে। এ স্থলে অনন্তের অতি সত্য ধারণা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্রুতির শেষাংশ বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। প্রাকৃত বুদ্ধি অনন্তকে জানিয়াও যেন নিজ জড়তা সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাই অনন্তকে অদ্বিতীয় সত্তান্তর-নিরপেক্ষ জানিয়াও জিজ্ঞাসা করে, "অনন্ত কোথায় থাকেন?" যেন অনন্তের পক্ষে আবার "কোথায়" সম্ভব। এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্যই সনৎকুমার "স্বে মহিম্নি" রূপ নির্দোষ উত্তরটি দিয়াও পুনরায় ইহা প্রত্যাহার করিলেন; বলিলেন "ন মহিম্নি", কি জানি পাছে শ্রোতা ভূমা ও ভূমার মহিমার মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আনিয়া ফেলেন এবং তদ্দ্বারা ভূমার অনন্তত্বে ও অদ্বিতীয়ত্বে আঘাত করেন। ভাবটা এই যে 'মহিমা' বলিতে যদি ভূমা ছাড়া অপর কিছু বুঝ, তবে বলি 'ন মহিম্নি'।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা।

বৈদান্তিকগণ যে-কোন ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। চঞ্চলমতি, শ্রদ্ধাবিহীন, অবিনীত ব্যক্তি সুকঠিন ব্রহ্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে অক্ষম। যদি সে প্রখর বুদ্ধিবলে কোন প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্বের বহিরঙ্গ বুঝিতেও সক্ষম হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার পক্ষে ব্রহ্মলাভ অসম্ভব। যাহার অহঙ্কার বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পক্ষে অধীত ব্রহ্মজ্ঞানের অপব্যবহার করাই সম্ভব। সে তাহার বাসনা-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র অহঙ্কারকে ব্রহ্মের সহিত এক মনে করিয়া অবিনীত, ভক্তিহীন, এমন কি দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মলাভের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। ঈদৃশ কারণে প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সহজে কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিতেন না। শিক্ষার্থ আগত ব্যক্তিতে প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা আছে কি না, তাঁহারা তাহা দেখিতেন। তাহা না দেখিতে পাইলে উপদেশারম্ভের পূর্ব্বে তাহার যোগ্যতা-সাধনে প্রয়াস পাইতেন। প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া

যার সুকেশা প্রভৃতি ছয় জন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঋষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলে, ঋষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জানিয়াও পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন করিতে বলিলেন। তৎপর সংবৎসরান্তে পুনরায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় সত্যকাম জাবালি শিষ্যত্বে বৃত হইয়াও আচার্য্যের গোচারণে প্রেরিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগমন করিয়া গুরূপদেশ লাভ করিলেন। এই গোচারণ উপলক্ষে তাঁহার চিত্ত এতদূর বিনীত, ধৈর্য্যশীল ও প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধবশতঃ চিন্তাপ্রবণ হইল, যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনের অল্প কাল পরেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। কঠোপনিষদে মৃত্যু নানা কাম্য বস্তুর লোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক যখন দেখিলেন নচিকেতা সমুদায় বিষয় বাসনার অতীত, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করেন, তখনই তাঁহাকে উপদেশদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে নচিকেতা ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন না। বিশুদ্ধাত্মা না হইলে কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না। এই বিষয়ে উক্ত উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
(২য়া বল্লী, ২৪তমা শ্রুতি।)

অর্থাৎ অন্যায়াচরণ হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত ও অশান্তমানস ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।"

ক্রমশঃ বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা-সাধক গুণসমূহকে সাধন-চতুষ্টয়ে সমষ্টীভূত করিলেন। সেই সাধনচতুষ্টয় এই,—"নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকঃ, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ"। (শারীরক মীমাংসার প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য)। অর্থাৎ—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদবোধ, ইহকালে ও পরকালে স্বীয় পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ বিষয়ে বিরাগ, শমদম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি এবং মুক্তিলাভের ইচ্ছা। শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এই,—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা। এই সকল শব্দের অর্থ আমরা স্বামী গোবিন্দানন্দকৃত "ভাষ্য রত্নপ্রভা" নাম্নী টীকা

হইতে অনুবাদ করিলাম,—লৌকিক ব্যাপার হইতে মনের উপরমের নাম 'শম'। বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম 'দম'। জ্ঞানার্থ বিহিত নিত্যাদি কর্ম্মসন্ন্যাস 'উপরতি'। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন 'তিতিক্ষা'। নিদ্রালস্য প্রমাদ ত্যাগ-পূর্ব্বক মনের স্থৈর্য্য 'সমাধান'। সর্ব্বত্র আস্তিকতা 'শ্রদ্ধা'। কোন কোন মতে উপাসনা চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধক। 'বেদান্তসার'-প্রণেতা যোগী সদানন্দ উপাসনার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন;—"উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসিক ধ্যানরূপ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি 'উপাসনা'। ছান্দোগ্যোপনিষদে নানা-প্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রপাঠক, চতুর্দ্দশ খণ্ডের অন্তর্গত শাণ্ডিল্যবিদ্যা একটী অতি উৎকৃষ্ট উপাসনা।

ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

তৃতীয় ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা।

ব্রহ্মতত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত।

আজকাল এক দেশব্যাপী ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে। হরিসভা, হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারিণী, হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা সকল এবং সাময়িক বক্তৃতা, আলোচনা, সঙ্কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক। কিন্তু ইহার বিশেষ পরিচয় বর্ত্তমান সাহিত্যে। এই জিজ্ঞাসার মোহন রবে রাজনীতি-সংস্কারক রাজ-নৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া নগরসঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন; রাজনীতি-লেখক মেমোরিয়াল লেখা ছাড়িয়া "অমিয় নিমাইচরিত" লিখিতেছেন। সাহিত্য-সমালোচক শকুন্তলাতত্ত্বের পর লয়তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। পলাশীযুদ্ধের বিষাদ-গাথা গাহিয়া যে বীণা নীরব ছিল, সে আবার নবীন ঝঙ্কারে রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে কৃষ্ণগুণ গান ধরিয়াছে। যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গীয় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্রের অনুবাদে ও বহুল প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি যাঁহার তুলিকা এক সময় দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েসা অতুলনীয় প্রেমচ্ছবি ও বিষবৃক্ষে নৈপুণ্য-ময় সমাজচিত্র আঁকিয়াছিল, তাঁহারই লেখনী আবার আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছে। আজ আমরা সেই লেখক-শিরোমণির ধর্ম্মমত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জগতে দুই প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়; (১) সেশ্বর ধর্ম্ম (২) নিরীশ্বর ধর্ম্ম। বৈষ্ণব, খ্রীষ্ট ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম্ম সেশ্বর। বৌদ্ধ ও

কোম্‌ৎ ধর্ম্ম নিরীশ্বর। বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

উপাস্য, উপাসক, প্রয়োজন ও অভিধেয় এই চতুরঙ্গ লইয়াই সেশ্বর ধর্ম্ম গঠিত। উপাস্য কি? উপাসক কি? সাধ্য কি? সাধনা কি? এই চারি বিষয়ের উপদেশ সকল সেশ্বর ধর্ম্মেই আছে। এই চারি প্রশ্নের কোন একটির সদুত্তর দিতে না পারিলে ধর্ম্মের পূর্ণতা রক্ষা হয় না। এখন দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈষ্ণব গুরুকে "অনুশীলন-ধর্ম্ম" এই চারি গুরুতর প্রশ্নের কি উত্তর দেন।

উপাস্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগৎ হইতে পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে। সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান।" ঈশ্বর নিরাকার। নিরাকার হইলেও সর্ব্বশক্তিমত্তা হেতু জগতের হিতার্থে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানবের পূর্ণ আদর্শ শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য।

উপাসক কি? ইহার পরিষ্কার উত্তর কোথাও পাই নাই। তবে ধর্ম্মতত্ত্বে আত্মা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "আত্মাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) ভালবাসিলাম। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব, সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই।"

সাধ্য কি? বঙ্কিম বাবুর মতে সুখই সাধনের চরম অবস্থা বা সাধ্য। "সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি তাহার অংশ মাত্র। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। ভক্তিশাসিত অবস্থাই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহা প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ। ইহাই প্রকৃত নিষ্কামধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী-সুখ।"

সাধন কি? বঙ্কিম বাবু বলেন, সাধন দুই প্রকারের—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট।

১। সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে ন্যস্ত করিয়া অন্য-ভজনারহিত ভক্তিযোগদ্বারা ভগবৎ-ধ্যান ও উপাসনা।

২। অভ্যাসযোগ দ্বারা ঈশ্বরে চিত্ত-স্থৈর্য্যের চেষ্টা।

৩। ঈশ্বরে মনঃস্থির করিবার জন্য ঈশ্বরাদিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম।

৪। সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগ।

এই চতুর্ব্বিধ সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন।

"পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি উপহার নিকৃষ্ট উপাসনা। প্রতিমাদি পূজাও এই উপাসনার অন্তর্গত। অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির ইহা অবলম্বনীয়।"

উপরোক্ত চারি প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এখন উত্তরগুলি সদুত্তর কি না বিবেচ্য।

উপাস্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, ঈশ্বর নিরাকার হইলেও সর্ব্বশক্তিমত্তা হেতু মানবদেহ ধারণ করিতে পারেন। পারেন ঠিক, যিনি বিশ্বদেহ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পক্ষে মানবদেহ ধারণ অসম্ভব নহে। কিন্তু মানব দেহই ত মানুষ নহে; বিস্মৃতি প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ক্রমোন্নতিশীল জ্ঞানই মানবের মানবত্ব। ঈশ্বরকে এই মানবত্ব গ্রহণ করিতে হইলে বিস্মৃতি ও ক্রমোন্নতির অধীন হইতে হয়। এ প্রকার অপূর্ণতা ও অধীনতা জীবোপহিত চৈতন্য ভিন্ন স্বাধীন পূর্ণ চৈতন্যে সম্ভবে না। যদি বল, মানবদেহে অবতীর্ণ অবস্থাতেও তিনি বিস্মৃতি ও ক্রমোন্নতির অধীন হন না। তবে তিনি মানবদেহধারী হইয়াও অতিমানব। মানব প্রকৃতি হইতে তাঁহার প্রকৃতি ভিন্ন। মানবের আদর্শ হইবার জন্য যদি ঈশ্বরের নরদেহে-পূর্ণ অবতার প্রয়োজন হয়, তবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন শুধু মানবদেহ-ধারী অবতারে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। কথাটা বড় স্পষ্ট হইল না। আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। নিকৃষ্টের উন্নতির জন্যই আদর্শ চাই। শুধু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চরিত্র সম্মুখে ধরিলেই আদর্শ হইল না। নিকৃষ্ট বুঝিবে যে তাহার নিকৃষ্ট প্রকৃতি ও আদর্শের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি মূলে এক। অনু-শীলন প্রভাবে একটি উৎকৃষ্ট, তদভাবে অপরটি নিকৃষ্ট। পার্থক্য অনুশীলনে, প্রকৃতিতে নহে। ঈশা, বুদ্ধ আদর্শ হইতে পারেন; কারণ তাঁহাদের জীব-

নের কোন না কোন অংশে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। সংগ্রামেই তাঁহাদের মানবত্ব প্রকাশিত এবং এই মানবত্বেই আপামর সাধারণের সহিত তাঁহাদের প্রকৃতিগত একত্ব। একত্ব না দেখিলে লোকে তাঁহাদিগকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিত না। প্রকৃতিগত একত্বই যদি আদর্শ হইবার পক্ষে অপরিহার্য্য হয়, তবে বঙ্কিমবাবুর অতিমানব প্রকৃতিসম্পন্ন, মানবদেহধারী পূর্ণ অবতার আদর্শ হইতে পারেন না। মানব প্রকৃতি ধারণ না করিয়া তাঁহার পক্ষে শুধু মানবদেহ ধারণ অর্জ্জুনের রথাগ্রে শিখণ্ডীস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভীষ্ম বেশ জানিতেন, যে শক্তি অস্ত্রপ্রয়োগে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত করিতেছে তাহা অর্জ্জুনের, শিখণ্ডীর নহে। তেমনি মানুষ ভাবিবে যোগস্থ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করা অতি মানবপ্রকৃতিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব, মানুষের পক্ষে নহে। ক্ষীরোদ সাগরমন্থন করিয়া দেবতারা সুধা পাইয়াছিলেন। সুধালাভ বাঞ্ছনীয় হইলেও সমুদ্রমন্থন দেবতারই সাধ্য, মানবের নহে। দেবতাদিগকে অদ্ভুতকর্ম্মা বলিয়া মানুষ পূজা করিতে পারে, কিন্তু অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে না। কারণ, তাহারা জানে যে মানবপ্রকৃতি ও দেবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব শ্রীকৃষ্ণে অতিমানব প্রকৃতি আরোপ করিলে তিনি আর মানবের আদর্শ রহিলেন না; এরূপ তর্কের আশঙ্কা করিয়াই বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্য্যদ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।"

"আমরা যাহা বলিলাম, তাহা কেবল আমাদের মত এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও এই মত। বিষ্ণু পুরাণে আছে—

"জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্য ধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, এই জন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন সাম, দান, দণ্ড-ভেদ প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্য দেহিদিগের ক্রিয়ার অনুবর্ত্তী সেই জগৎপতির এরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।"

"আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি ইহার পর কোন পাঠক মনে করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষ শক্তিদ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।"

বঙ্কিমবাবু স্থানান্তরে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার সম্ভব ইহা সমর্থন করিতে যাইয়া যদি অবতারে অতিমানবত্বের আরোপ না করিতেন তবে তাঁহার এরূপ ভরসা করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তিনি এক শ্রেণীর লোকের আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া এক স্থলে বলিয়াছেন "তাহাদের মনের ভিতরে এমনই একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য জন্মে যে সকল দুঃখ,—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয় পরাজয়, জরা, মরণ, এই সকলে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই ঈশ্বর বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকুও আসেনা যে, তিনি সুখ দুঃখের অতীত—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয় যেমন তাঁহার লীলা, এ সকল তেমনই তাঁহার লীলা মাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা করিলে সংহার করিতে পারেন তাহাদের ধ্বংশের জন্য মনুষ্য জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, যে যাঁহার কাছে অনন্তকালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য জীবন পরিমিতকালে প্রভেদ কি?" সম্ভাবিত অবতারের লক্ষণ বাস্তব অবতার শ্রীকৃষ্ণে থাকা চাই। নহিলে তাঁহার পূর্ণাবতারত্ব বজায় থাকে না। তবেই বলিতে হইবে গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয় পরাজয়, জরা মরণ, এই সকলে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ পান নাই। গর্ভাবস্থান অবধি তিনি সুখ দুঃখের অতীত ছিলেন। আমাদের নিকট পলক পলকমাত্র, অনন্ত কাল অনন্ত কালই, কিন্তু তাঁহার নিকট অনন্ত কালও পলকমাত্র ছিল। তাঁহার নিকট মুহূর্ত্তও মানবজীবন-পরিমিত কালে কোন প্রভেদ ছিল না।" ভাবিয়া বিস্মিত হই যে সুনিপুণ চরিত্রচিত্রকর বঙ্কিমচন্দ্র এই অদ্ভুত চরিত্রচিত্রে কিছুই অতিমানব, অতিপ্রাকৃত দেখিলেন না। আমরা কিন্তু গর্ভাবস্থান অবধি সুখ দুঃখাতীত অনন্ত কাল-পলকবৎদর্শী শ্রীকৃষ্ণকে অতিমানব প্রকৃতিসম্পন্ন না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পাঠকও বোধ হয় তাই বলিবেন। অতিমানব প্রকৃতিসম্পন্ন হইলে তিনি আর আদর্শ রহিলেন কৈ?

বঙ্কিমবাবু উপসংহারে এক স্থলে বলিয়াছেন "যিনি মানুষী শক্তিদ্বারা অমানুষ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঈশ্বর হওয়ার পক্ষে সম্ভাবনা আছে কি না পাঠক আপন আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে বিচার করিয়া লইবেন।" এক জনকে গর্ভাবস্থা হইতে সুখ দুঃখাতীত, অনন্ত কাল-পলকবৎদর্শী অর্থাৎ অমানুষ-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া আবার তিনি মানুষী শক্তিদ্বারা অমানুষ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গতিদুষ্ট। অসঙ্গতির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি অতিমানব প্রকৃতি নহে, তাঁহার প্রকৃতি মানব প্রকৃতিই, ক্রমোন্নতির নিয়মে অনুশীলিত হইয়া অতি-মানবত্বে পরিণত হইয়াছে বা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছে, তবে আর বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্ম ভক্তির ধর্ম্ম রহিল না। আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পূর্ণ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগামী হইয়া সকলকেই সেইরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হইবে। তবেই দাঁড়াইল যে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তিই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ভক্তি উপায় হইতে পারে, উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, সমগ্র বৃত্তিগুলির ঈশ্বরমুখতাই ভক্তি এবং ভক্তিই সাধ্য, এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার করিতে যাইয়া মানব প্রকৃতি হইতে অতিমানব প্রকৃতি বা ঈশ্বরত্ব লাভ সম্ভব স্বীকার করিলে, তাঁহার অনুশীলন ধর্ম্মে ভক্তি আর সাধ্য রহিল না। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার স্বীকার করিতে হইলে ভক্তি সাধ্য ইহা অস্বীকার করিতে হয়; আর ভক্তিই সাধ্য ইহা স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ ভগবদবতার, ইহা অস্বীকার করিতে হয়।

বঙ্কিমবাবু নিজেই এই অসঙ্গতি দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন, "কেবল একটা কথা বাকি আছে। ধর্ম্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ, তাঁহার ভক্তি-স্ফূর্ত্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হন, তবে তাঁহার ভক্তির পাত্র কে? নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পর-মাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে; ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ কথিত আছে—'যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন, আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।'"

"ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম, আত্মা জগন্ময়, তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকারে বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝিতে পারি না।"

জ্ঞানমার্গের চরম আত্মরতিই যদি ভক্তি হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম বা আত্মভক্ত হন, তবে সকলকেই আদর্শ শ্রীকৃষ্ণের মত আত্মারাম বা আত্মভক্ত হইতে হইবে। আদর্শ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির পাত্র তিনি নিজে বলিলে চলিবে না, প্রত্যেক ব্যক্তির ভক্তির পাত্র সেই ব্যক্তি নিজে। নহিলে ভক্তি আর আত্মরতি এক পদার্থ রহিল না। আদর্শের পক্ষে আত্মরতি যদি ভক্তি হয়, সাধ্য হয়, তবে আদর্শানুগামীর পক্ষেও আত্মরতিই ভক্তি ও সাধ্য হইবে। আর আদর্শানুগামীর পক্ষেও আত্মরতি ভক্তি ও সাধ্য হইলে বঙ্কিমবাবু যে সমগ্র বৃত্তিগুলির ঈশ্বরমুখতাকে ভক্তি বলিয়াছেন তাহা যথাযথ হয় নাই। সমগ্রবৃত্তিগুলির আত্মমুখতাই ভক্তি বলিতে হইবে। যদি বলা হয় আত্মা জগন্ময়, আত্মমুখতা আর ঈশ্বরমুখতা একই কথা, তবে প্রত্যেকের আত্মরতিই ভক্তি। বঙ্কিমবাবুও একস্থলে বলিয়াছেন—"আত্মাকে ভালবাসিলেই তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) ভালবাসিলাম। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। তবে আত্মরতিই ভক্তি, এবং ইহা প্রত্যেকের পক্ষেই সাধ্য বা লভ্য। এই আত্মরতি লাভের জন্যই অনুশীলন, এবং মূর্ত্তিমান অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণরূপ আদর্শ আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ কি অনুশীলন প্রভাবে আত্মারাম হইয়াছিলেন? যদি হইয়া থাকেন তবে আত্মারাম হইবার পুর্ব্বে তিনি পুর্ণ ঈশ্বরাবতার ছিলেন না। কারণ ঈশ্বর যিনি তিনি নিত্য আত্মারাম। দু'দশ বৎসর পূর্ব্বে আত্মারাম ছিলেন না, পরে আত্মারাম হইলেন, এরূপ কথা তাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না। আর যদি তিনি অনুশীলন প্রভাবে আত্মারতি লাভ না করিয়া থাকেন, আত্মরতি যদি তাঁহার প্রকৃতি হয়, তবে তিনি আদর্শ নহেন। কারণ যে যাহার অনুশীলন করে নাই সে সেই বিষয়ের আদর্শ হইতে পারে না।

উপাসক কি? ইহার উত্তরে বঙ্কিমবাবু পরিষ্কার কিছু বলেন নাই; সুতরাং তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

সাধ্য কি? বঙ্কিমবাবু বলেন সুখের উপায় ধর্ম্ম, ও মনুষ্যত্বেই সুখ। আবার মনুষ্যত্বই মানবের ধর্ম্ম। সুতরাং মানবত্বের বা মানবজীবনের উদ্দেশ্যই সুখ। তাই কি? যদি সুখই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সকল বৃত্তির সমঞ্জসীভূত উন্নতি করিব কেন? বঙ্কিমবাবু বলেন এই সমবায়েই সুখ। সমবায়ে সুখ থাকিতে পারে। কিন্তু কোন একটি বৃত্তির স্ফূরণ ও চরিতার্থতাতেও সুখ। একটীর অনুশীলন করিলেই যদি সুখ লাভ হয়, তবে সকল গুলির অনুশীলন করিতে যাইব কেন? শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাতে বৃত্তির স্ফূরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব? আপনি তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখান নাই। আপনি বুঝাইয়াছেন বটে যে ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা। কিন্তু তদুত্তরে যদি বলি যে ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন? উত্তরে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "ইহাতে শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়ও পশুত্বে অধঃপতন হয়, এই হেতু ইন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফূরণ ও চরিতার্থতাই সুখ নয়।" সদুত্তর হইল না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, আয়ুক্ষয় অপরিমিত অনুশীলনেরই ফল। পরিমিত অনুশীলনে তাহা হইবে না। আর রোগ, ক্লান্তি না হইলে মনস্তাপ হইবে কেন? অপর একটী কারণে মনস্তাপ জন্মিতে পারে, তাহা সুখাতীত শ্রেয়ঃ বোধ। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর মতে যখন সুখ বৈ আর শ্রেয়ঃ নাই, তখন মনস্তাপ কেন হইবে? বাকি, পশুত্বে অধঃপতন। পশুত্বটা অধঃপতন কিসে? সুখই যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পশুত্ব কেন বাঞ্ছনীয় নহে? পশুদের মত সুখী কে? বর্ত্তমানে অতৃপ্তিই অসুখের কারণ। পশুদের তাহা নাই, সুতরাং তাহারা অসুখী নহে। শ্রেয়ঃ প্রেয়ের দ্বন্দ্বেই মানবজীবনের যত অসুখ। পশুত্ব লাভে যদি এই দ্বন্দ্বমুক্ত হওয়া যায়, তবেই অসুখ-মুক্ত হওয়া গেল বা সুখপ্রাপ্তি হইল। বঙ্কিমবাবু এই অবস্থাকে পশুত্ব বলিতে পারেন, কিন্তু অধঃপতন ও অবাঞ্ছনীয় বলিতে পারেন না। তিনি সুখবাদের বেতস্ সোপানে আরোহণ করাইয়া মানুষকে মানবত্বে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভাবেন নাই যে উহা সহজেই নত হইয়া তাহাকে পশুত্বে পাতিত করিবে। যদি বল যে সুখ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ নিকৃষ্ট সুখ, শুধু ইহারই অনুশীলন করিলে

২। "নীতিবিজ্ঞানালোচনা"।—("এথিক্যাল্ ষ্টাডিজ্) এফ্, এচ্, ব্র্যাড্‌লী-প্রণীত। ইহাতে হেগেল-প্রবর্ত্তিত নীতিবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সেই ভূমি হইতে অন্যান্ত নীতি-বিজ্ঞানের সমালোচনা আছে। শেষ ভাগে আধ্যাত্মিক সাধন-তত্ত্বেরও আভাস আছে।

৩। "জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা।"—(ষ্টাডিজ্ ইন্ লজিক্) উপরি-উক্ত লেখক-প্রণীত। ইহা এক খানি গভীর গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪। "প্রাতিভাসিক সত্তা ও প্রকৃত সত্তা"।—("য়্যাপিয়ারেন্স্ য়্যাণ্ড্ রিয়ালিটি) উপরিউক্ত লেখক-প্রণীত। এই পুস্তক অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লেখক হেগেলীয় মত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া বেদান্তমতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্তদর্শনের নিকট কোন ঋণ স্বীকার করেন নাই। পুস্তকের প্রথমাংশে প্রকৃত সত্তা স্ববিরোধাতীত, এই মূলসূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেশকালগত বস্তু সম্বন্ধীয় আমাদের যাবতীয় ধারণা স্ববিরোধিতা-দোষে দূষিত, সুতরাং সমুদয় জগৎ, সসীম আত্ম-জগৎ পর্য্যন্ত, প্রাতিভাসিক; কিছুরই প্রকৃত সত্তা নাই। দ্বিতীয় অংশে (১) অনন্তের অস্তিত্ব, (২) অনন্তের স্বরূপলক্ষণ, (৩) অনন্তে সসীমের অভেদ ভাবে স্থিতি, (৪) সগুণ ব্রহ্মভাবের আপেক্ষিক সত্য, (৫) নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ, (৬) অমরত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু হেগেলের ন্যায় সেই জ্ঞানকে ভেদযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মের জ্ঞান সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক ও ভেদশূন্য; ভেদ কেবল সসীম জ্ঞানেই আছে। তিনি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। জগতের দুঃখরাশি ব্রহ্মের আনন্দে এমন ভাবে ডুবিয়া আছে যে, তাহা আর দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরভাব সম্বন্ধে আমাদের যে অভ্যস্ত ধারণা, তাহা লেখকের মতে অপরিহার্য্য এবং সাধারণের অন্যান্য ধারণা অপেক্ষা সত্যতর, সুতরাং দৈনন্দিন কার্য্যে অপরিত্যাজ্য। লেখক নীতি ও আধ্যাত্মিক ভাবযোগে ধর্ম্মসাধন, এমন কি ঈশ্বরের সহিত একতা-সাধন, অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অমরত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। "নীতিবিজ্ঞানের মূল-সূত্রাবলী"।—(প্রোলেগোমেনা টু এথিক্স্) টমাস হিল্ গ্রীণ-প্রণীত। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রথমাংশে হেগেলীয় ভেদাভেদাত্মক অদ্বৈতবাদ সংক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াংশে নীতির দার্শনিক ভিত্তি ও নৈতিক জীবনের বিকাশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৬। "ধর্ম্মের বিকাশ"।—(ইবলিউসন্ অব্ রিলিজিয়ন্) এড্‌বার্ড্ কেয়ার্ড্-প্রণীত। ইহাতে হেগেলীয় মূল-সূত্রানুসারে প্রধান প্রধান ধর্ম্মতন্ত্রের বিকাশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৭। "দর্শনের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দিক্"।—(রিলিজিয়স্ য়্যাস্‌পেক্ট্ অব্ ফিলসফি") যুক্তরাজ্যবাসী জোসিয়া রয়স্-প্রণীত।

৮। উক্ত রাজ্যবাসী জে, ডিউই-প্রণীত মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ।

৯। নীতিবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা"।—(এলিমণ্ট্‌স্ অব্ এথিক্স্) এইচ্ মূরহেড্-প্রণীত।

হেগেল-দর্শনের ব্যাখ্যা অথবা হেগেল-দর্শনের ভূমি হইতে মতান্তরের সমালোচনাযুক্ত ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান ঃ—(১) জেম্স্ হচিসন্ ষ্টারলিং-কৃত "সিক্রেট্ অব্ হেগেল" ও (২) "টেক্স্‌ট্‌বুক্ টু কাণ্ট্", (৩) টমাস হীল গ্রীণের গ্রন্থাবলী, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ (৪) এড্‌বার্ড কেয়ার্ড-কৃত "ক্রিটিক্যাল্ ফিলসফি ও কাণ্ট্", (৫) ওয়াট্‌সন্-কৃত "কাণ্ট্ য়্যাণ্ড্ হিজ্ ইংলিশ্ ক্রিটিক্স্" (৬) ওয়ালেস্-কৃত "প্রোলেগোমেনা টু হেগেল্‌স্ লজিক্"। (৭) এডবার্ড্ কেয়ার্ড্-কৃত "হেগেল"। এতদ্ব্যতীত বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে হেগেল-প্রণীত গ্রন্থাবলীর প্রায় সমুদায়েরই ইংরেজী অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সমুদায়ের বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক টমাস্ কারলাইল্ এবং যুক্তরাজ্যের পরম শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার র‍্যাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো এমারসন্ অদ্বৈত মতাবলম্বী। ইঁহারা হেগেল-কর্ত্তৃক কতদূর প্রভাবিত বলা যায় না। কিন্তু জর্ম্মণ্ চিন্তার সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা দার্শনিকভাবে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের প্রণীত প্রবন্ধাদি দ্বারা অদ্বৈত মত সরল ও বিস্তৃত ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এইজন্য সংক্ষেপে ইঁহাদের উল্লেখ করা গেল।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক।—পক্ষান্তরে তাহা কি যাহা সর্ব্বদাই আছে? "অবিনাশি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। 'অবিনাশি' অর্থাৎ বিনাশ যাহার স্বভাব নহে। 'তু' শব্দ সৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তদ্বিদ্ধি' তাহাকে জানিবে। কাহাকে জানিবে, না—যে সৎ-নামক ব্রহ্মদ্বারা এই সমস্ত জগৎ 'তত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত আছে, যেমন ঘটাদি বস্তুসমূহ তাহাদের সংশ্লিষ্ট আকাশ সহ মহাকাশদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। 'বিনাশ' অর্থাৎ অদর্শন, অভাব। (কাহার অভাব?)—এই অব্যয়ের—যাহার ব্যয় হয় না, উপচয় অপচয় প্রাপ্তি হয় না, যিনি অব্যয়, তাঁহার অভাব। এই সৎনামক ব্রহ্মের নিজ রূপের কোনও ব্যয় হয় না, অর্থাৎ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, যেহেতু তিনি দেহাদির ন্যায় অবয়বযুক্ত নহেন। তাঁহার আত্মীয় কোন বস্তু সম্বন্ধেও তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় না, যেহেতু তাঁহার আত্মীয় কিছু নাই। যেমন, দেবদত্ত ধনহানি বশতঃ বিচলিত হন, ব্রহ্ম সেরূপে পরিবর্ত্তিত হন না। অতএব এই অব্যয় ব্রহ্মের কেহই বিনাশ করিতে পারে না। কেহই আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না। ঈশ্বরও পারেন না, যেহেতু আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মবিনাশ অসম্ভব এইজন্যও বটে যে, নিজ আত্মাতে নিজে ক্রিয়া করা স্ববিরুদ্ধ ব্যাপার।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক।—পক্ষান্তরে সেই অসৎই বা কি যাহা নিজ সত্তাকে পরিবর্ত্তিত করে? 'অন্তবন্ত' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাহা বলিতেছেন। 'অন্ত' অর্থাৎ বিনাশ আছে যাহাদের তাহারা অন্তবন্ত, যেমন মৃগতৃষ্ণিকাদিতে উৎপন্না সৎবুদ্ধি প্রমাণ নিরূপণান্তে বিনষ্ট হয়; সেই বিনাশই তাহার অন্ত; সেই প্রকার, নিত্য, শরীরী অর্থাৎ শরীরবান্, অনাশী, অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণা-গোচর আত্মার এই সমস্ত স্বপ্ন-মায়াদির ন্যায় দেহ বিবেকিগণকর্ত্তৃক অন্তবন্ত অর্থাৎ বিনাশশীল বলিয়া উক্ত হয়। 'নিত্য ও অনাশী', এরূপ বলাতে পুনরুক্তি হয় নাই। কারণ সংসারে নিত্যত্ব এবং নাশ দুই প্রকার। যেমন দেহ ভস্মীভূত

হইয়া অদর্শন প্রাপ্ত হইলে ইহা নষ্ট হইয়াছে বলা হয়; আর যেমন বিদ্যমান থাকিলেও যদি রোগাদিযুক্ত হইয়া অন্য প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও লোকে তাহাকে নষ্ট বলে। এস্থলে 'অনাশী' এবং 'নিত্য' এই দুই বিশেষণদ্বারা এই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার অর্থাৎ এই আত্মার উভয় প্রকার নাশের সঙ্গে অসম্বন্ধ। তাহা না হইলে বলা যাইতে পারিত যে আত্মা পৃথিব্যাদির ন্যায় নিত্য; যাহাতে এই আপত্তি না হইতে পারে সেই জন্য বলিয়াছেন আত্মা নিত্য এবং অনাশী। অপ্রমেয় কি? না, যাহা প্রমেয় নহে অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ আয়ত্ত নহে। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে আত্মাকে আগম দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়, তাহার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও আত্মা পরিচ্ছেদ্য। না—তাহা নহে, কারণ আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। প্রমাণ-কর্ত্তাতে আত্মা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত থাকাতেই প্রমাণান্বেষণকারীর পক্ষে প্রমাণান্বেষণ সম্ভব হয়। "ইহাই আত্মা", ইহা পূর্ব্বে না জানিয়া কেহ প্রমেয় আত্মাকে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মা কাহারও অজ্ঞাত নহেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শেষ প্রমাণ যে শাস্ত্র, তিনিও, আত্মাতে যে সমুদয় অনাত্ম-ধর্ম্ম আরোপিত হয় কেবল তাহারই নিবর্ত্তনদ্বারা আত্মার প্রমাতৃত্ব প্রতিপাদন করেন; অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপন দ্বারা নহে। (আত্মাকে জানিবার জন্য শেষ প্রমাণ শাস্ত্র। যদিও শেষ প্রমাণ শাস্ত্র, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে আত্মা কি নহেন, তাহা মাত্র জানাইয়া দেন, আত্মা যে আছেন এই জ্ঞান আমাদিগকে দেন না। এই জ্ঞান আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। আমরা ভ্রমবশতঃ যে সমুদয় কাল্পনিক গুণ আত্মাতে আরোপ করি, শাস্ত্র তাহা দূর করিয়া দিয়া তাঁহার স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করেন।) এই বিষয়ে শ্রুতি এই বলেন "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা।" যেহেতু আত্মা এই প্রকারে নিত্য এবং অবিক্রিয়, সেই জন্য যুদ্ধ কর, যুদ্ধ হইতে বিরত হইও না। ভগবান্ এখানে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন নাই। তিনি অর্থাৎ অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবান্ তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিবন্ধের অপনয়ন মাত্র করিয়াছেন। অতএব "যুদ্ধ কর" ইহা অনুবাদ মাত্র, ইহা বিধি নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক।—গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য শোক-মোহাদি সংসার-কারণ নিবৃত্ত করা, কার্য্যে প্রবৃত্ত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই কথা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের সম্মুখে দুটী মন্ত্র আনয়ন করিলেন। (১৯শ এবং ২০শ শ্লোক কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে।) তুমি যে মনে কর যে, যুদ্ধে ভীষ্মাদি তোমাকর্ত্তৃক হত হইবেন এবং তুমি তাহাদের হনন কর্ত্তা হইবে, তোমার এই প্রকার বুদ্ধি মিথ্যা; কি প্রকারে মিথ্যা? 'য এনং' ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতেছেন। যিনি এই প্রকরণস্থ অর্থাৎ উল্লিখিত দেহীকে অর্থাৎ আত্মাকে হন্তা অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানেন; এবং অন্য যিনি আত্মাকে হত মনে করেন, দেহহনন-দ্বারা আত্মা হত অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ম্মভূত বলিয়া জানেন, তাঁহারা উভয়েই আত্মাকে জানেন না। অবিবেকবশতঃ যাঁহারা আত্ম-প্রত্যয়-বিষয়ীভূত আত্মাকে "আমি হনন কর্ত্তা" এবং "আমি হত" অর্থাৎ দেহহনন-দ্বারা "আমি হত হই" এরূপ মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই আত্ম-স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ জানেন না; যেহেতু আত্মার অবিক্রিয়ত্ব বশতঃ অর্থাৎ আত্মার পরিবর্ত্তন না থাকা হেতু এই আত্মা হনন করেন না, হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন না, এবং হতও হয়েন না, হনন ক্রিয়ার কর্ম্মও হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০শঃশ্লোক।—আত্মা কি প্রকারে অবিক্রিয় তাহা 'ন জায়তে' ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা বলিতেছেন। আত্মার জন্ম অর্থাৎ উৎপাদন নাই। জন্মরূপ যে বস্তুর পরিবর্ত্তন তাহা আত্মার নাই। এবং সেই প্রকার তিনি মরেনও না। এ স্থলে 'বা' শব্দ 'এবং' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মরেনও না' ইহাতে শেষ বিনাশরূপ যে মৃত্যু তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে। 'কদাচিৎ' অর্থাৎ কখনও শব্দটী সমুদয় বিক্রিয়া-প্রতিষেধের সঙ্গেই সংযোগ করিতে হইবে; যথা, কখনও জন্মেন না, কখনও মরেন না ইত্যাদি। যেহেতু আত্মা হইয়া, ভবন ক্রিয়া অনুভব করিয়া, পরে আবার অভাব প্রাপ্ত হন না, সেই হেতু তিনি মরেন না। যে হইয়া অভাব প্রাপ্ত হয় লোকে তাহারই মৃত্যু হয় বলে। বা শব্দ এবং ন শব্দ দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, আত্মা দেহের ন্যায় একবার হইয়া পুনরায় অভাবগ্রস্ত হন না, অতএব জন্মেন

না। যাহা না হইয়া হয় অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না এখন হইল তাহাকেই লোকে জন্মিয়াছে বলে। আত্মা এই প্রকার নহেন, অতএব তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না। যেহেতু এই প্রকার, সেই জন্য তিনি অজ; যেহেতু তিনি মরেন না সেই জন্য তিনি নিত্য। যদিও আদ্যন্ত বিক্রিয়ার প্রতিষেধদ্বারা সমুদয় বিক্রিয়ার প্রতিষেধ সূচিত হইয়াছে অর্থাৎ যখন আত্মার জন্ম পরিগ্রহণ ও মৃত্যু নাই তখন তাঁহার আর কোনও প্রকারে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সম্ভব নহে, তথাপি মধ্যভাবী বিক্রিয়াসমূহের অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়ের বিক্রিয়াসমূহের প্রতিষেধ সেই সেই অর্থ-প্রকাশক নিজ নিজ শব্দদ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ে অনুক্ত যৌবনাদি সমস্ত বিক্রিয়ার প্রতিষেধ যাহাতে হইতে পারে, 'শাশ্বত' ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহা বলিতেছেন। 'শাশ্বত', ইহাদ্বারা অপক্ষয়-লক্ষণা বিক্রিয়ার প্রতিষেধ হইতেছে অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বকালে একরূপ, তাঁহার ক্ষয় কখনও হয় না। 'শশ্বৎ ভব' অর্থাৎ সর্ব্বকালে আছেন যিনি, নিরবয়বত্ব ও নির্গুণত্ব হেতু তাঁহার নিজ স্বরূপের কোনও প্রকার ক্ষয় হয় না। গুণের ক্ষয়েই অপক্ষয়, অপক্ষয়ের বিপরীত বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া; 'পুরাণ' এই কথাদ্বারা তাহার প্রতিষেধ হইতেছে, অর্থাৎ 'পুরাণ' এই কথা দ্বারা বুঝাইতেছে যে আত্মার বৃদ্ধি হয় না। অবয়বের আগমদ্বারা যাহার উপচয় হয়, সেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অভিনবও বলে; এই আত্মা নিরবয়বত্ব বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই নব, অতএব পুরাণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। সেই প্রকার তিনি অন্যকর্ত্তৃক বিপরিণমনও প্রাপ্ত হন না; শরীর নষ্ট হইলেও তাঁহার কোনও বিক্রিয়ত্ব প্রাপ্তি হয় না। 'হন্তি' এই ক্রিয়ার উল্লেখে পুনরুক্তি হয় নাই, যেহেতু ইহা বিপরিণামার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আত্মা বিপরিণত হন না, ইহাই অর্থ। এই মন্ত্রদ্বারা ষড়্‌ভাববিকাররূপ যে সাংসারিক বস্তুবিক্রিয়া, সেই সমস্ত আত্মার সম্বন্ধে প্রতিষেধ করিতেছেন। আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত ইহাই বাক্যার্থ। যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু 'উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ'—পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ইহার এই সম্বন্ধ।

রামমোহনরায়-চতুষ্পাঠ্যাঃ কশ্চিচ্ছাত্রস্য।

মুক্তি ও অনন্ত উন্নতির সামঞ্জস্য। *

সত্যই ব্রাহ্মের অনাদি ও অপৌরুষেয় শাস্ত্র, একমাত্র সত্যের দাবীই তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। যেই মতবিশেষের সত্যতা প্রমাণিত, অমনই তাহা তাঁহার গ্রাহ্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদার শিক্ষায় ব্রাহ্ম মতের জাতিগোত্র-বিচার-শূন্য। তাঁহার নিকট, মতের ব্রাহ্মণজাতি, শাণ্ডিল্য বা ভরদ্বাজ গোত্র যাহা, গ্রীক্‌জাতি, প্লেটো বা সক্রেটিস্ গোত্রও তাহাই। তাই এখানে প্রতীচ্য অনন্ত উন্নতিবাদ প্রাচ্য মুক্তিবাদের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের উপদেশে মুক্তির কথাও আছে, অনন্ত উন্নতির কথাও আছে। ব্রাহ্ম-সাধারণ যুগপৎ দুয়েতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সাহিত্যে মতদুটি যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত, তাহাতে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে উঠে নাই। মুক্তিবাদ ও অনন্ত উন্নতিবাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে কৈ কেহ ত তাহা বলে না। আর বলে না বলিয়াই এ বিষয়ে সত্য শুধু উপলব্ধির নহে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র হইতেও অনেক দূরে।

পণ্ডিতবর বেকন বলিয়াছেন, Sometimes a negative is more pregnant with directions to truth than a barren positive, as ashes are more productive than dusts.

বালুকা অপেক্ষা ভস্মাবশেষ যেমন অধিক উর্ব্বর, তেমনই অসার 'হাঁ' অপেক্ষা 'না' অনেক সময় সত্যলাভ পক্ষে অধিক কার্য্যকর। আমি এই অসার হাঁকে অতিক্রম করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনার প্রথমে মুক্তি ও অনন্ত উন্নতির প্রচলিত ব্যাখ্যার পরস্পর অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া, পরে প্রকৃত ব্যাখ্যার উচ্চতর ভূমিতে দুয়ের সামঞ্জস্য দেখাইব। সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া শাস্ত্র গুরুবাক্য বা আচার্য্যোপদেশের সমালোচনা ব্রাহ্মের সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবোধে ভক্তিভাজন আচার্য্যগণের চরণবন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদের মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পূজ্যপাদ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত দশ উপদেশের মধ্যে ৯ম ও ১০ম উপদেশ মুক্তি বিষয়ে। তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বরের উপাসনা

* তত্ত্ববিদ্যা সভায় পঠিত প্রবন্ধ।

কি নিমিত্তে? যে ব্যক্তি উত্তর করে, মুক্তি লাভের নিমিত্তে সেই পণ্ডিতের ন্যায় উত্তর করে। মুক্তিই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য স্থান।" সুতরাং তাঁহার মতে মুক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধ্য। এই লক্ষ্য বা সাধ্য মুক্তি কি? মহর্ষি বলেন "ইহার সহজ উত্তর এই—পাপ হইতে মুক্ত হওয়া। এই উত্তরে মুক্তির সমুদয় ভাব প্রকাশ পায় না। ইহাতে অভাব পক্ষে মুক্তির লক্ষণ বলা হইল। মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে; পাপের অভাবই যে মুক্তি তাহা নহে। পশুদিগের অবস্থা ও শিশুদিগের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা নহে। যে মনে জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, যে মন আপন বলে সত্যের আশ্রয়ে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্ত।" আরো বলিতেছেন, "আমাদের জ্ঞানের মুক্তাবস্থায় সেই সত্যস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অন্ন হইবেন, তাঁহার মহিমা আরো উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইব। আমাদের ভাব সকল তখন মুক্ত হইবে, যখন তাহারা ঈশ্বর-প্রীতির রূপ ধারণ করিবে, যখন সত্যেতে মঙ্গলেতে তাহারা সমর্পিত হইবে। ইচ্ছার মুক্তভাব তখন হইবে, যখন তাহা নীচ বিষয়াকর্ষণ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সত্য পূর্ণমঙ্গলের অনুযায়ী হইবে। যখন সত্য জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপ্ত হইবে, বল, পবিত্রতা ও উন্নত আশা আমাদের সমুদয় প্রকৃতিকে উজ্জ্বলিত করিবে, তখনই মুক্তি।" সর্ব্বোপরি বলিতেছেন,—"আমরা চাতক পক্ষীর ন্যায় ঈশ্বরের প্রেমবিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি, সেই বিন্দু ক্রমে সাগর হইয়া উঠিবে। আমরা যখন সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে শোক মোহ, বিলাপ, ক্রন্দন, পাপ তাপ কিছুই থাকিবে না, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে।" সাধনবলে সাধকের এরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা লাভ যদি সম্ভব হয়, যে অবস্থায় তিনি শোক মোহ বিলাপ ক্রন্দন পাপ তাপের অতীত, তবে তাঁহার অনন্ত উন্নতির পথ রহিল কোথায়? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন,—"ঈশ্বরই একমাত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান মোহেতে আচ্ছন্ন নহে; তাঁহার প্রীতির সঙ্গে দ্বেষের যোগ নাই; তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলের বিরোধিনী নহে; কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা তাহা অল্পে অল্পে শুদ্ধভাব ও স্বাধীনভাব ধারণ করে।

উৎকৃষ্ট সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। বলি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রভেদ করিব কিসে? বঙ্কিমবাবু সুখকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;—

(১) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

(২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখ-শূন্য।

(৩) স্থায়ী।

আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সুখ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এমন কোন সুখ হইতে পারে না যাহা ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে অসুখের কারণ। সুখপ্রদ বৃত্তির অপরিমিত অনুশীলনই দুঃখের কারণ; বঙ্কিমবাবুর উক্ত ক্ষণিক সুখ "দুঃখের প্রথমাবস্থা বা কারণ নহে"। তিনি যে সুখের মধ্যে ক্ষণিক এবং স্থায়ী এই প্রভেদ করিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে। সুখ মাত্রেই ক্ষণিক। এই মুহূর্ত্তের সুখ পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের সুখ নহে। সুখের প্রকৃতিই এই। তবে সুখের স্থায়িত্ব কোথায়? যদি বলা হয় অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমাগত সুখানুভবই স্থায়ী সুখ, তাহা হইলে দয়া দাক্ষিণ্যাদি ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিমিত অনুশীলনেই এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বঙ্কিমবাবুর সুখবাদ মানিতে গেলে সুখ মাত্রই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং স্থায়িত্বদ্বারা উৎকৃষ্টত্ব প্রমাণের প্রয়াস বৃথা। সুখের ভিত্তির উপর ধর্ম্মকে স্থাপন করিতে গিয়া শ্রেয়ঃ প্রেয়ের প্রভেদ বিনষ্ট হইয়া গেল। মানবত্বে উন্নতির পরিবর্ত্তে পশুত্বে অধঃপতন হইল। ঈশ্বরানুবর্ত্তী ভাব বা ভক্তি লাভের পরিবর্ত্তে আসক্তিই সার হইল। সুখবাদের এ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া কিরূপে বলিব "সুখের উপায় ধর্ম্ম?"

সাধন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু গীতার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। গীতোক্ত ভক্তি-যোগের সাধনকেই অনুশীলন ধর্ম্মের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সাধ্যে একত্ব না থাকিলে সাধনে একত্ব কি সম্ভবে? গীতার ভক্তি আর যাহাই হউক, ইহা অনুশীলন ধর্ম্মের সুখ নহে। অনুশীলন ধর্ম্মের সাধ্য সুখ ভক্তি-যোগের সাধনের স্কন্ধে আরোপিত। এই নৃসিংহ মূর্ত্তি কষ্টকল্পনা-সম্ভূত, বাস্তব কিছুই নহে। গীতায় শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখে সমান এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত যে ভক্ত তিনিই ভগবৎ-প্রিয়

বলিয়া উক্ত। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ভক্ত সুখান্বেষী। ফলে দাঁড়ায় যোগসাধনের পক্ষে পাতঞ্জলের ঈশ্বর-প্রণিধান যেমন উপায় স্বরূপ, সুখসাধনের পক্ষে বঙ্কিম বাবুর মানবীয় বৃত্তিগুলির ঈশ্বরমুখতাও তাহাই। এরূপ ঈশ্বরমুখতাকে ভক্তি আখ্যা না দিলেই ভাল হয়। দেশী কাপড়ের বিলাতী নকলের ন্যায় দেশী ভক্তির বিলাতী নকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। রূপা বলিয়া মেকি চালাইতে গেলে চলিবে কেন?

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য-কৃত গীতাভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

[শ্রীমান্ রামানুজ আচার্য্য বৈদান্তিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান গুরু। বেদান্ত-জগতের এক দিকে শঙ্করাচার্য্য, অপরদিকে রামানুজাচার্য্য। শঙ্কর মায়াবাদী, রামানুজ পরিণামবাদী। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নির্ব্বিশেষ, রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্ট। উভয়ের প্রভেদ আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যথাসময়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিব। সম্প্রতি রামানুজ-কৃত গীতাভাষ্যের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক দুই বিপরীত সম্প্রদায়ের আচার্য্যদ্বয়ের গীতাব্যাখ্যা ব্রহ্মতত্ত্বে এক সঙ্গে পাইবেন। শঙ্কর ও রামানুজের একটি প্রভেদ পাঠক এই ভাষ্য পাঠ মাত্রই দেখিতে পাইবেন। দেববাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে শঙ্কর অসাম্প্রদায়িক। তাঁহাকে শৈবগণ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন বটে, কিন্তু তিনি যেমন শৈব, তেমনি বৈষ্ণব। তাঁহার মতে কোন দেবতা বা মহাপুরুষই পরমেশ্বরের পূর্ণাবতার নহেন, সকলই অংশাবতার। পক্ষান্তরে রামানুজ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শঙ্করের মত পাঠক তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় সংক্ষেপে দেখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে রামানুজের মত তাঁহার প্রথম ভাষ্যেই প্রতীয়মান হইবে।]

প্রণাম:—যাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যানে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বস্তুতাপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই যামুনেয়কে প্রণাম করি। (এই শ্লোকে ভাষ্যকার নিজ গুরু যামুন মুনিকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণাম করিলেন)।

প্রথমাধ্যায়।

১ম—১৯শ শ্লোক।—"লক্ষ্মীপতি সমুদায় বিঘ্নবিনাশক ও কল্যাণের আশ্রয়; এক, অনন্ত, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ; অশেষ ও অতিশয় স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি অসংখ্য কল্যাণ-গুণ-সমূহের মহাসাগর; নিজের অভিমত ও অনুরূপ অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয় ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যৌবনাদি অনন্ত গুণনিধি ও দিব্যরূপ; নিজের উপযুক্ত বিবিধ, বিচিত্র, অনন্ত, আশ্চর্য্য, নিত্য, নিরবদ্য, অপরিমিত দিব্যভূষণ-যুক্ত; নিজের অনুরূপ অসংখ্য, অচিন্ত্যশক্তি, নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয়, কল্যাণকর দিব্য আয়ুধধারী; নিজের অভিমত ও অনুরূপ নিত্য, নিরবদ্যস্বরূপ, রূপ, গুণ, বিভব, ঐশ্বর্য্য, লীলাদিবিশিষ্ট; অনন্ত, অতিশয়, অসংখ্য, কল্যাণ-গুণ-যুক্ত শ্রীবল্লভ; নিজ সংকল্পানুবিধায়ী স্বরূপস্থিতি এবং অশেষ প্রবৃত্তিভেদের মধ্যে একরতি ও একরূপ; তাঁহার নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয় জ্ঞান, ক্রিয়া ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণযুক্ত ও অপরিমিত চরণযুগল জ্ঞানিগণ অনবরত পূজা করেন; তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব বাক্য ও মনের অনায়ত্ত; নিজের উপযুক্ত বিবিধ, বিচিত্র, অনন্ত ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগস্থানযুক্ত, অনন্ত, আশ্চর্য্য, অনন্ত-মহাবিভববিশিষ্ট, অনন্তপরিমাণ, নিত্য, নিরবদ্য, অক্ষর, পরম ব্যোম তাঁহার বাসস্থান; বিবিধ বিচিত্র ভোগ্য ভোক্তৃবর্গ-পরিপূর্ণ নিখিল জগতের উদয়, বিভব ও লয় তাঁহার লীলা। সেই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত অখিল জগৎ সৃষ্টিপূর্ব্বক নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা ও মনুষ্যদিগের ধ্যানারাধনাদির অগোচর হইয়াও অপার কারুণ্য, সৌশীল্য, বাৎসল্য, ও ঔদার্য্যের মহাসাগর বলিয়া আপন স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া নানা লোকে তত্তৎ স্থানের আকারবিশিষ্ট নিজ রূপকে অবতীর্ণ করিয়া, সেই সেই লোককর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদানপূর্ব্বক ভূভার দূরীকরণ উপলক্ষে আমাদিগেরও আশ্রয়রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় মনুষ্যের নয়নগোচর হইয়াছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সকল জনগণের নয়ন-

মনোহারী দিব্য কার্য্যসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক, পূতনা, শকট, যমলার্জ্জুন, অরিষ্ট, প্রলম্ব, ধেনুকাসুর, কালিয়, কেশী, কুবলয়াপীড়, চাণূর, মুষ্টিক, কোশল, কংস প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া, অশেষ দয়া, সৌহার্দ্দ্য, ও অনুরাগযুক্ত অবলোকন ও আলাপদ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়া, নিরতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্যাদি গুণসমূহ প্রকাশপূর্ব্বক, অক্রূর, মালাকার প্রভৃতিকে পরম ভাগবত করিয়া, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করণচ্ছলে পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষসাধনার্থ বেদান্তোদিত, জ্ঞানকর্ম্মযুক্ত, নিজবিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাণ্ডব ও কুরুগণের সেই যুদ্ধ আরব্ধ হইলে সমুদয় ঈশ্বরের ঈশ্বর, জগতের উপকারার্থ মর্ত্ত্যদেহধারী * সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম আশ্রিত জনের প্রতি বাৎসল্য-বিবশ হইয়া পার্থকে রথী এবং আপনাকে সারথি করিয়া সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। ইহা জানিয়াও সর্ব্বপ্রকারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিজয়েচ্ছা-বশতঃ সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিলেন। সঞ্জয় কুরুবিজয়াকাঙ্ক্ষী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—"দুর্য্যোধন স্বয়ংই ভীমাভিরক্ষিত পাণ্ডবদিগের সৈন্য এবং ভীষ্মাভিরক্ষিত নিজ সৈন্য দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় বিজয় সম্বন্ধে সেই সৈন্যের পর্য্যাপ্ততা, এবং তদ্বিজয় সম্বন্ধে নিজসৈন্যের অপর্য্যাপ্ততা আচার্য্যকে নিবেদন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তদীয় বিষাদ দর্শনপূর্ব্বক ভীষ্ম তাঁহার হর্ষ জন্মাইবার জন্য সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিয়া শঙ্খভেরী-নিনাদ দ্বারা বিজয়েচ্ছাসূচক মহাশব্দ উৎপাদন করিলেন। তৎপরে সেই মহাশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক সমুদয় ঈশ্বরের ঈশ্বর পার্থসারথি এবং রথী পাণ্ডুতনয় ত্রৈলোক্য-বিজয়োপকরণ-রূপ মহান্ রথে স্থিত থাকিয়া ত্রৈলোক্য কম্পিত করিয়া শ্রীমৎ পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত এই দিব্য শঙ্খদ্বয় ধ্বনিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির-বৃকোদর-প্রভৃতিও পৃথক্ পৃথক্রূপে আপন আপন শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। সেই মহাশব্দ দুর্য্যোধনপ্রমুখ তোমার সমুদয় পুত্রেরই হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মনে করিল, কুরুদিগের সৈন্য অদ্যই নষ্ট হইল।"

২০শ—২৫শ।—"তৎপরে, যুদ্ধার্থ অবস্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দেখিয়া পাণ্ডুতনয়—যাঁহার রথের ধ্বজারূপে লঙ্কাদহন-বানর হনুমান্ উপবিষ্ট ছিলেন—

---

* "জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যঃ"। পাঠান্তর—"জগদুপকৃতিমত্যা" জগতের উপকার করিবার অভিপ্রায়ে।

জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজের সাগরস্বরূপ এবং নিজসঙ্কল্পকৃত জগতের উদয়, বিভব ও লয়রূপ লীলাময় হৃষীকেশকে,—অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ সকল লোকের অন্তরবাহ্য সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার নিয়মনকার্য্যে নিযুক্ত এবং আশ্রিতবাৎসল্য বশতঃ নিজসারথ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে—এই অনুরোধ করিলেন,—'যুদ্ধেচ্ছুদিগকে যথাবৎ দেখিবার জন্য তদ্দর্শনোপযোগী স্থানে রথ স্থাপন করুন্।' তিনিও তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎই ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি মহানুভবদিগের সম্মুখে যথানুরোধ রথ-স্থাপন করিলেন, আর বলিলেন, 'তোমাদের বিজয়স্থিতি এইরূপ'।"

২৬শ—৪৭শ।—"মহামনা, দীর্ঘবন্ধু, পরমধার্ম্মিক, সভ্রাতৃক পার্থ আপনা-দের কর্তৃক জতুগৃহাদি অতিঘোর মারণদ্বারা চিরকাল বঞ্চিত হইয়াও পরম পুরুষের সহায়ে আপন বধে প্রবৃত্ত ভবদীয় ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া বন্ধুস্নেহ, পরম কৃপা এবং ধর্ম্মভয়বশতঃ সর্ব্বশরীরে অতিমাত্র খিন্ন হইয়া, 'আমি কোনও প্রকারে যুদ্ধ করিব না' এই বলিয়া, এবং বন্ধুবিশ্লেষজনিত শোকে সংবিগ্নমানস হইয়া শরসহ ধনুক পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন।"

দ্বিতীয়াধ্যায়।

১—৩ শ্লোক।—"পার্থ এইরূপে উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ 'অসময়ে এই শোক কোথা হইতে উপস্থিত হইল?' এই আক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, সঙ্কটসময়ে উপস্থিত, অজ্ঞানি-সেবিত, পরলোক-বিরোধী, অকীর্ত্তিকর, অতিক্ষুদ্র এবং হৃদয়দৌর্ব্বল্য-কৃত এই শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর।"

৪—৫ শ্লোক।—"পার্থ স্নেহকারুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মভয়াকুল হইয়া, ভগবদুক্ত হিত না জানিয়া, পুনরায় বলিলেন,—'আমি কিরূপে বহুসম্মানার্হ গুরু ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রভৃতিকে বধ করিব? তাঁহারা ভোগে অতিশয় আসক্ত, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমি কিরূপেই বা তাঁহাদের ভুজ্যমান ভোগসমূহ তাঁহাদের রুধির-সিক্ত করিয়া, সেই সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ভোগ করিব'?"

৬—৭ শ্লোক।—'যদি বলেন—এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া নিবৃত্তচেষ্ট

হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তোমাদিগকে শীঘ্রই বধ করিবে,—তবে আমি বলি, তাহাই হউক। আমার বোধ হয়, তাহাদিগকে বধ করিয়া অধর্ম্ম্য বিজয়লাভ অপেক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহাদের কর্ত্তৃক আমাদের বধই শ্রেয়ঃ।' এই বলিয়া 'আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন' এই প্রার্থনা পূর্ব্বক অর্জ্জুন অতি কাতরভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণ লইলেন।"

৮—৯ শ্লোক।—"এইরূপ অকালে সমুপস্থিত স্নেহ ও কারুণ্যদ্বারা পার্থ অপ্রাকৃতিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম যুদ্ধকেও অধর্ম্ম মনে করিতেছিলেন। তিনি ধর্ম্মভয়ে ভগবানের শরণাগত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'আত্মতত্ত্ব এবং ফলাসক্তিরহিত যুদ্ধ যে আত্মপ্রাপ্তির উপায়, এই জ্ঞান ব্যতীত ইহার মোহ শান্ত হইবে না।' এই ভাবিয়া পরম পুরুষ অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অবতারণ করিলেন। এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"অস্থানে স্নেহকারুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম-ধিয়াকুলম্।
পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতারণং কৃতম্॥"

(যামুনমুনি-প্রণীত গীতার্থসংগ্রহ।) অর্থাৎ—অযথা স্নেহকারুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধিদ্বারা আকুল এবং শরণাগত পার্থকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রাবতারণ করা হইয়াছে।"

১০ম শ্লোক।—"এইরূপে দেহ ও আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞানতাবশতঃ পার্থ শোকাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের জন্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। তিনি এখন পরস্পর-বিরুদ্ধ-গুণান্বিত। যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত উভয় সেনার মধ্যে তিনি অকস্মাৎ নিরুদ্‌যোগ হইয়াছেন, পার্থকে এতদবস্থাপন্ন দেখিয়া পরম পুরুষ যেন উপহাস করিয়া এই বলিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন পরিহাস বাক্য বলিয়া আত্ম-পরমাত্ম-তত্ত্ব-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ-গোচর 'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' পর্য্যন্ত বচনসমূহ বলিলেন।"

THE ETHICS OF SELF-REALISATION. *

THE merely instinctive life has no ethical quality. It is not guided by any idea of a realisable good. It has wants, and these wants lead to actions; but they cannot be described as desires. A merely instinctive agent cannot be conceived as having definite objects which it seeks for the satisfaction of its wants. The feeling of want blindly leads to the object which satisfies it. The brute feels hungry and is led to take food, which satisfies the hunger; but it cannot be said that it consciously seeks food as an object which will satisfy it. The merely natural man, the babe or the bushman, is likewise blindly led to the object which satisfies his instinctive wants. Of course, instinct presupposes something higher than itself. Instinct would not be led to its object but for the wisdom that guides it. But this wisdom does not belong to the subject of instinct. The merely instinctive agent is not wise. Instinct is not independent; it is not for itself, but for another. Just as there can be no such thing as mere sensation apart from a constant, permanent intellect guided by fixed laws, so there cannot be any such thing as mere instinct apart from a guiding wisdom. But just as there may be a sentient life, a sentient subject, dependent, indeed, on a higher consciousness and not personal in the true sense, and yet having a *quasi* individuality, so there may be a merely instinctive agent guided by a moral agent, but unmoral in itself. The truly ethical life begins from the moment an agent feels conscious of himself as a person having wants to be satisfied, capacities to be realised,—from the moment he feels that there is a state of himself, a state of consciousness which is desirable and attainable, but which he does not actually possess. It commences, in short, when we do not merely want a thing, are

* The substance of a lecture delivered by the Editor of the *Brahmatattva* at the City College on the 4th September, 1898. Extracted (with slight alterations) from the *Indian Messenger*.

not merely led to it, but want it, desire it, because we feel it to be desirable. In all stages of the ethical life, the self,—some desirable state of the self,—is presented as the object to be realised. On a superficial view, this may not seem to be the case. Most people may seem to be pursuing objects external to and different from the self. Food, clothing, comforts, riches, power, honour, even knowledge—the knowledge of material objects—may seem to be quite external things and their seekers to be persons desiring things very different from self-realisation. But in reality why are these objects sought for but because they satisfy certain wants felt by the soul,—because they help or are conceived to help the realisation of certain capacities of the soul,—because their attainment holds forth before their seekers a more desirable state of consciousness than they possess? In the pursuit of higher, subtler ends, the same idea of self-satisfaction or self-realisation determines our efforts. In the acquisition of the different kinds of knowledge, in the emotions and duties that constitute domestic and social life, in the exercises and observances of spiritual life, it is always the attainment of a higher state of self than we actually possess that is aimed at. An effort after self-realisation in some shape or degree,—this is the form of the ethical life in all its stages.

But if self-realisation is the form of all ethical life, of all moral as well as immoral life, where lies the difference between the former and the latter? What is it that differentiates morality from immorality? The difference, we reply, will be found to lie in the nature of the objects pursued. Though self-realisation is the form of all ethical action, all actions are not calculated to help the true realisation of the self, or the realisation of the true self. Though all objects consciously and deliberately pursued as desirable are pursued for the sake of self-realisation, all objects do not and cannot help the realisation of the soul's capacities. Thus there are worthy and

unworthy objects, high and low objects. There are objects which fail to realise the capacities of the soul,—fail to bring about a desirable state of consciousness, because the relation of the soul to these objects is ill-conceived,—because the nature of the soul, and the nature of the objects which would truly satisfy its wants, are wrongly conceived. Thus, notwithstanding the identity of form in all ethical actions, there comes to be a difference of quality in them. Though in both moral and immoral actions, it is self-realisation that is sought, the ideas of self that determine the two classes of actions, are very different. In moral action the self sought to be realised is truly conceived and therefore truly realised, whereas an immoral agent conceives it wrongly and therefore fails to realise it truly.

That self-realisation is the form of all ethical actions, may be illustrated by reference to a few stages of ethical life. The self sought to be realised may be considered either qualitatively or quantitatively. We shall first consider it qualitatively; we shall see how, as ethical life grows, the self gradually comes to be conceived as a larger and larger thing. In the lowest stage, the ethical life is individualistic, as much individualistic, of course, as it can be; for ethical life, even in its lowest form, cannot be purely individualistic; it comprehends, as part of itself, as contributing to self-realisation, some of the objects of Nature, and even uses other individuals as means to that end. Its centre, however, is individual life with its purely personal enjoyments and satisfactions. These may be sought from various objects, physical and intellectual, and may range from the grossest to the subtlest forms; but so long as the self to be satisfied is conceived to be a small, limited object, excluding other objects, other selves, such a life cannot be called by any higher name than selfish, and as such, deserves unqualified condemnation. It utterly misconceives the self, which, in its true nature, is the very opposite of individualistic, and thus fails to realise it.

Individualism or selfishness, however, is not a mere stage of ethical life, a stage that is transcended as the soul rises to a higher; it is a besetting sin that invades all forms of moral life, more or less, and which, though diminished with every step of growth in virtue, is not entirely destroyed except in the highest form of character,—the divinely human, the godly.

Domestic life is a step forward. In it the soul identifies itself with the family. It is not satisfied with itself, not satisfied with merely personal enjoyments and attainments. It seeks the satisfaction of other individuals, and feels satisfied at their satisfaction. The good, in whatever form, of wife and children gives it a feeling of realised good for itself, and any evil befalling them shakes and depresses it. We admire domestic love and faithfulness and give it a decidedly higher place than individual self-seeking, because the self which forms its object, the self sought to be realised in it, is a larger and therefore a truer self than the self which the selfish man seeks to satisfy. In it there is a recognition, a partial and imperfect recognition doubtless, of the truth that the self underlying our intellectual and moral life is not a small, limited self, an individual excluding other individuals, but a self in which many individualities are comprehended. The man living a domestic life—living in the lives of wife, children and other relations, so far transcends his individuality and takes in the life of the Universal Self underlying our life and making it what it is. But, as we have already suggested, the domestic life is only a partial realisation of the true life of the self, and in so far as it excludes a broadly social life, it is an imperfect,—a wrong and misguided—scheme of life. The domestic man is virtuous only so far as he does his duties by his family; but in so far as he is unfaithful to his neighbours, in so far as he robs, cheats, fights or kills them, he is vicious and requires condemnation, correction and instruction.

In tribal and national life, in the same way, there is a truer self-consciousness and therefore a truer and higher self-realisation than in domestic life, and far more than in individualistic life. In it the moral agent transcends not only his own small personality, but also the narrow circle of his family and kindred, and sees his true self reflected in all the members of his tribe or nation. He identifies himself with his community and feels himself satisfied and realised in the progress and well-being of his people. This is the life of the true patriot,—of the Moseses, Mazzinis, Gladstones, Sivajis and Guru Govindas of the world. The self they sought to realise was a very large thing,—one endowed with a large set of capacities and exercising a multiplicity of functions. Such an idea of self represents our true self far more truly than the idea which underlies the merely domestic life, not to speak of the individual. There is, in such a life, a truer recognition of the nature of the self, and therefore a larger participation in its true life than in those previously noticed. National life, however, has its limitations, and therefore its vices, as much as the domestic, and it is by no means the highest conceivable. A good illustration of the limitations of a merely national life may be seen in the conduct of the modern nations of Europe towards foreigners, specially towards those who are weaker than they. Spain's oppressive treatment of Cuba and the Philippines has recently been violently put an end to by humaner and, thank God, more powerful America; and we Indians, whether in our own country or in South Africa, devoutly wish that England's treatment of us were more liberal and, in that sense, less national than it is. Humanity, then, the recongnition of the unity of all human beings in a universal brotherhood—in other words, in a comprehensive human self,—is a truer self-consciousness than what underlies and guides the merely national life. But the due recognition of the unity of mankind is always found

conjoined with a recognition, in some form or other, of a unity transcending humanity itself, a cosmic or transcendental unity, a Universal Father, a Universal Soul, or a Universal Law of Good, of which humanity itself is a partial manfestation,—which is at once the source, life and truth of human life. When this Unity is recognised, every duty to humanity is seen to be derived from and due to this unity, and moral life assumes the depth and grandeur which we express by the term 'spiritual.' Such a life was lived by the great leaders and saviours of mankind,—by men who really belonged to no tribe or nation in particular, but to humanity in general, and transcended humanity itself inasmuch as they felt themselves in communion with the Divine and drew their inspiration from there. It is the life led by Buddha, Christ, Muhammad and Confucius and those who have followed and do still follow their footsteps.

QUALITATIVELY considered, ethical life may be classified into sensuous, intellectual, emotional and spiritual. Intension is no less an important consideration in ethical life than extension. Quality measures the worth of moral life no less than quantity. The recognition of mere pleasure as the realisation of self, is a most one-sided and misguided idea of the requirements of true self-realisation. Even when pleasure-seeking becomes unselfish,—when, not satisfied with our own pleasures, we seek to please others, the true idea of the self is ignored, and its true realisation unattained. The soul cannot be satisfied by mere pleasure. It has other capacities than the merely sentient—capacities which seek satisfaction and realisation in objects quite other than pleasure. It has, for instance, a natural thirst for knowledge, a desire for truth, which demands satisfaction irrespective of the pleasure that accompanies it. The attainment of truth is, indeed, pleasant; but it is a distortion of facts to say that it is for the sake of this pleasure that truth is sought after. It is for truth's

sake, and not for the sake of the pleasure it brings with it, that the soul seeks after truth. The seeker after truth,—one who aspires to reach truth for himself and his fellow-beings, has therefore a truer idea of self than he who recognises nothing but pleasure as the object to be pursued. Then again, the recognition of the higher emotions, both affectional and æsthetic, is a step forward in the attainment of true self-consciousness and the realisation of the true self. The feelings of reverence, love, friendship, pity and compassion demand satisfaction for their own sakes in the complex relations of domestic and social life, and far from being pleasure-seeking in themselves, are ready to endure a large measure,—sometimes excruciating measures—of pain for their being satisfied. Likewise, the æsthetic feelings of awe and admiration seek satisfaction in the pursuit of all that is sublime and beautiful in Nature and Art, and demand recognition and culture as distinct capacities of the soul. But besides these various aspects of ethical life, there is another which stands to all others in the relation at once of source and fulfilment. It consists in the recognition of the infinite and eternal Source of all existence, both moral and unmoral,—of a Personality which underlies and sustains all personal life,—of a Reality in which all that is ideal to us is realised. It consists, we say, in the recognition of this Reality and in striving to realise it practically in our thoughts, feelings and actions. In the conscious effort to do this, morality is transformed into spirituality,—the moral life becomes spiritual. Both quantitatively and qualitatively, the spiritual life, life in God, is the consummation of morality, and its perfect attainment would be the complete realisation of the true good.

Our moral judgments are determined by these various stages of ethical development. Inasmuch as the stages differ, the judgments also differ. The same principle,—that of self-realisation—lies either consciously or unconsciously at the

basis of all; but the relative truth and value of each judgment varies according to the idea of self that guides it. In proportion as the self sought to be realised is both qualitatively and quantitatively broader and therefore truer,—nearer to the true self of man,—which is God—the more correct and noble are the principles that commend themselves to the conscience, and the greater is the success achieved in true self-realisation. Thus, to the primitive nomad, and in a large degree, to the more settled rustic, having little or no notion of a community, but living in the companionship of wife, children and other kindred, the moral effort will naturally exhaust itself in meeting the necessities,—and those only of a physical nature—of the family, and the claims of truth, justice, charity, friendship, reverence &c., which imply the consciousness of a social self, will receive no recognition. Even to the civilised man, if his education has been such as to fix his attention exclusively on the purely sensitive aspect of life, then the pursuit of science and art, the unselfish service of our kind, the formation of character and the privilege of Divine worship, will seem extremely unattractive occupations, and the enjoyment of animal comforts and pleasures appear to be the only thing worth the serious attention of man. That we are indifferent or unkind to our neighbour, that wherever his interests collide with ours, we sacrifice the former to the latter, is due to nothing but our failure to identify ourselves with him,—to see the fundamental identity of our self with the self in him. Our choice of vice, in all its forms, is due to the ignoring or disregard of the nature and extent of our true self. The saint and the philanthropist are saintly and philanthropic in proportion to the truth and vividness with which they conceive the nature of God and that of man, and the extent to which they are guided in their actions by such a conception.

The resulting rule for the determination of the moral worth of an action is, therefore, clear. It is the relative truth of the

idea of self that underlies it. Every action that seeks individual satisfaction at the cost of the broader interests of domestic life, is wrong, and the opposite right. Every action that recognises the affectional and intellectual aspects of life, is higher than those which identify self with the body and its functions. Every action which seeks to promote the interests of one nation at the cost of other nations,—for instance, those of England at the cost of India or China,—is wrong, and that is right which proceeds upon the notion of the fundamental unity of the conflicting parties. The merely moral scheme of life is lower than the spiritual,—the conscious service of God higher than the unconscious,—because the knowing and loving servant of God is inspired by a truer idea of self than that which guides the unconscious keeper of his laws. The ultimate test of ethical good is, therefore, the realisation of the idea of God—the idea of a Being eternally perfect, but manifesting himself gradually, under finite conditions, as the soul of man. Whatever thought, feeling or conduct is consistent with the idea of this Perfect Being,—is such as he could approve if he were man,—is right, and whatever conflicts with this idea,—is such as he could not approve,—is wrong.

ব্যক্তি ও সমাজ।

মানব স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। হৃদয়ের ও মনের যে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি বিকশিত হইয়া মানুষকে মানুষ পদবাচ্য করিয়াছে এবং যে বৃত্তি ও শক্তি গুলিকে আমরা মানবীয় ধর্ম্ম নামে অভিহিত করি, যে সকল বৃত্তি মানবকে অন্যান্য জাত প্রাণীমণ্ডলী হইতে বিশেষত্ব প্রদান করিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ স্থানে উত্তোলন করিয়াছে, সে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি মানবের সামাজিক জীবনের ফল। এই অর্থে সামাজিকতা মানবের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহাকে অতিক্রম করিয়া মানব মানবত্ব লাভে সক্ষম নহে। সহানুভূতি, বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তির ন্যায় ইহা মানবাত্মার

একটী বিশেষ বৃত্তি নহে, কিন্তু মানবাত্মা-নিহিত সমস্ত বৃত্তি গুলির অভি-ব্যক্তির এক অনতিক্রমণীয় নিয়ম। এক কথায়, সমাজ মানবত্ব বিকাশের অপরিহার্য্য আশ্রয় (indispensable condition)। আমরা মানুষকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কল্পনা করিতেও পারি না। কি সভ্য কি অসভ্য, সর্ব্বাবস্থাতেই মানুষ কোনও না কোনও প্রকার সমাজবদ্ধ থাকি-য়েই থাকিবে। মানুষ কখনও একাকী বাস করিতে পারে না। অতি আদিম অবস্থায় যখন মানুষ কোনও রূপ প্রণালীবদ্ধ সমাজে একত্রিত হয় নাই, তখনও তাঁহার একান্ত ব্যক্তিত্বের উপর তাঁহার পরিবার (তাহা যতই কেন স্থূল হউক না) আধিপত্য করে। সে অবস্থাতেও সে সম্পূর্ণরূপে সামাজিকতার অতীত নহে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্বতন্ত্রভাবে মানুষ থাকিতে পারে কি না তাহা কল্পনাতীত। অনেক জীব থাকা সম্ভব যাহারা ঐরূপ স্বতন্ত্র ও একাকী বাস করে, কিন্তু তাহাদিগকে মানব নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে না। ঐ যে কিছুদিন পূর্ব্বে ভালুক-পালিতা একটী বালিকা কলি-কাতায় আনীত হইয়াছিল, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে আর কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মানুষ আপনার মানবাস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। সেতো মানব সমাজেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কেবল দৈবদুর্ব্বিপাকে মানব সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া-ছিল। সে যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বংশানুক্রমের (heredity) নিয়মানুসারে সেই সমাজানুযায়ী অনেক সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছিল, তথাপিও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইল, সম্পূর্ণ পশু-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল। সে পুনরায় মনুষ্য-প্রকৃতি লাভে সক্ষম ছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। সুতরাং মনুষ্য সমাজের সঙ্গে যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, জন্মের পূর্ব্ব ও পর, সকল অবস্থাতেই যে স্বতন্ত্র, সে যে পশু ভিন্ন আর কিছু নহে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই এরিস্ততল বলিয়াছেন, যে যাহারা সমাজ ছাড়িয়া বাস করে তাহারা মানুষ নহে, তাহারা হয় দেবতা না হয় পশু।

বিশেষতঃ বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত এই যে, ভাব ব্যতীত মানুষের চিন্তাশক্তি কখনও পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যে অবস্থায় মানুষ

পশু অপেক্ষা উন্নত নহে, যে অবস্থায় তাঁহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা পশু অপেক্ষা কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে, সে অবস্থায় মানুষ ভাষার কোনও উপযোগিতা না বুঝিতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায় তাঁহাকে ভাষার শরণাপন্ন হইতেই হয় এবং জ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে তাঁহাকে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, এবং যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি হয় সেই পরিমাণেই তাঁহার চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও বিকাশ হইতে থাকে। অপর পক্ষে, যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে ভাষারও উন্নতি সাধিত হয়। সেই জন্যই অসভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য জাতিদের ভাষা শ্রেষ্ঠ এবং হৃদয়ের উচ্চ ভাব প্রকাশের অনুকূল। অসভ্যদিগের ভাষায় সাধারণ সত্য-প্রকাশক (Abstract idea) শব্দের অত্যন্ত অভাব। অসভ্যদিগের মধ্যে অনন্ত ভাব-প্রকাশক শব্দেরও যেমন অভাব, উক্ত ভাবও তাহাদের মধ্যে তেমনই অপরিস্ফুট। সভ্য জাতিদিগের মধ্যে আবার যে ভাষায় যত উক্ত ভাব প্রকাশক শব্দের আধিক্য, সে ভাষা তত অধিক পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি ও চিন্তাবিকাশের পক্ষে অনুকূল। একই সমাজে বাস করিয়া বোবা ও কালারা যে অন্যাপেক্ষা জ্ঞানে হীন হয়, ভাষার সাহায্যের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সেই জন্যই অধ্যাপক হাক্সলি বলিয়াছেন "A race of dumb men deprived of all communication with those who could speak would be little indeed removed from the brutes". অর্থাৎ বোবারা যদি ভাষাবিদ্ মনুষ্য সমাজের সহিত সম্পর্করহিত হয়, তবে পশুদের হইতে তাহাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকে না।

কেবল যে জ্ঞান ও চিন্তার পরিপুষ্টির জন্যই ভাষা চাই তাহা নহে, কিন্তু চিন্তা করিতে হইলেই আমাদের ভাষার দরকার। শুধু তাহাই নহে, আমাদের দর্শন ও শ্রবণ ব্যাপারেও যে ভাষার প্রয়োজনীয়তা নাই— তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যাহা হউক, ভাষা মানসিক বিকাশের অন্যতর অবলম্বন। কিন্তু এই ভাষা সমাজের ফল। সমাজ না থাকিলে ভাষার উৎপত্তি অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়। পরস্পরের মানসিক ভাবের আদান প্রদানের জন্যই ভাষার সৃষ্টি। পরস্পরের মনের ভাব জানা সমাজেই

দরকার। সুতরাং যে ভাষা মনুষ্যপ্রকৃতি প্রস্ফুরণের এত সহায়, তাহাও সমাজেরই সৃষ্টি।

এ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন এবং এখনও যে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী লোক একেবারে নাই তাহাও বলা যায় না, যাহাদের মতে সমাজ মানুষের অপরিহার্য্য আশ্রয় নহে, অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক জীব নহে। সমাজ মানব-প্রকৃতি-বিকাশের অপরিহার্য্য অবলম্বন নহে, কিন্তু পরস্পরের স্বার্থ ও সুখসুবিধা বিধানের ক্ষেত্রমাত্র। সমাজ স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম। ইহাদের মতে সমাজের উৎপত্তি এইরূপ,—মানুষ আদিম অবস্থায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিত এবং যে যার স্বার্থ অন্বেষণ করিত, কিন্তু যখন দেখিল তাহারা এরূপ ভাবে আপনাদের স্বার্থই নষ্ট করিতেছে, তখন স্বার্থসিদ্ধির উপায় মনে করিয়াই তাহারা সমাজবদ্ধ হইল এবং আপনাদের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব্ব করিল। ইহারা মনে করেন, সমাজ-নিরপেক্ষ হইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছিল, পরে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্যত্বের জন্য সমাজ নহে, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

ইহাদের মত এই যে, সমাজবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার জন্মে এবং সমাজবদ্ধ হইবার সময় মানুষ তাহা কিয়ৎ পরিমাণে খর্ব্ব করে; কেননা, সমাজবদ্ধ হওয়ার অর্থই ব্যক্তিত্বকে নিয়মাধীন করা। এই মতের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাদের মতে ব্যক্তিত্ব ও অধিকার এই দুইই সমাজ-নিরপেক্ষ।

ইহারা ইটী লক্ষ্য করেন নাই যে, অধিকার বলিতেই কর্ত্তব্য বুঝায়। এক জনের অধিকার অন্যের কর্ত্তব্য; নতুবা অধিকারের কোনও অর্থই থাকে না। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ আদান প্রদান ভিন্ন অধিকারের কোনও অর্থ হইতে পারে না। এই আদান-প্রদান সমাজেই সম্ভব, সুতরাং সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত অধিকার একটা কথার কথা মাত্র।

ইহাঁদের যে এই ভ্রম হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারা সমাজে জন্মিয়াছেন, ইহাদিগকে সমাজ গঠন করিতে হয় নাই। আদিম অবস্থায় উপনীত হইয়া যদি ইহাদিগকে সমাজ বন্ধন করিতে হইত, তাহা

হইলে ইহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। যাহা হউক, ইহাদের ভ্রম আমরা সহজেই বুঝিতেছি। এই মত সম্বন্ধে স্থানান্তরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

কিন্তু সম্প্রতি এই শ্রেণীর অথবা ইহা অপেক্ষা আরও অদ্ভুত মতাবলম্বী না হউক কার্য্যাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন যাঁহারা বোধ হয় পূর্ব্বের শ্রেণী অপেক্ষাও সমাজকে লঘুভাবে দর্শন করেন। ইহারা মনে করেন, সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলেই সমাজের সভ্য হইতে পারি অথবা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি। শিশু যেমন ধূলিমুষ্টি লইয়া কিছু গড়ে, আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও ইহাদের নিকট এমনই একটী ক্রীড়ার সামগ্রী; গঠনে কিম্বা ভঞ্জনে কিছুতেই সময় দরকার হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য কোনও সমাজভুক্ত হন না। কেহ কেহ বা কোনও সমাজের সভ্য হওয়াটাকে সঙ্কীর্ণতা মনে করেন। ইহারা সমাজশূন্য সামাজিক জীব। ইহাদিগের লীলা তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন অন্য কোনও সভ্যের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সমাজের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কার্য্যে ও চিন্তায় আপনাকে সমাজের সঙ্গে এক বলিয়া মনে করেন এবং কার্য্যগত জীবনে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এখন প্রশ্ন এই, যদি সমাজের সভ্যই না হও, তবে ইহার সঙ্গে তোমার যোগ থাকে কিরূপে? সভ্যপদ পরিত্যাগ করিবার সময় ইহারা এই কথাটা তলাইয়া দেখেন না। বস্তুতঃ সমাজের সভ্যপদটা ইহারা যত সুলভ ও সুপরিত্যাজ্য মনে করেন, ব্যাপারটী কিন্তু তত সহজসাধ্য নহে। ব্যাপারটী অতীব রহস্যময়, অত্যন্ত গুরুতর। তবেই এখন ইহাই বিচার্য্য—সমাজ কি? এবং সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধই বা কোথায়? সমাজ ও ব্যক্তিত্ব পরস্পর বিরোধী না সমগুণাক্রান্ত? সমাজশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কি ব্যক্তিত্বের বিনাশ করিতে হইবে? ব্যক্তি কি কিছুই নহে, সামাজই কি সব? না উভয়েরই স্থান আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহারই বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশ সমূহে এ সম্বন্ধে

দুই বিভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য দেশে সাধারণতঃ ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সমাজনিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক কার্য্য, জীবনের অতি সামান্য কার্য্যও, সামাজিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একবারেই নাই। ন্যায়ান্যায় বিচার-ক্ষমতা তাঁহার নাই, সে শাস্ত্রের আদেশ পালন করিতে বাধ্য, সে আদেশের সঙ্গে তাহার সহানুভূতি থাকুক আর নাই থাকুক। এখানে কার্য্যের প্রেরক ভিতরে নহে, বাহিরে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই আইনের উপর, শাস্ত্রাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তথাপি যাহা হওয়া উচিত ছিল আন্তরিক ভাবের ফল, তাহা বাহিরের বিশেষ বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করিতেছে। স্থূল কথা, মানুষ সমাজের ক্রীড়নক মাত্র, সে আদেশ বহন করিবে, কলের মত, প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে (যে নিয়মের উপর তাহার কোনও হাত নাই) কাষ করিয়া যাইবে, কেন,—সে বিচারে তাহার অধিকার নাই। এখানে ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় স্বত্বরক্ষার চেষ্টা সমাজদ্রোহ। সুতরাং এই প্রণালীর সমাজে ঘন ঘন ব্যক্তিত্বের মস্তকোত্তলন ও বিপ্লব অনিবার্য্য। ভারতবর্ষে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগতের ইতিহাসে ভারতেই সর্ব্বপ্রথম সমাজশাসনের বিপক্ষে সমর-ঘোষণা হইয়াছিল। মানুষের স্বভাবই এই, যে তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবার জন্য যত বেশী চেষ্টা হইবে, সে তত অধিক পরিমাণে তাহা লাভ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবে। সে স্ব-ইচ্ছায় আপনাকে নিয়মিত রাখিতে পারে, কিন্তু বাহিরের শক্তি তাহাকে নিয়মিত করিবে, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাঁহাকে 'অভ্রান্ত' শাস্ত্রের অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ কর, সে ব্যাখ্যার পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সে যখন সমর-ঘোষণা করিতে সক্ষম নহে, তখনও সে শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকে না। 'অভ্রান্ত' শাস্ত্রবাদীদের মধ্যে নিত্য নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাউপার বলিয়াছেন, আমি সমস্তদিন গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া লেখাপড়া করিতে পারি, বাহিরে যাইবার কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করি না। কিন্তু বাহির হইতে যদি কেহ আমাকে এই ঘরেই আবদ্ধ করে, তবে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই বাহিরে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিব। সেই জন্যই

দেখিতে পাওয়া যায়, সমাজ শাসনের কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের আধিক্য হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিত্বের লোপকারী সমাজশাসনের দ্বারা সমাজস্থিতির সম্ভাবনা নাই।

পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিত্ব প্রবল। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনও সীমা না থাকে, তবে তাহা সমাজের পক্ষে অধিকতর অমঙ্গলজনক। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সমাজযন্ত্রের বিনাশকারী। সমাজের ঐকান্তিক দাসত্ব যেমন মনুষ্যত্ববিনাশক, অসীম ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও তেমনি সমাজবিধ্বংসী। এই সঙ্কট নিবারণের জন্য কেহ হয়তো বলিতে পারেন, যে সমাজ এরূপ ভাবে গঠিত হওয়া উচিত, যে সেখানে ব্যক্তিত্বের এই মাত্র সীমা থাকিবে যে উহা অন্যের ব্যক্তিগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে। এই সীমার ভিতরে সে আপন অভিরুচি অনুসারে কায করিবে, কেহ তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারিবে না। এরূপ অনির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দিশ্য ভাবের উপর কথনও সমাজস্থিতি সম্ভব নহে। কাহার ব্যক্তিগত অধিকার কতটুকু তাহা কে নির্দ্দেশ করিবে? বিশেষতঃ এই মতবাদীরা ইহা ভুলিয়া যান, যে সমাজবন্ধন একটী অভাবপক্ষীয় জিনিষ নহে। সমাজে মানুষ যে কেবল আপনার আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কুচিত করিবে তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য সমাজ গঠিত হয় নাই। সমাজ মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র। কারণ মানবদেহের ন্যায় মানবসমাজও একটী যন্ত্র। প্রত্যেক মানব ও বিভিন্ন সমিতি ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিই মানবসমাজ, কিন্তু ইহা ব্যক্তিসমূহের কেবলমাত্র একত্রীকরণ নহে। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনীশক্তি ঐ সমাজ মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। শরীরের কোনও অঙ্গ যদি শরীরচ্যুত হয়, তবে তাহার জীবন যেমন ধ্বংস হয়, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মানবও তেমনি মানবত্ব হারায়।

দেহের মধ্যে যেমন ইহার বিভিন্ন অংশ হৃদ্, ফুস্ফুস্, যকৃৎ, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্র, হস্তপদ প্রভৃতি কর্ম্মযন্ত্র, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি

জ্ঞানযন্ত্র পরস্পর স্বাধীনভাবে কার্য্য করে কিন্তু কেহই অন্যকে ছাড়িয়া কায চালাইতে পারে না, একজনের কার্য্যকারিতা যেমন অপর সকলের কৃত-কার্য্যতার উপর নির্ভর করে; ইহার মধ্যে যেমন কোনও একটী বিকল হইলে অন্য সকলেই দুর্ব্বল ও বিকল হইয়া পড়ে, এবং সমগ্র শরীরের জীবনীশক্তি যাহা সকল যন্ত্রকেই রক্ষা করিতেছে, তাহা যেমন বিভিন্ন যন্ত্রমণ্ডলীর কৃত-কার্য্যতা ও সমবেত ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, সমাজদেহের কার্য্যও সেইরূপ সমাজস্থ মানবমণ্ডলীর পরস্পরের কৃতকার্য্যতা ও অনাহত সমবেত ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন স্বাধীন ইচ্ছাদ্বারা স্ব স্ব পথে প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের জীবন অন্য সকলের জীবন ও সমবেত ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত রহিয়াছে। মানুষ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নানা বিষয়ে নিযুক্ত থাকে এবং আপন আপন কর্ম্মপথে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেকের কায অন্য সকলের কাযের দ্বারা নিয়মিত হয় এবং তাহারা সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব পথে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন ও সাধারণ মঙ্গল সম্পাদন করে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে যেমন শারীরিক দেহে, তেমনই সামাজিক দেহে প্রত্যেক অঙ্গের মঙ্গলামঙ্গল অপর প্রত্যেকের মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভর করে, এবং সমগ্র দেহের ইষ্টানিষ্ট সকলের কার্য্যকারিতা ও সম-বেত ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ আবার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-শীলতা সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য ও বলের উপর নির্ভর করে। দেহ যদি রুগ্ন হয়, তবে তাহারা আর উপযুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। যেমন শারীরিক দেহের, তেমনই যদি সমাজদেহের কোনও অঙ্গ বিকল হয়, তবে অন্য অঙ্গেরও কার্য্যকারিতার হানি হয়। আমরা একটী সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটি একটু স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

এই যে আমরা প্রত্যহ অন্ন গ্রহণ করিতেছি, তাহা কিরূপে সংগৃহীত হইল? কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে, কর্ম্মকার ও সূত্রধর তাহার কর্ষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে, কর্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী ধাতু ও কাষ্ঠ খনিকার ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছে ও কাঠুরিয়া অরণ্য হইতে আহরণ করিয়াছে, তবে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই উৎপন্ন শস্য আমার নিকট অন্নরূপে উপস্থিত হইতে আরও কত শ্রেণীর হস্ত দিয়া আসিয়াছে তাহা সহজেই

অনুমেয়। ইহার যে-কোন শ্রেণীর কার্য্য বন্ধ হইলে সমস্ত কার্য্য বন্ধ হয়, সমস্ত চক্রের গতি রুদ্ধ হয়। এই হইল বিষটীর কার্য্যগত দিক, কিন্তু ইহা লইয়া আরও কত লোক যে স্বীয় স্বীয় চিন্তা খাটাইতেছেন তাহা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে স্বতঃ পরতঃ এই শস্যোৎপাদন রূপ সামান্য কার্য্যে কেবল কৃষক নহে, কিন্তু সমাজস্থ সকলেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে সমাজ ব্যক্তিসমূহের কেবল সমষ্টি নহে। সমাজে ব্যক্তিসমূহ পরস্পর এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত গভীর যোগে আবদ্ধ, যে ইচ্ছা করিলেই সে যোগ ছিন্ন হইতে পারে না।

জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের কার্য্যই শরীরের কার্য্য এবং শরীরের কার্য্যই বিভিন্ন অঙ্গের কার্য্য, একেকে ছাড়িয়া যেমন অন্যের কার্য্য ও অস্তিত্ব অসম্ভব, উভয়ে উভয়ের সহকারী, কেহই নিরপেক্ষ নহে, একের স্বার্থের সঙ্গে অন্যের স্বার্থ এবং সমগ্র শরীরের স্বার্থের সঙ্গে যেমন প্রত্যেকের স্বার্থ জড়িত, তাহা যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না; সমাজেও ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থে ও সামাজিক স্বার্থে কোনও বিরোধ নাই। সমাজ ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ মাত্র। সামাজিক বিধিব্যবস্থা সকল ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচ করা দূরে থাকুক, ইহারা ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত করে। ইহারা মানবের অন্তঃপ্রকৃতির বহির্বিকাশ মাত্র। সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচন যন্ত্র নহে, কিন্তু মনুষ্যত্ব-বিকাশের ক্ষেত্র। সমাজই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিচালনের একমাত্র স্থান। যাহারা সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে বাহিরের জিনিষ মনে করেন, তাঁহাদের নিকট সমাজ একটা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা মাত্র (Arbitrary power)। কিন্তু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন স্বাধীনভাবে কায করিয়াও শরীরের সঙ্গে এক, আপনাদিগের অস্তিত্ব শরীরের মধ্যে বিলীন করিয়া দিয়াও যেমন স্ব স্ব স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে, এবং এইরূপে বিলীন করিয়া দেয় বলিয়াই যেমন আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যাঁহারা আপনাদিগকে সমাজের সঙ্গে এক করিয়া দেখেন, সমাজের বিধিব্যবস্থাকে আপনাদেরই বিধিব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন, তাহারা সমাজকে আর এরূপ বাহিরের ভাবে ও ভয়ের চক্ষে দর্শন করেন না। সমাজের আদর্শ তাহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ অপেক্ষা কোনও অংশেই ভিন্ন নহে। সমাজ তাঁহাদের উচ্চতর আমিত্ব (Higher

৪০। তাঁহারা তখন সামাজিক রীতি নীতি বিধিব্যবস্থাকে এই উচ্চতর 'আমির' বিকাশের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতার বিরোধকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। সমাজ-প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থা যখন আমি এইরূপে গ্রহণ করি, তখন আমি ও সমাজ দুই থাকি না, এক হইয়া যাই। এইরূপ ভাবে সমাজ ও ব্যক্তিকে দেখিলে, মানুষ আর আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র আমিত্বের শৃঙ্গাঘাতে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিবার সুবিধা ও সুযোগ পায় না। এখানে নিম্নতর আমিত্বের বিনাশই প্রকৃত পথ। যিনি এই 'আমি'কে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবনলাভে অসমর্থ। সমাজদেহের সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া ফেলিতে হইবে এবং সামাজিক মঙ্গলকেই স্বীয় মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ না করিয়া যিনি নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে যাইবেন, তিনি বিনষ্ট হইবেন। এই উচ্চতর আমিত্বের নিকট যিনি আত্ম-সমর্পণ করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ। ইহা[illegible]ই মানবত্বের বিকাশ। সেইজন্য আবার বলি, ব্যক্তিগত আদর্শ ও সামাজি[illegible] আদর্শ একই, উভয়ের মঙ্গলামঙ্গল একই মূলসূত্রে গ্রথিত, একটিকে ছা[illegible]য়া অন্যে দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং স্বার্থত্যাগেই স্বার্থ সিদ্ধি, আত্ম[illegible]বিসর্জ্জনেই আত্মলাভ। নিজেকে ভুলিলেই স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি। সুতরাং জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে আমাদের চিন্তা ও কার্য্যের মূলে সর্ব্বদাই এই আদর্শ বর্ত্তমান থাকা চাই, আমাদের সমুদায় চেষ্টা এই আদর্শেরই অনুরূপ হওয়া চাই। আমাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, যে আমি স্বতন্ত্র কিছুই নই, আমি সমাজ-দেহের একটী অঙ্গ মাত্র। এবং আমার জীবন-মৃত্যু অন্য সকলের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। সমাজ আমার আদর্শেরই প্রতিকৃতি মাত্র। এই ভাব মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আর পরস্পরের বিবেক-ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নিতে সমাজ-দেহ ভস্মীভূত ও সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবার কোনও আশঙ্কা থাকিবে না। সামাজিক জীব মানবের পক্ষে আর অন্য পথ নাই। ইহাই একমাত্র পথ। শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র অবলম্বন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। ঋষি বলিয়াছেন —

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই যে একের জন্য অপরের আত্মবিক্রয়, ইহা স্বার্থ পরার্থ দুইই। অথবা ইহা আর কিছুই নহে, ইহাই মানবপ্রকৃতি। এখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম লাভালাভ কিছুই নাই, ইহাই মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

আমরা যত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে ইহা বেশ প্রতীতি হইবে যে, এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজের বাধ্যতায় কোনও অসামঞ্জস্য নাই। পরন্তু ইহাই দেখা যায়, যে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার কেবল সামাজিক অবস্থাতেই সম্ভব হয়। তাহাই আমার স্বাভাবিক অধিকার, যাহা অন্যকর্ত্তৃক আমার অধিকার বলিয়া স্বীকৃত, এবং এরূপ স্বীকার কেবল স্বাধীন জীবমণ্ডলীর মধ্যেই সম্ভব। তখনই মানুষ অনাহত ভাবে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে স্বাধীনতার সহিত স্বীয় অধিকার চালনা করিতে সক্ষম হয়, যখন সকলেই সাধারণ সামাজিক মঙ্গলকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ফুস্‌ফুসের কায ফুস্‌ফুস্ করে, পাকস্থলীর কায পাকস্থলী করে, কিন্তু কেহ কাহারও কাযে অন্তরায় হয় না, কারণ উভয়েরই লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্য। এখানে স্বাধীনতা বাধ্যতায়, বাধ্যতা স্বাধীনতায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, কেন না সকলেই এই সাধারণ সামাজিক মঙ্গলের সমাংশভাগী।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব যদি সমাজের অংশ রূপেই কেবল সম্ভব হয়, ব্যক্তিত্ব ও সমাজ যদি এক অবিচ্ছেদ্য বস্তুর দুই দিক্ মাত্রই হয়, তবে কেন প্রত্যেক মানুষ একথা মনে করে, যে সে নিজেই নিজের উপায় ও উদ্দেশ্য (law and end unto himself)? এ কথার সংক্ষেপ উত্তর এই, যে যে মানুষ কখনও সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাদির বাধ্যতা কি তাহা জানে নাই, তাহার পক্ষে কোনও আভ্যন্তরীণ অনতিক্রমণীয় নীতির জ্ঞান সম্ভব নহে। সামাজিক বাধ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর না হইলে মানুষ কখনই এরূপ একটী আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পায় না। এই জন্যই নিতান্ত অসভ্য মানুষ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যচারী

একটী পশুর মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও পার্থক্যই নাই। আভ্যন্তরীণ শক্তির জ্ঞান ও বাহিরের বিধিব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতার ভাব, এ দুইটী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তখনই কেবল বস্তুসম্বন্ধ-বিরহিত হইয়া সাধারণভাবে (in an abstract form) এই শক্তি আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, যখন ইহার বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ সামাজিক রীতি নীতি ইহার অন্তরাদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া যায়। যখনই আদর্শ হইতে সমাজ দূরে যায়, তখনই ব্যক্তিগত নীতির প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু ইহা প্রতি-ক্রিয়া মাত্র; এ অবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। যাহা হউক, আমরা ভিতরে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহাও সামাজিক জীবনের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি পরস্পরের উপর কার্য্য করিতেছে। যদিও সমাজ ব্যক্তিত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ব্যক্তিত্বকে গঠন করি-তেছে, তথাপি সমাজ গঠন করিবার শক্তি ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখনই সমাজ আদর্শের নিম্নে পতিত হয়, তখনই ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশিত হইয়া সমাজকে সংস্কৃত করে। সমাজ তখন ব্যক্তিত্বকে স্বীয় রোগ নিবারণের ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করেন। ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। বিশৃঙ্খলতার সময়েই সমাজে ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করে। জগতের সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্ত।

এখন কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে সমাজকে আমরা কি করিয়া আমাদের অন্তরাদর্শের প্রতিকৃতি বলিতে পারি, যখন সমাজে এত অসম্পূর্ণতা ও দোষ দৃষ্ট হইতেছে? ইহার উত্তর এই, যে প্রকৃত সমাজকে আদর্শ সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান সমাজকে আদর্শ সমাজের পূর্ব্ব ভাগ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমরা সকল কার্য্যে এই ভাবেরই পরিচয় পাই। যখন আমরা একটী অতি মহৎ আদর্শ হৃদয়ে লইয়া ক্ষুদ্রাকারে কার্য্য আরম্ভ করি, তখন এই প্রারম্ভিক ক্ষুদ্রতা যেমন আমাদের আদর্শের মহত্ত্বকে বিনষ্ট করে না, সেইরূপ সমাজ অপূর্ণ হইলেও, ইহা যে আদর্শ সমাজেরই পূর্ব্বভাগ, এই ভাবেরও কোন ব্যত্যয় হয় না। ক্ষুদ্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও আমাদের একত্ব যেমন ঐ আদর্শেরই অঙ্গে, সেইরূপ আমরা বর্ত্তমান সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও আমাদের একত্ব,

সমাজ যাহা আছে তাহার সঙ্গে নহে, কিন্তু সমাজ যাহা হইবে তাহারই সঙ্গে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা প্রকৃত সমাজ হইতে দূরে যাইতে পারি না, এই সমাজ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আদর্শ (ideal) চিরকালই প্রকৃতকে (real) অতিক্রম করিবে। আদর্শ কোন মুহূর্ত্তেই প্রকৃতের সঙ্গে এক হইতে পারে না। সেরূপ হওয়া আর আদর্শের আদর্শত্ব বিনষ্ট হওয়া একই কথা। আদর্শের সঙ্গে প্রকৃতের যে এই বিভিন্নতা, ইহা হইতেই অভাববোধের উৎপত্তি, এবং ইহা দ্বারাই ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে। ক্রমে ক্রমে আদর্শকে আয়ত্ত করিবার যে চেষ্টা তাহাই সকল প্রকার সামাজিক ও ব্যক্তিগত কার্য্যের জননী। উন্নতিশীল জীবমণ্ডলীর পক্ষে ক্রমশঃ আদর্শের নিকটবর্ত্তী হওয়া ছাড়া অন্য গতি নাই। কিন্তু আদর্শ কখনও সমাজে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে না বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নহে, যে আদর্শ প্রকৃত অপেক্ষা একটী স্বতন্ত্র জিনিষ। আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে সর্ব্বদাই সমাজে প্রকাশিত রহিয়াছে। স্বর্গরাজ্যের জন্য যে আমরা কেবলই সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব তাহা নহে। স্বর্গ-রাজ্যের মধ্য দিয়াই আমরা আসিয়াছি। আমাদের পশ্চাতেও স্বর্গরাজ্য। এখনও আমরা স্বর্গরাজ্যেরই প্রজা, এবং আমাদিগকে লইয়া গঠিত এই স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে একীভূত হওয়াই আমাদের মুক্তি। সমাজে অপূর্ণতা আছে বলিয়া যদি তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে হয়, তবে আমার নিজের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখিয়া আমাকে আত্মহত্যা করিতে হয়। আদর্শের যে টুকু কেন সমাজে প্রকাশিত হউক না, তাঁহারই সঙ্গে একীভূত হইয়া আমাকে উচ্চ আদর্শ সাধন করিতে হইবে, সমাজে আমার যে স্থান সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই আমাকে সে আদর্শ আয়ত্ত করিতে হইবে, দূরে গেলে চলিবে না। আমি যে সমাজের সঙ্গে অনুস্যূত, এবং সে সমাজে আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখান হইতেই আমার চেষ্টা আরম্ভ হইবে, সামাজিক অপূর্ণতাকে ভুলিয়া কোনও অনির্দ্দিষ্ট উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইলে কেবল শক্তিক্ষয় ব্যতীত অন্য কোনও লাভের আশা নাই। শক্তিহীন মানুষ যদি শক্তিমানের ভার মস্তকে গ্রহণ করে, তবে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" কি সে উপহাসাস্পদ হয় না? পার্থিব

বিবর্ত্তনের দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে স্থাবর বৃক্ষ অপেক্ষা জঙ্গম জীব নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইবে। তাই বলিয়া কোন্ বিবেচক ব্যক্তি বৃক্ষকে চালাইতে আরম্ভ করিবে? বৃক্ষ যদি চলিতে আরম্ভ করে, তবে কি সে সমূলে পরিশুষ্ক হইবে না? বৃক্ষকে যদি চলিতে হয় তবে সে যে স্থানে আছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই তাহাকে জঙ্গম হইতে হইবে, এবং বৃক্ষ হইতে জীবে পরিণত হইতে হইলে যে সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিতে হয়, সেই স্থানে বদ্ধমূল হইয়াই তাহাকে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে, নতুবা তাহার পক্ষে চলৎশক্তিলাভ অসম্ভব। তাহা না করিয়া সে যদি হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করে, তবে বাজীকরের বাজীর ন্যায় কিয়ৎক্ষণের জন্য জগতের ও স্বজাতীয় বৃক্ষশ্রেণীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া চিরতরে বিনাশগর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইবে। কেবল জঙ্গমত্ব নহে তাহার স্থাবরত্বও বিনষ্ট হইবে। আকাশে উড়িতে হইলে অগ্রে পক্ষোৎগম এবং তদুপযোগী শারীরিক গঠন প্রয়োজন, নতুবা 'কথামালা'র সেই পক্ষীকচ্ছপ রহস্যের ন্যায় কচ্ছপের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও তাই। ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতাকাশে উড়িতে হইলে যে আভ্যন্তরীণ শক্তি-উপচয় আবশ্যক, তাহা না লাভ করিয়াই যদি আমরা বাহিরে ইউরোপীয় হই, তবে তাহার ফল শোচনীয় হইবেই। ভারতীয় সভ্যতাকে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে যে সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে হইবে, তাহা সময়-সাপেক্ষ। ইহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমরা যদি এক লম্ফে সমুদ্র পার হই, তবে আমাদের পক্ষহীনতা ও শারীরিক ভার শীঘ্রই আমাদিগকে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ধকারে আনয়ন করিবে, লাভের মধ্যে আমাদের পৈতৃক হাড় কখানা ভাঙ্গিয়া যাইবে। শক্তিমানের ভার লইবার পূর্ব্বে শক্তি-উপার্জ্জন আবশ্যক, নতুবা বিনাশ অনিবার্য্য, সেই জন্যই গীতা বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ *

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে যে,

---

* বাবু হীরালাল হালদার এম্,এ, প্রণীত "Two Essays on Theology and Ethics" দ্রষ্টব্য।

আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়াছি এবং ব্যক্তিকে সমাজগর্ভে বিলীন করিয়া দিয়াছি। এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আমরা ব্যক্তি ও সমাজকে একই বস্তুর দুই দিক্ বলিয়াছি। যে বস্তু হইতে সমাজের সমাজত্ব, তাহাতেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে সমাজের অধীন হওয়া, নিজের অধীন হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমাজ ব্যক্তি সমূহের কেবল সমষ্টি না হইলেও ব্যক্তি সমূহকে ছাড়িয়া সমাজের অস্তিত্ব কোথায়? আমরা যে জাতীয় বা সামাজিক আদর্শের কথা বলিয়াছি, তাহার প্রকাশ ব্যক্তিরই মধ্যে। জাতীয় ভাব কিছু আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে না। জাতীয় উন্নতি যদি ব্যক্তি সমূহের উন্নতি না হয়, তবে উন্নতি কথাটার কোনও অর্থই থাকে না। জাতীয় জীবনের অর্থ সেই জীবনীশক্তি, যাহা ব্যক্তিসমূহের পরস্পর আদান প্রদানের মধ্যে প্রকাশিত এবং যাহার বিশেষত্ব অবস্থার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমাজ যদি বাহিরের আবরণের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্থগিত করে, তবে তাহার সে চেষ্টা আত্ম-হত্যার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ হইবার কারণ এই, যে ব্যক্তি ও সমাজ একই শক্তির দুইটী আপেক্ষিক স্রোতঃপ্রবাহ মাত্র।

আমরা এতক্ষণ যে সামাজিক মত স্থাপনের চেষ্টা করিলাম এখন তাহার বিরুদ্ধবাদী একটী মতের (যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে) সমালোচনা করিব। মতটীর উল্লেখ করিলেই আমরা তাহার ভ্রান্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

এই মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন, যে মানুষ জন্মিবার সময় সমাজবন্ধনের অতীত কতকগুলি অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এগুলি তাহার স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু প্রশ্ন এই, মানুষ জন্মিবার সময় কি সমাজের অধীন হইয়াই জন্মে না? ইহারা বলেন জন্মকালে মানবাত্মা এক খণ্ড সাদা কাগজের মত কিম্বা এক টুকুরা মোমের মত থাকে। যে-কোন ভাব তাহার উপর অঙ্কিত করা যাইতে পারে, এবং তাহাকে যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করা সম্ভব। সে কোনও বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহার যাহা কিছু বিশেষত্ব তাহা বিশেষ শিক্ষা ও অবস্থার ফল।

এই মত বংশানুক্রম (heredity) এবং পুনর্জন্মবাদ (transmigration) উভয়েরই বিরোধী। মানুষ জন্মিবার সময়, সে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে, সেই সমাজানুযায়ী বিশেষ প্রকৃতি পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা করিলেই যাহাকে তাহাকে শেক্ষপিয়র, কালিদাস, নিউটন বা ভাস্করাচার্য্য প্রস্তুত করা যায় না। জুলু-জার্ম্মানে এমনই একটা অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বর্ত্তমান, যাহা শিক্ষা ও অবস্থার শত সমতা বিধানেও এক পুরুষেই দূরীকৃত হইবার নহে।

এখন কেহ বলিতে পারেন, সমাজে আসিবার পূর্ব্বে মানুষ যে প্রকৃতি পায় তাহার উপর সমাজের দাবী কি? যথেষ্ট দাবী রহিয়াছে। বংশানুক্রমানুসারে যদি বিচার করা যায়, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহার বিশেষ প্রকৃতি পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, কিম্বা পরম্পরাগত পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতি লইতে লব্ধ। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতি সমাজেই গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং সে যে প্রকৃতি লইয়া জন্মে তাহা সমাজেরই ফলমাত্র। পুনর্জন্মবাদীর কথার উত্তর আরও সহজ। একই আত্মা পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে, সুতরাং জন্মকালে সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সংস্কার লইয়া জন্মিয়া থাকে তাহা সামাজিক জীবনেরই ফল, কাজেই তাহারও জন্মগত সংস্কার সমাজের অধিকার-বহির্ভূত নহে।

তাঁহারা পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন, যে এই অধিকার সে শিক্ষাদ্বারা লাভ করে। একথা অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু সে যে-কিছু অধিকার সমাজে শিক্ষাদ্বারা লাভ করে তাহা সমাজাতীত বা সমাজ-বিরুদ্ধ হইতে পারে না। মানুষ জন্মিবার সময় মনুষ্যত্বের যে বীজ বা সংস্কার লইয়া আসে, তাহা অঙ্কুর মাত্র (abstract potentiality)। ইহার পূর্ণতা কেবল সমাজেই সম্ভব। ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার যোগেই তাহা বিকাশিত হয়। বিভিন্ন জল, বায়ু ও খাদ্যের দ্বারা যেমন তাহার শরীর ও মন ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার আত্মার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা বিভিন্ন ভাবে গঠিত হয়। একই সমাজে যে মানুষ নির্দ্দয় ও সহৃদয় হয় তাহা তাহার শিক্ষা ও পার্শ্ববর্ত্তীদের দৃষ্টান্তেরই ফল। এইরূপে দেখা যায়, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে সমাজের প্রভাবেই গঠিত

হয়। এই মতের বিপক্ষে একটী প্রতিবাদ হইতে পারে, তাহা মহাপুরুষদের জীবনী। ইহাদিগের জীবন দেখিয়া মনে হয় যে, ইহারা যে সময়ে ও যে সমাজে বাস করেন, সে সময় ও সেই সমাজকেই ইহারা গঠন করেন, সমাজ ইহাদের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, ইহারা যেন সময় ও সমাজের অতীত। যদ্বিও ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে, (তাহা ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তথাপি মহাপুরুষদিগকে যে ভাবে সমাজাতীত মনে করা হয়, তাহা যথার্থ নহে। মহাপুরুষেরা আকাশ হইতে কোনও অলৌকিক শক্তি প্রভাবে এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়া অবতীর্ণ হন না। এ কথা ঠিক, যে মহত্ত্বে সাধারণ জনশ্রেণী হইতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মহত্ত্বের উন্নতশিখরে আসীন। সেই মহত্ত্ব বীজাকারে তাঁহদের মধ্যে জন্মকালেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সমাজ ছাড়িয়া তাহা কখনও বিকাশিত হইতে পারে না। সমাজের ঘাতপ্রতিঘাত ও আদানপ্রদানেই তাহার পূর্ণতা। সাধারণ জনশ্রেণীর ন্যায় তাঁহারাও সমাজের রীতিনীতি ও ভাবের দ্বারা পুষ্টিলাভ করেন এবং অন্যের সহযোগিতা ভিন্ন স্বীয় অভীষ্ট পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন কি, যে বিশেষ মত প্রচারদ্বারা তাঁহারা জনসমাজকে বিকম্পিত করিয়া তুলেন, তাহাও তদানীন্তন সময়ে লোকমণ্ডলীর মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইবার অবসর খুজিতেছিল। তাঁহারা স্বীয় প্রতিভা বলে তাহা বুঝিতে পারিয়া অবলম্বন করেন, ও লোকসমাজে :বহুলভাবে প্রচারিত করেন। মহত্ত্ব তাঁহাদের নিজস্ব হইলেও ইহার বিকাশ সামাজিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে ছোট বড় আমরা সকলেই স্বীয় স্বীয় মনুষ্যত্বের জন্য সমাজের নিকট ঋণী। কেহই ইহার দাবীর অতীত নহি। সুতরাং যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত ও মস্তিষ্কে একটুও চিন্তাশক্তি থাকিবে, তত ক্ষণ আমরা মনুষ্য-সমাজে থাকিতে বাধ্য। এবং কোন অবস্থাতেই উহার মঙ্গল কামনা হইতে বিরত হইতে পারি না। এরূপ কোনও ঘটনাই ঘটিতে পারে না, যাহার জন্য আমি একান্ত বিরক্ত হইয়া জনসমাজ পরিত্যাগ করতঃ অরণ্যবাসী হইতে পারি। জনসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইয়া সন্ন্যাসাবলম্বনের ন্যায় নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞ-

তার কাজ আর কিছু হইতে পারে না। পিতামাতার সাহায্যে স্বাবলম্বনক্ষম হইয়া সেই পিতামাতার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি উদাসীন হওয়া অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া শতগুণে অধিক দোষাবহ। ইহা যে কেবল কৃতঘ্নতা তাহা নহে, কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞতা।

আমাদের সমালোচনাস্থানীয় পণ্ডিতদের আর একটী মত এই, যে সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পরস্পরে বিরুদ্ধ। আমরা আমাদের মতব্যাখ্যাস্থলে যাহা বলিয়াছি, এই মতের প্রতিবাদে সে সমস্তই প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া এখন এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে 'কথামালা'য় উদর ও অন্যান্য অবয়বের স্বার্থের যে বিরোধ, সমাজ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের তদতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার বিরোধ নাই।

কি প্রণালীতে সমাজের শাসনদণ্ড পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সমাজের যে আদর্শ লাভ করিয়াছি, তাহাতে যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিগত প্রভুত্বের অর্থাৎ রাজতন্ত্রের (absolute monarchy) স্থান নাই। মানুষ একমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বানুমোদিত নিয়মেরই অধীন হইতে পারে। সুতরাং শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্র হওয়া চাই। কিন্তু গ্রীসের ন্যায় পূর্ণ প্রজাতন্ত্র (Pure democracy) একরূপ অসম্ভব। প্রতিনিধি প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমাজের যে অংশে যে জ্ঞান ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে লাগাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু ইহার গঠন কিরূপ হইবে তাহা দেশকাল ও অবস্থা দৃষ্টে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। নির্ব্বাচকদিগের বিবেচনা এবং নির্ব্বাচিতদিগের দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর এই প্রণালীর দোষগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপক ও কর্ম্মচারীদিগের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপায় আছে, তাহা সর্ব্বদাই অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিনিধিদিগকে অধিক সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে, না সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্তে পাছে তাঁহারা প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই ভয়ে অল্প অল্প ক্ষমতা দিয়া কম সময়ের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে—কি প্রণালী অবলম্বন করিলে কার্য্য ভাল চলিবে ও তাহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি হইবে, তাহা অভিজ্ঞতাদ্বারা নির্ণীত হওয়াই বিধেয়। কিন্তু

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে, যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া আমরা যদি উপযুক্ত দায়িত্ব-জ্ঞানপূর্ণ লোক নিযুক্ত করি এবং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সময় ও ক্ষমতা দিই, তাহা হইলে এক দিকে যেমন তাঁহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে, অপর দিকে অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা তাঁহারা শৃঙ্খলার সহিত অভীষ্ট কাজও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও লাভ হয় না, লাভ হইলেও সময়াভাবে তাহার ফল কার্য্যে লাগাইতে পারেন না। সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না বলিয়া হয় ত তাঁহাদের কোনও নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

আবার যাঁহারা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে তাঁহারা প্রতিনিধিরূপেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা যাঁহাদের প্রতিনিধি, তাঁহাদেরই ইষ্টানিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, ব্যক্তিগত ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবে না। তাঁহাদের নির্ব্বাচনকারিগণ যেমন সময়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারেন না, (এখানে নিয়মতন্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালীর কথাই হইতেছে), কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় তাঁহাদেরও ইহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কোনও ব্যক্তিগত ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সময় অতীত হইবার পূর্ব্বে, কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবারও তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। তখনই কেবল পারেন যখন সে কাজ সমাজেরই কল্যাণার্থ হইবে। তখনই কেবল কোনও অঙ্গকে শরীরচ্যুত করা যাইতে পারে, যখন সমগ্র শরীর রক্ষার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়। এই ভাব মনে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেই মানুষের দায়িত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে এবং অনেক পরিমাণে মানুষ স্বীয় ব্যক্তিগত ভাবের অতীত হইতে সক্ষম হয়।

প্রতিনিধি শাসন-প্রণালীর একটী দোষ এই, যে ইহার গতি অতিশয় মন্থর। হঠাৎ কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলেই মহা সঙ্কট। এই অপূর্ণতা পরিহারের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়া প্রতিনিধিদিগের উপর স্থাপিত করিলে চলিতে পারে। এরূপ করা এই শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধ নহে। কারণ যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব

নহে, উহা সমাজেরই শক্তি। সুতরাং তাহার অপব্যবহার হইলে সে শক্তি উঠাইয়া লইবার ক্ষমতাও সমাজের রহিয়াছে। কিন্তু ইহা মতের ব্যাপার নহে, ইহার মীমাংসা অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন-সাপেক্ষ, সুতরাং বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার আলোচনা করেন তাহাই বাঞ্ছনীয়।

আমরা এখানে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব; বিষয়টী গুরুবাদ। আমাদের এই সমাজতত্ত্বে গুরুবাদের স্থান কি? আমরা দেখিয়াছি সমাজ ছাড়িয়া মানুষ মানুষই নহে। তাহার মনুষ্যত্বলাভ সমাজের উপর নির্ভর করে। আবার যেরূপ সমাজে তাঁহার বাস, যেরূপ সঙ্গে সে পরিবর্দ্ধিত, সেইরূপ প্রকৃতিই সে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে হইলে যে তাঁহাকে অভিজ্ঞ লোকের শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। আমরা সমাজে সাধারণ ভাবে প্রত্যেক লোকের নিকটেই উপদেশ লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু সকলেই স্বীয় জীবনে দেখিয়াছেন, যে কোনও কোনও ব্যক্তির নিকট আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। দশ জনের সঙ্গে মিলিত হই, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব দুই এক জনের সঙ্গেই জন্মে। দশ জনের নিকট উপদেশ পাই, কিন্তু সকলের সঙ্গেই হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয় না। যাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম জীবনের গতির একত্ব লক্ষিত হয়, তিনি যদি জ্ঞানে উন্নত ও ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হন এবং আমার হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা থাকে, তবে লৌহ যেমন চুম্বকের অনুসরণ করে, আমিও স্বভাবতঃ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব, ইহাতে যদি কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া পরিত্যাজ্য। যাঁহার সঙ্গে এইরূপে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয় তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করা কি অন্যায়? অন্যায় ত নহেই, অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। ধর্ম্ম জীবন একটা মতের ব্যাপার নহে। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইবার বাসনা থাকিলে, যাঁহারা কার্য্যতঃ সে পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ যে একান্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা নিতান্ত অবিধেয়। ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক যে ভ্রান্ত গুরুবাদের প্রশ্রয় দিয়া বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন, গুরুসম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত ও উপদেশের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। যাহা করা সমাজের

কর্ত্তব্য ছিল, তাহা ব্যক্তির হাতে পতিত হওয়াতেই এই অনর্থপাত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই যদি ইঁহারা সুপ্রতিষ্ঠ-জীবন সুগঠিতচরিত্র ব্রাহ্ম গুরুর আশ্রয় পাইতেন, তবে ভ্রান্ত গুরুর আশ্রয় লইয়া উন্মার্গগামী হইবার অবসর ইঁহাদের থাকিত না। ইহাতে যে কেবল অনিষ্ট নিবারিত হইত তাহা নহে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ দিক ধর্ম্মপিপাসুগণের একটা আকর্ষণের বস্তু হইত। সেই জন্য সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার, সমস্ত দিক বিচার করিয়া, অতি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মজ্ঞ গুরুর হস্তে অর্পণ করেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে এখানে * ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা হইয়াছে, সুতরাং আমি বিষটীর অবতারণা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

২১শ শ্লোক। "য এনং বেত্তি হন্তারম্" (যিনি ইহাকে হত্যাকারী বলিয়া জানেন) এই মন্ত্রের দ্বারা আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ম্ম ও কর্ত্তা হইতে পারেন না ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া, "ন জায়তে" এই মন্ত্রের দ্বারা ইহার অবিক্রিয়ত্বের হেতু প্রদর্শন করতঃ "বেদাবিনাশিনম্" ইহাদ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ জানেন—অবিনাশী বা অন্ত্যভাবরূপ-বিকাররহিত অর্থাৎ মৃত্যুশূন্য এবং নিত্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনরহিত বলিয়া যিনি জানেন—পূর্ব্বের সহিত এই যোগ। ইহাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত এই আত্মাকে যিনি অজ অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধি রহিত বলিয়া জানেন, সেই বিদ্বান্ জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্ত পুরুষ কেন এবং কি প্রকারেই বা হনন ক্রিয়া করিতে পারেন, কি প্রকারেই বা ঘাতককে নিযুক্ত করিতে পারেন? অর্থাৎ কোনরূপে কাহাকেও হননও করেন না এবং কোনরূপে কাহাকেও ঘাতকরূপে নিযুক্ত করেন না। এ উভয় স্থলে নিষেধই অর্থ, কেননা এ স্থলে প্রশ্নার্থ অসম্ভব। হেত্বর্থ অর্থাৎ কেন হত্যা করিবেন এবং আত্মার অপরিবর্ত্তনত্ব এই দুইয়ের একই অর্থ বলিয়া

---

* তত্ত্ববিদ্যা সভায়।

বিদ্বান্ ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্ম প্রতিষেধই ভগবানের অভিপ্রেত প্রকরণার্থ। হননক্রিয়ার নিষেধ উদাহরণার্থ। বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, ইহার বিশেষ হেতু দেখাইয়া "কথং স পুরুষঃ" এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন। আচ্ছা, আত্মার অবিক্রিয়ত্বই কি সর্ব্ব কর্ম্মাসম্ভবের বিশেষ কারণ বলিয়া উক্ত হয় নাই? উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কারণ নহে। কেন না আত্মার অবিক্রিয়ত্ব এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির অবিক্রিয়ত্ব দুইটী বিভিন্ন পদার্থ। অবিক্রিয় স্থাণুকে যে জানে তাঁহার পক্ষেও তবে কর্ম্ম সম্ভাবিত নহে, যদি ইহা বল, তবে উত্তর এই যে, ইহা হইতে পারে না, কেন না বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মস্বরূপ, কিন্তু দেহাদিসংঘাতের বিদ্বত্তা অর্থাৎ জানিবার শক্তি নাই। অতএব শেষ মীমাংসা এই, যে অসংহত অর্থাৎ বস্তু সমূহের একীকরণদ্বারা উৎপন্ন হন নাই এমন যে আত্মরূপী বিদ্বান্ ব্যক্তি, তিনি অবিক্রিয়। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম অসম্ভব বলিয়া "কথং স পুরুষঃ" এই বাক্যের দ্বারা যে কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত। অবিক্রিয় হইয়াও যেমন আত্মা বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতাজনিত অবিদ্যাদ্বারা বুদ্ধ্যাদি-সংগৃহীত শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধা বলিয়া কল্পিত হন, সেইরূপ আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞানের অভাববশতঃ পরমার্থতঃ অবিক্রিয় আত্মা বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় অসত্যরূপা অবিদ্যাপ্রযুক্ত বিদ্বান্ বলিয়া কথিত হন। বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্ম অসম্ভব, ইহা যখন বলা হইয়াছে, তখন শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্মের বিধান আছে তাহা অজ্ঞানদিগের জন্যই বিহিত, ইহাই ভগবানের সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধগম্য হইতেছে। যদি বল, বিদ্যাও তবে অজ্ঞানীর জন্য বিহিত, কেন না বিদ্বানের পক্ষে বিদ্যার বিধান পিষ্ট-পেষণের ন্যায় অনর্থক, সুতরাং এখানে অজ্ঞানীর জন্য কর্ম্মের বিধান, জ্ঞানীর জন্য নহে, এই যে বিশেষত্ব, ইহা খাটিতেছে না,—তবে উত্তর এই, যে এরূপ নহে, কেন না অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পক্ষে ভাবাভাব অর্থাৎ থাকা না থাকা এই বিভিন্নতা রহিয়াছে, সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধিজ্ঞান হইলে পরে তাঁহা অনুষ্ঠেয়। এরূপ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাহার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। "আমি কর্ত্তা, "ইহা আমার কর্ত্তব্য" এইরূপ যাহার জ্ঞান, সেই অজ্ঞানীর পক্ষে যেরূপ কর্ত্তব্য বিহিত আছে, "ন জায়তে" এরূপ আত্মস্বরূপবিধির অর্থজ্ঞানের পর

সেরূপ কিছু অনুষ্ঠেয় নাই। এরূপ স্থলে 'আমি কর্ত্তা নই, আমি ভোক্তা নই', ইত্যাকার আত্মার একত্ব অকর্ত্তৃত্বাদি বিষয়জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, এই বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে যিনি আত্মাকে 'আমি কর্ত্তা' এরূপ জানেন, তাঁহার পক্ষে 'আমার ইহা কর্ত্তব্য' এই বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবিরূপে হয়। সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অধিকার আছে, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম তাঁহার কর্ত্তব্য। তাঁহার কর্ম্ম সম্ভাবনা আছে এবং তিনি অবিদ্বান্, কেন না বলা হইয়াছে "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" (ইহারা উভয়েই অজ্ঞানী)। দ্বিতীয় কারণ এই, যে অবিদ্বান হইতে ভিন্নীকৃত বিদ্বানের পক্ষে "কথং স পুরুষঃ" এই বচনদ্বারা কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত অবিক্রিয় আত্মদর্শী মুমুক্ষু বিদ্বানের সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসেই অধিকার, অর্থাৎ তাঁহার কোনও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব ভগবান্ নারায়ণ "জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্" এই শ্লোক দ্বারা বিদ্বান্ সাংখ্য এবং অবিদ্বান্ কর্ম্মীদিগকে বিভক্ত করিয়া দুই প্রকার নিষ্ঠা গ্রহণ করাইতেছেন। আর, এই বিষয়ে ভগবান্ ব্যাস পুত্রকে বলিয়াছিলেন "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" ইত্যাদি (এই দুই প্রকার পথ)। আরও, পূর্ব্বে কর্ম্মপথ পরে সন্ন্যাস পথ, এইরূপ যে বিভাগ তাহা ভগবান্ পুনঃ পুনঃ দেখাইবেন। অতত্ত্ববিৎ "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" অর্থাৎ অহঙ্কারদ্বারা মুগ্ধ হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে, কিন্তু জ্ঞানী 'আমি কিছুই করি না' এইরূপ মনে করেন। ইহার প্রমাণ "সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংনস্যাস্তে" ইত্যাদি, অর্থাৎ—সকল কর্ম্ম মনে মনে পরিত্যাগ করিয়া বাস করেন।

এই বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, 'আমি জন্মাদি-ছয়-প্রকার-বিকার-রহিত, অবিক্রিয়, অকর্ত্তা ও এক আত্মা,' এরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না,—যেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্ম-সংন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। এ কথা যথার্থ নহে, কেন না তাহা হইলে "ন জায়তে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অনর্থক হয়। যখন শাস্ত্রোপদেশের বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম যে আছে তাহার জ্ঞান এবং কর্ত্তার দেহান্তর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন শাস্ত্রের বলে সেই আত্মারই অবিক্রিয়ত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও একত্বাদি জ্ঞান কেন না উৎপন্ন হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিবেন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর

বলিয়া আত্মার জ্ঞান সম্ভব নহে, এরূপ বলা যায় না, কেন না "মনসৈবানু-দ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ মনের দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়, এই শ্রুতিবচন রহিয়াছে। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিত শমদমাদিদ্বারা বিশুদ্ধ মন আত্মদর্শনের উপায়। আর, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অনুমান ও শাস্ত্র সত্ত্বেও 'আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এরূপ বলা ধৃষ্টতা মাত্র। আরও, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তদ্বিপরীত অজ্ঞানতা অবশ্যই বাধিত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই অজ্ঞানতাও দর্শিত হইয়াছে, যথা—'আমি হত্যা করি বা হত হই' ইত্যাদি। "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" (তাঁহারা উভয়েই জানেন না) এই মন্ত্রদ্বারা আত্মার পক্ষে হননক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব ও হেতুকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ করণত্ব অজ্ঞানকৃত বলিয়া দেখান হইয়াছে। যাহা দেখান হইয়াছে তাহা সকল ক্রিয়ার পক্ষেই সমান। কর্ত্তৃত্বাদি যে অবিদ্যাকৃত, আত্মার অপরিবর্ত্তনীয়তাই তাহার কারণ। পরিবর্ত্তনশীল কর্ত্তাই আপনার কর্ম্মস্থানীয় অন্যকে 'কুরু' অর্থাৎ অমুক কর্ম্মকর, এই বলিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্মে অনধিকার প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ "বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষঃ" (যে আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানে, সেই পুরুষ কিরূপে) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বিদ্বানের সর্ব্বক্রিয়া সম্বন্ধেই কর্ত্তৃত্ব এবং হেতুকর্ত্তৃত্ব সাধারণভাবে নিষেধ করিতেছেন। তবে বিদ্বানের কিসে অধিকার—এই প্রশ্নের উত্তর 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্' (সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগের দ্বারা) এই শ্লোকে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" (মনের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম) ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বলিতেছেন। "মনসা" অর্থাৎ মনের দ্বারা, এই বচন থাকায় যদি কেহ আপত্তি করেন যে বাচিক এবং কায়িক কর্ম্মের সন্ন্যাস অভিপ্রেত নহে, তবে সে আপত্তি গ্রাহ্য নহে, কেননা 'সর্ব্ব কর্ম্ম' এই বিশেষণ রহিয়াছে। যদি বল মানসিক সর্ব্বকর্ম্ম বলাই অভিপ্রায়, তবে বলি তাহাও নহে, কেননা বাচিক ও কায়িক কার্য্যের পূর্ব্বে মানসিক কার্য্য থাকে, মানসিক কার্য্য না থাকিলে কর্ম্ম সম্ভব হয় না। "শাস্ত্রীয় যে সমস্ত বাচিক ও কায়িক কর্ম্মের কারণ মানসিক, সেই সমস্ত মানসিক কর্ম্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম্ম মনের দ্বারা সন্ন্যাস করিয়া"—যদি এইরূপ অর্থ করা হয়, তবে বলি, "নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্" (না করিয়া, না করাইয়া) এই

কথা আছে বলিয়া সেরূপ অর্থ হইতে পারে না। যদি বল, 'ভগবান্ এই যে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন তাহা জীবিতের পক্ষে নহে, মরণোন্মুখের পক্ষে' তবে বলি, "নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে" (দেহী নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে থাকেন) এই বিশেষোক্তির কোন অর্থ থাকে না বলিয়া তাহাও সঙ্গত নহে। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসকরতঃ মৃতের পক্ষে সেই দেহে কিছু না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান অসম্ভব। যদি বল "দেহে থাকে" এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু "দেহে সন্ন্যাস করিয়া" ইহাই অন্বয়, তবে বলি তাহাও সত্য নহে; কেন-না আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আসন ক্রিয়ার অধিকরণ আবশ্যক, কিন্তু সন্ন্যাস ক্রিয়ার অধিকরণের প্রয়োজন হয় না। সং পূর্ব্বক ন্যাস শব্দ এখানে ত্যাগার্থে ব্যবহৃত, নিক্ষেপার্থে নহে। অতএব গীতাশাস্ত্র মতে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ন্যাসেই অধিকার, কর্ম্মে নহে। এই বিষয় আত্মজ্ঞান প্রকরণের যে যে স্থানে উপস্থিত হইবে সেই সেই স্থানে দেখাইব।

(২২শ শ্লোক)।

প্রকারণোক্ত আত্মার বিষয় বলিব। এখানে আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। তাহা কি রূপ? "বাসাংসি" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তাহাই বলা হইতেছে। ইহ সংসারে মানুষ যেমন জীর্ণ অর্থাৎ দুর্ব্বলতাপ্রাপ্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা পুরুষের ন্যায় অবিক্রিয়, অর্থাৎ বস্ত্রের পক্ষে শরীর যেমন অবিক্রিয়, দেহের পক্ষে আত্মা তেমনই অবিক্রিয়, ইহাই অর্থ।

(২৩শ শ্লোক)।

কি হেতু অবিক্রিয়, "নৈনং ছিন্দন্তি" এই শ্লোকের দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে। প্রকরণোক্ত এই আত্মাকে অস্ত্রসমূহ অর্থাৎ অসি প্রভৃতি শস্ত্র ছেদন করে না, অর্থাৎ আত্মার নিরবয়বত্ব হেতু অবয়ব-বিভাগ করে না। সেইরূপ অগ্নিও ইহাকে ভস্মীভূত করে না। সেইরূপ জলও ইহাকে ক্লেদ-যুক্ত করে না; কেননা জল অবয়ববিশিষ্ট বস্তুকে আর্দ্র করিয়া তাহার অবয়ব-বিশ্লেষ সাধনে সমর্থ হয়; নিরবয়ব আত্মায় তাহা সম্ভব নহে। সেই

রূপ রসযুক্ত দ্রব্যকে বায়ু উহার রস শোষণের দ্বারা নাশ করে, কিন্তু এই আত্মাকে বায়ুও শোষণ করে না।

(২৪শ শ্লোক)।

যেহেতু এইরূপ, সেই জন্য "আচ্ছেদ্যোঽহয়ম্" ইত্যাদি। যেহেতু পরস্পর বিনাশকারী এই ভূতসমূহ এই আত্মাকে নাশ করিতে পারে না, সেই জন্য এই আত্মা নিত্য। নিত্য বলিয়া সর্ব্বগত, সর্ব্বগত বলিয়া স্থির, স্থির বলিয়া অচল, অতএব সনাতন, চিরন্তন অর্থাৎ অনিলের ন্যায় কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। যেহেতু "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি এক শ্লোকেই আত্মার নিত্যত্ব এবং অবিক্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, সেখানে যাহা কিছু আত্মবিষয়ে উক্ত হইয়াছে তাহা এই শ্লোকার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে অতএব এই সকল শ্লোক পুনরুক্তি,—এই আপত্তিও হইতে পারে না। আত্মবস্তুর দুর্ব্বোধত্ব হেতু কিঞ্চিৎ শব্দের দ্বারা এবং কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অন্য শব্দের সাহায্যে ভগবান্ বাসুদেব সেই বস্তুই নিরূপণ করিতেছেন। তাহা না হইলে কিরূপে অসংসারিত্ব সংসারিদিগের বুদ্ধিগোচর হইবে এবং অব্যক্ত তত্ত্ব সংসারনিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হইবে? আর, আত্মা অব্যক্ত ইত্যাদি। সকল ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া ব্যক্ত নহেন, এই জন্য এই আত্মা অব্যক্ত, অতএব ইনি অচিন্ত্য। যে বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই চিন্তার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এই আত্মা ইন্দ্রিয়-গোচর নহে বলিয়া অচিন্ত্য, অতএব অবিকার্য্য অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশূন্য। যেরূপ দুগ্ধ দধিপ্রভৃতিরূপে বিকারগ্রস্ত হয়, এই আত্মা সেরূপ নহে। এই আত্মা নিরবয়ব বলিয়া অবিক্রিয়। নিরবয়ব কোন বস্তুকেই বিক্রিয়াযুক্ত দেখা যায় না। অবিক্রিয় অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই এই আত্মাকে অবিকারী অর্থাৎ বিকারশূন্য বলা হয়।

ক্রমশঃ।

রামমোহনরায়-চতুষ্পাঠ্যাঃ কস্যচিচ্ছাত্রস্য।

সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ববিচার।

(সমালোচনা)

আজকাল ব্রাহ্ম মতের নিন্দা খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার সমালোচনা বড় কর্ণগোচর হয় না। যদি কোথাও সমালোচনা এক গুণ থাকে, তবে নিন্দা কুৎসা তাহার দশ গুণ। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ববিচার" এই আখ্যা দিয়া ব্রাহ্মমতের এক সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু বেশ বিজ্ঞোচিত ধীরতার সহিত বিরুদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়াছেন; তাঁহার ধীরতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আর উদ্দেশ্যও সাধু। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিগত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে নিরাকারবাদের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসার পথ আরও দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের তর্ককুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া অনেকের চক্ষু সত্যের জ্যোতি দর্শন করিতে পারিতেছে না। সত্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেও অধিকাংশ লোকের মনে যে প্রবল ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহারা সমুৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করিবে আশায় এই সামান্য পুস্তক খানি বিনীত ভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।" ধর্ম্মের গ্লানিতে নিষ্ঠাবান লোকের ব্যথিত হইবারই কথা। তিনি সরল ভাবে যাহা কর্ত্তব্য ভাবিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। এরূপ সারল্য ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে "এই পুস্তকে যে সকল সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিলে

ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে যত্নশীল হইব।” এটা সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

সিংহ মহাশয় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সেটা কিন্তু বড়ই অপ্রশস্ত। তাঁহার মতে “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মগণ হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিতেছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়” মহাশয়ের ‘ধর্ম্মজিজ্ঞাসা’ প্রথম ভাগ ও ‘নিরাকার ও সাকার উপাসনা’ নামক পুস্তকে” এই সকল বিশদরূপে বিবৃত। এই জন্য তিনি এই দুই খণ্ড পুস্তক অবলম্বনে নিরাকার বাদিগণের আপত্তি খণ্ডনে প্রয়াস পাইয়াছেন। বৃহৎ ব্যাপারে অবলম্বনটা নিতান্তই ক্ষুদ্র। নগেন্দ্রবাবুর পুস্তকদ্বয় নিরাকার মতের দর্পণস্বরূপ, রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকারবাদী আচার্য্যও উপদেষ্টাগণের সাকার উপাসনা সম্বন্ধে আপত্তি ইহাতে প্রতিবিম্বিত, একথা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। নগেন্দ্রবাবু এমন কথা কোথাও বলিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। আর নগেন্দ্রবাবু সমালোচিত মতের অন্যতম উপদেষ্টা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সংক্ষিপ্ত সারের (epitome, sketch বা abridgment) সাহায্য গ্রহণ এক প্রকার কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক হইলেও বিরুদ্ধ মতের যথাযথ সমালোচনার স্থলে তাহা নহে। সংক্ষিপ্ত সারাবলম্বনে পরকীয় মতের সুবিচার সুদূরপরাহত। ব্রাহ্ম মতের এই বিস্তৃত সমালোচনায় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি আচার্য্যগণের ও রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ রায়, কালীশঙ্কর কবিরাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি উপদেষ্টাগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার যথাযথ বিচার করা উচিত ছিল। বিচারক মহাশয় ঘুণাক্ষরেও তাহার চেষ্টা পান নাই। কেশববাবুর মত বলিয়া যে নববিধান মতের বিচার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা বিচার-ব্যপদেশে বক্তৃতা। বক্তৃতা করিলেই বিচার হয় না। ফল কথা সমালোচক মহাশয় ব্রাহ্ম সাহিত্যের সহিত খুবই অল্প পরিচিত। নগেন্দ্রবাবুর বই দুখানিই তাঁহার সম্বল। সমালোচকের মতে তাঁহার অবলম্বিত বিচার-প্রণালী “দেশী ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক যুক্তি।” তিনি বলেন “যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল যুক্তির

উপর নির্ভর করিত ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতের আলোচনা করা হয় নাই।" যতীন্দ্রবাবুর বিচারপুস্তকে দেশীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচনের অসদ্ভাব নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক যুক্তির অতি অল্পই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলাম। বেন্ ম্যান্সেল্ ও স্পেন্সারের বচন অনেক স্থলে উদ্ধৃত ও তাহাদের যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য শাস্ত্র বলিতে বেন্ ম্যান্সেল্ প্রভৃতির গ্রন্থ বুঝায়, ইহা আমরা নূতন শুনিলাম। পাশ্চাত্যগণ একমাত্র বাইবেল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া জানেন, আর বাইবেলের প্রসিদ্ধ টীকা গুলিকে কতকটা শাস্ত্র পদবীতে স্থান দিতে পারেন। উক্ত দার্শনিকগণের মত বিচারকের মতের অনুকূল বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থের শাস্ত্রত্ব ও তাঁহাদের যুক্তির শাস্ত্রমূলকত্ব সংস্থাপনের প্রয়াস বৃথা। হাজার লওয়াইলেও পাশ্চাত্য খৃষ্টান বাইবেল ছাড়িয়া "ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্"কে শাস্ত্র বলিবেন না। যতীন্দ্রবাবুর পুস্তকে বাইবেলের এক ছত্র মাত্র স্থান পাইয়াছে; কিন্তু বেন্ স্পেন্সার্ হইতে রাশী রাশী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে কিরূপে বলি সিংহ মহাশয়ের যুক্তি পাশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক? আর দেশীয় শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিলেই শাস্ত্রসঙ্গত বিচার হয় না। যতীন্দ্রবাবু তাঁহার বিচারে প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন কি না পরে বিচার্য্য।

নিরাকারবাদের উৎপত্তি।—যতীন্দ্রবাবুর মতে "নিরাকারবাদ আধুনিক।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান যুগে নিরাকারবাদের প্রধান ও প্রথম আচার্য্য। তাঁহার বিচার গ্রন্থ সকলের সহিত পরিচয় থাকিলে যতীন্দ্র বাবু এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। নিরাকারবাদের আধুনিকত্ব অস্বীকার করিয়া রাজা বলেন "এই হিন্দুস্থানেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদূ সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহ না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপ করিয়া লোকের উপকার নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্টাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন, নব্য

আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন।” নিরাকারবাদ ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের নূতন সৃষ্টি নয়, ইহা দেশের সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই আবহমান কাল প্রচলিত ধর্ম্মের পুনরুত্থান ও সম্প্রসারণ। যাহা কাল প্রভাবে আবর্জ্জনাময় ও প্রভাবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই এখন ব্রাহ্মধর্ম্মে সংস্কৃত আকারে পুনরুত্থিত। রামমোহন রায় তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারে সর্ব্বদাই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী ও “আচার্য্য মতাবলম্বী”। ‘গোস্বামীর সঙ্গে বিচার’ গ্রন্থে দেখা যায় রাজা বলিতেছেন “আর আমাদের প্রতি আচার্য্য-মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য হয়, সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।” রামমোহন রায়ের সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে আচার্য্য-মতাবলম্বী বলিতেছেন আর তিনিও তাহা স্বীকার করিতেছেন। তবে তাঁহার প্রচারিত নিরাকার মতকে যতীন্দ্রবাবুর পক্ষে অশাস্ত্রীয় বলিতে যাওয়া নিতান্ত গা জুরি নয় কি?

নির্গুণ ও সগুণতত্ত্ব।—সমালোচক বলেন “নির্গুণ উপসনার অর্থ ব্রহ্মে নাম রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ না করিয়া কেবল উপাসকের চিত্তবৃত্তি নিরোধদ্বারা আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া। সগুণোপাসনার অর্থ ব্রহ্মে নাম রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি আরোপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তৎপ্রতি চিত্তবৃত্তি সমর্পণদ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া।” তবেই হইতেছে অনারোপিত নাম গুণ ঐশ্বর্য্যাদি যিনি তিনিই নির্গুণ, আর আরোপিত রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদি যিনি তিনিই সগুণ। বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। নির্গুণ উপাসনা ও সগুণোপাসানা বুঝিবার আগে সগুণ নির্গুণ কি বুঝা চাই। নহিলে নির্গুণের জ্ঞান সম্ভব কি না, নির্গুণের উপাসনা হইতে পারে কি না, জড়জগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ একান্ত সাকার বা সগুণ কি না, এ সব কথা বুঝা যাইবে না। গুণ কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। সত্ত্বগুণ জ্ঞানপ্রকাশাত্মক, রজোগুণ রাগাত্মক বা সঙ্গাত্মক, তমোগুণ বন্ধনাত্মক বা অপ্রকাশাত্মক। জগতে সকলই অপ্রকাশিত, প্রকাশোদ্যত ও প্রকাশিত, এই তিন অবস্থার অধীন। গাছের গোলাপটী কিছু চিরকাল ফুটিয়া নাই, এক সময়ে কুঁড়ি ছিল, তার আগে আবার কারণাবস্থায়

থাকিয়া অপ্রকট ছিল। প্রস্ফুটিত গোলাপে সত্ত্ব গুণের, স্ফোটনোন্মুখ কলিকায় রজোগুণের ও কারণাবস্থ অপ্রকট গোলাপে তমোগুণের প্রভাব লক্ষিত হয়। ব্রহ্মের ঈদৃশ কারণাবস্থা সম্ভবে না। তিনি নিত্য, শাশ্বত ও অবিকারী। ব্রহ্ম কখনও প্রকাশোদ্যত ছিলেন, পরে প্রকাশিত হইয়াছেন, এমন নহে। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। এক তিনিই প্রকাশিত, আর এই সকল তাঁহারই অনুপ্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের কার্য্য নাই। এই হেতু তিনি ত্রিগুণাতীত বা নিগুর্ণ। আর ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্ত্বা যখন নাই, তখন এই সকল গুণ তাঁহাকে ছাড়িয়া নয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ। সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। এই সকল গুণকার্য্য তাহা হইতে, সুতরাং তিনি সগুণ। তিনি স্বরূপ লক্ষণে নিগুর্ণ, তটস্থ লক্ষণে সগুণ। কিন্তু নির্গুর্ণেরই প্রাধান্য; কারণ, শক্তি অপেক্ষা সত্তার সর্ব্বথা প্রাধান্য। আর শাস্ত্রে নিগুর্ণ শ্রুতিরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। সত্তা দেশাকালাতীত বলিয়া নির্ব্বিশেষ, আর শক্তি দেশকালে প্রকাশিত বলিয়া বিশেষে পরিণত। সবিশেষ নির্ব্বিশেষকে ছাড়িয়া কখন জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। অদ্বৈত ও বিশিষ্টকে লইয়া আমাদের জ্ঞান। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন সূত্রে যেমন মণিহার আমাতে তেমনি জগৎ। মণিহারকে জানিতে গিয়া আমরা যেমন শুধু মনি জানি না, সেইরূপ জগৎকে জানিতে গিয়া শুধু জগৎ জানি না, জগদতীতকেও জানি। সগুণকে জানিতে গিয়া আমরা নিগুর্ণকেও জানি। যতীন্দ্র বাবু বলেন নিগুর্ণকে জানাও যায় না, তাঁহার উপাসনাও হয় না। উপাসনা হয় কি না পারে বিবেচ্য। আগে জানা যায় কি না দেখা যাউক। সিংহমহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ম্যানসেলকে মুরুব্বি ধরিয়া বলিতেছেন এই দেখ ইঁহারা কি বলেন। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—"মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নিগুর্ণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুর্ণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদের সে শক্তি নাই।" তাহাই কি? বঙ্কিমবাবু কি বলিতে চাহেন নির্ব্বিশেষকে ছাড়িয়া বিশেষের জ্ঞান সম্ভব? বিষয়কে জানিতে গিয়া আমরা কি আমাদিগকে বিষয়ের জ্ঞাতা ও আশ্রয়রূপে জানিতেছি না? জ্ঞানের বিষয় বহু এবং পরি-

বর্ত্তনশীল, আত্মা এক, সাক্ষী ও অপরিবর্ত্তনীয়। পরিবর্ত্তনপ্রবাহ স্বীকার করিলে আত্মার সাক্ষিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মা শুধু যে দেশ-কালান্তর্গত বিষয়ের অতীত, তাহা নহে। এক অর্থে ইহা বিষয়-বিষয়ি-গত যে ভেদ, যাহাকে স্বগত ভেদ বলা যায়, তাহারো অতীত। যে নিজেকে বিষয়রূপে ও বিষয়ের বিষয়ীরূপে প্রকাশিত বলিয়া জানে, সে শুধু বিষয়জ্ঞানে অথবা বিষয়জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, সে বিষয়-বিষয়ি সম্বন্ধের অতীত। যদি তাহাই হয়, তবে মনুষ্যের এমন চিত্তবৃত্তি নাই যে নির্গুণকে জানিতে পারে, এই কথা বল কেন? নগেন্দ্রবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "নিরাকার ভিন্ন সাকারের সত্তা বৃথা। নিরাকার-ভিত্তিমূলে সাকার প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরাকারদ্বারা সাকারকে জানি।"

যতীন্দ্রবাবু বলেন সে কি? ম্যানসেলের কথায় বলিতেছেন, "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge, and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us.

ইহার সার মর্ম্ম এই—ঈশ্বরের বাস্তব সত্তা আমরা জানিতে পারি না। যাহা জানি সেটা তাঁহার প্রাতিভাষিক সত্তা। মানুষের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান হইবার পক্ষে যে গুলি অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান তদ্বহির্ভূত হইতে পারে না। মানুষ যাহা জানে, দেশকালে জানে। জ্ঞান হইবার পক্ষে দেশকাল condition বা অপরিহার্য্য হেতু রূপে প্রয়োজনীয়। দেখা যাউক দেশ বা কি এবং কালই বা কি। দেশ এখানও ওখানের সম্বন্ধ বই আর কি? ঘটনা হয় এখানে প্রকাশিত, না হয় ওখানে প্রকাশিত। এখান ওখান সম্বন্ধকে আমরা দেশ বলি। এই সম্বন্ধের নির্ণায়ক—এই সংযোগকর্ত্তা কে? যে দূরে এবং অন্তিকে আছে সেই। যে এখানে ও ওখানে থাকিয়া এখান ওখানের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, সে এখান ওখানের অতীত অর্থাৎ দেশাতীত নয় কি? কাল সম্বন্ধেও তাহাই। এখনও তখনের সম্বন্ধের নাম কাল। যে এখনকে তখনের সঙ্গে ও তখনকে এখনের সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতেছে, সে উভয়ত্র, এখন এবং তখন কিছু হইতেই বিচ্ছিন্ন নহে, কাজেই এখন তখনের অতীত বা কালের অতীত। আত্মা দেশ কালের অতীত বলিয়াই

দেশ কালের জ্ঞাতা ও রচয়িতা। দেশকালাধীন হইলে আত্মার সাক্ষিত্বই চলিয়া যায়। আর সাক্ষিত্ব না থাকিলে তাহা আত্মা নহে, অনাত্মা। যে দিকেই যাও, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণকে অতিক্রম করিবার যো নাই। যতীন্দ্র-বাবু বাধা দিয়া বলিতেছেন, "সাকারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু উড়াইয়া দেওয়া তত সহজ নয়। যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জড় জগতের সত্তা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নয় বলেন তাঁহারাই আবার জ্ঞানের ক্রিয়াতে জড় জগতের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। এমন কি অধ্যাপক (Bain) বেন্ আমাদের সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান বাহ্যিক জগৎ হইতে ভূয়াদর্শনদ্বারা উৎপন্ন বলিয়া মানেন"। যতীন্দ্রবাবু দেখ্ছি Categorical—এ বিষয় দ্বিধা রাখেন না। এক বেন্ সাহেবের দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দিলেন "যে সকল দার্শ-নিকগণ জড় জগতের সত্তা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে বলেন, তাঁহারাই আবার জ্ঞানের ক্রিয়াতে জড় জগতের আবশ্যতা স্বীকার করেন।" যতীন্দ্রবাবু যেমন বিজ্ঞ তেমনি ধীর। কিন্তু সমালোচনার বত্রিশ সিংহাসন এমনই জিনিষ যে ইহাতে আরূঢ় হইলে সমালোচকোচিত সর্ব্বজ্ঞাতার ভান হইতে উদ্ধার পাইবার যো নাই। তবে অত বড় কথাটা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলা ভাল হয় নাই। বেন্, ম্যান্সেল্, স্পেন্সার্, ইহারাই তাঁহার বিশেষ পরিচিত; Intuitional Schoolএরও কতক অবগত আছেন, কিন্তু সেটা পরের মুখে শুনিয়া। এতদ্ভিন্ন Transcendental School বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহার কোন খবর রাখেন বলিয়া মনে হয় না। রাখিয়া থাকিলে তাহার পরিচয় তাহার পুস্তকে পাইতাম। তাই মনে হয় তাহার পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞান একটু out of date —সেকেলে সেকেলে। আজকাল দর্শনক্ষেত্রে নবকান্তীয় (Neo-Kantian) বা নব-হেগলীয় (Neo-Hegelian) মত যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কোন বিচারে তাহার অনুল্লেখ দেখিলে এরূপ মনে হইবারই কথা।

তবে যতীন্দ্রবাবু উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী, রাজকার্য্য ব্যাপৃত। এদিকে আবার স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ। নহিলে কি বলিতেন "পৌত্তলিকতা অপবাদ আমাদের অঙ্গের ভূষণ হউক।" তাঁহার পুস্তক পড়িয়া তাঁহাকে ভক্তিপ্রবণ বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে আবার সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে। রাজকার্য্য করিয়া যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, হয়ত সাধন ভজনেতে কাটিয়া যায়। সাধন ভজনে

উন্নতি করিতে যাইয়া দর্শনশাস্ত্রে মনোনিবেশ করিবার সময় হইয়া উঠে নাই। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সময় যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গিয়াছে। মেধাবী বলিয়া এখনো তাহা কার্য্যোপযোগী রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বিচারক্ষেত্রে কেন? উত্তর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তিনি ধর্ম্মের গ্লানিতে ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন ও পিপাসু ব্যক্তির তথ্যনিরূপণের সাহায্যে প্রবৃত্ত। নিমজ্জ্যমান ব্যক্তিকে দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে শক্তি সামর্থ্যের কথা তখন আর ভাবিবার অবকাশ থাকে না।

যাহা হউক আমরা তাঁহার বিচারসূত্র ধরিয়া চলি। যতীন্দ্রবাবু বলেন "তিনি (বেন্) প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান sensation (ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি) ও muscular feeling (শারীরিক অনুভূতি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" Sensation, muscular feeling, এ সব ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র, এ সকলের নিত্যত্ব কিছুই নাই। এই অনিত্য ক্ষণিকবিজ্ঞান গড়িয়া পিটিয়া যদি আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ হয় তবে সে জ্ঞান ত নিত্য নয়। আর নিত্য কিছুই যদি আমরা জানিতে না পারি তবে কোথায় থাকেন তাঁহার ব্রহ্ম যাঁহাকে সাকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যতীন্দ্রবাবু এত বদ্ধপরিকর? Sensationalism বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের কুলার বাতাসে যদি সা উড়িয়া যান, তবে প্রতিমা গড়িবেন কাহার? ভক্তিপন্থী পুরুষোত্তমযাত্রীর পক্ষে বেন্ সাহেবকে পাণ্ডা মনোনয়ন বড় নিরাপদ নয়। জগন্নাথ দর্শন না ঘটাইয়া পাছে জগৎ অনাথ দেখাইয়া দেন এই ভয়। কিন্তু সিংহ মহাশয় অকুতোভয়। বেনের মত ব্রহ্মবাদের অনুকূল হউক আর নাই হউক, "তাঁহার মতে আমাদের জ্ঞান, সাকার হউক আর নিরাকার হউক, এই সাকার জড়জগৎ ও সাকার শরীর ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না।" সুতরাং ভাবিয়াছেন "জ্ঞান যদি নিরাকার হয়, তবে তাহা নিশ্চয় সাকার জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত।" বলি,—জড়জগৎ ও জড়শরীর কি নিরবলম্ব সত্ত্বা না জ্ঞানাধীন সত্তা। যদি ইহাদিগকে জানিতে গিয়া জ্ঞানে ধৃত ও জ্ঞানাশ্রিত বলিয়াই জানি, তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে ভূয়োদর্শনদ্বারা বাহ্যিক জগৎ হইতে উৎপন্ন বলা নিতান্তই অসার ও অসঙ্গত। আর অসঙ্গত হইলে সাকার জগৎ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা না হইয়া জ্ঞানই জগতের প্রতিষ্ঠা হইয়া দাঁড়ায়।

যতীন্দ্র বাবু Empirical মতের পক্ষপাতী হইলেও Intuitional মতের প্রতি নিতান্ত বাম নহেন। তিনি বেনের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন "অন্য সম্প্রদায় (Intuitional School) বলেন আমাদের সকল জ্ঞানই সাকার জড় জগৎ হইতে উৎপন্ন, কেবল কয়েকটী সাধারণ ভাব আমাদের সহজাত। তাহা এই:—দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ ভাব, গণিতের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা, পাপ পুণ্যের ভাব, ঈশ্বর ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ভাব।" সিংহ মহাশয় বলেন হিন্দুরাও Intuitional School এর এই মত স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ ইঁহারা আত্মার পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন।

পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন বলিয়া এমতে আপত্তি করিতে পারেন না, ইহার তাৎপর্য্য কি এই নয়, যে সহজ জ্ঞান সকল পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার মাত্র। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত হইলেও জ্ঞান জন্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল, intuitional, সহজ বা মৌলিক রহিল না। intuitional মতের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেখিয়া আমরা অবাক্। কাজির নিকটে হিন্দুর পর্ব্বের ব্যবস্থা লওয়াও যাহা, জন্যজ্ঞানবাদী বেনের নিকটে সহজ জ্ঞান মতের ব্যাখ্যা শুনাও তাহাই। যতীন্দ্র বাবুর পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। সাকারবাদ সমর্থনার্থ এটী বড়ই unholy alliance, বড়ই অমঙ্গলকর সন্ধি, সন্দেহ নাই।

যতীন্দ্রবাবু বলেন জগৎ বাদ দিয়া আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। "ব্রহ্মকে যে 'সত্যং জ্ঞানমন্তম্' বলা হয়, তাহাও এই জগতের উপর নির্ভর করিয়া। এই জড় জগৎ হইতে তাঁহার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রকাশ হয়। জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্যম্, জগৎ অজ্ঞান অর্থাৎ মায়াময়, তিনি জ্ঞানম্, জগৎ সান্ত, ক্ষুদ্র, তিনি অনন্তম্; সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' আমাদের এই জ্ঞান ও জগৎমূলক, সাকার জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত।" জগতের জ্ঞান একান্ত সাকার নয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অজ্ঞান ও সান্ত জগতের জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না যদি তাহার আশ্রয়রূপী জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান না থাকেন। তাহা হইলে কি সাকার জগতের জ্ঞান সত্যংজ্ঞানমনন্তম্ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? এখন জগৎ স্থূল বা জড়ই হউক,

আর সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিকই হউক, তাহা কখনই নিরাকারকে ছাড়িয়া নয়। তাহার জ্ঞান কখনও একান্ত সাকার নয়। আমাদের জগতের জ্ঞান যদি একান্ত সাকার হইত তাহা হইলে আমরা "জড় জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন" যে ব্রহ্মের সত্যংজ্ঞানমনন্তং রূপ, তাহা জানিতে পারিতাম না। সাকারে যে আবদ্ধ, সে কি নিরাকারের ত্রিসীমায় পৌঁছাইতে পারে? যতীন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়াছেন, জড় জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" রূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহা সাকার জগদবলম্বনে। যদি বল আমাদের জ্ঞান শুধু সাকার, তবে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে নিরাকারের জ্ঞান তাহা লাভ সম্ভব নয়। সাকার ভিন্ন অন্য কিছু জানিতে পারি না বলিয়া, আমাদের নিরাকার জ্ঞানের অবলম্বন জগৎ বলা কি অসঙ্গতি-দুষ্ট নয়? বিচারক মহাশয় সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে বড় দৃষ্টি রাখেন না। নহিলে কি একবার ব্রহ্মের জড় জগৎ হইতে ভিন্ন "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" রূপের কথা বলিয়া আবার বলিতেন "ব্রহ্মে যেমন আকারাদি নাই, তেমনই জ্ঞানও নাই। কারণ সকলেই জানেন আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা একটি আপেক্ষিক দ্বৈতভাব, relative idea। জ্ঞান বলিলেই তাহার সঙ্গে অজ্ঞান আসে। আমাদের অজ্ঞান আছে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান আছে। অজ্ঞান না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে জ্ঞান অজ্ঞান সকলই রাখিয়া যাইতে হয়।" সিংহ মহাশয় বলেন জ্ঞান বলিলেই অজ্ঞান আসে, ব্রহ্মে যখন অজ্ঞান নাই, তখন জ্ঞানও নাই। আমাদের ব্যক্তিগত সসীম জীবনে জ্ঞানের প্রকাশক্রম অজ্ঞান হইতে উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নতি। ইহা দেখিয়া যতীন্দ্র বাবু ভাবিয়াছেন জ্ঞান জিনিষটাই একটা আপেক্ষিক দ্বৈতভাব বা relative idea, জ্ঞানের মূল প্রকৃতি বুঝি তাহাই। তাহা ত নয়। বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধইত জ্ঞান। বিষয়শূন্য বিষয়ী, বিষয়ি-শূন্য বিষয় কল্পিত বস্তু। বিষয়ী বিষয় রাখিয়া দিতে পারে না, বিষয়ও কখন বিষয়ী ছাড়িয়া তিষ্টিতে পারে না। মূল জ্ঞানে, নিত্য জ্ঞানে, দেশ কালাতীত জ্ঞানে অজ্ঞানতা বা জ্ঞানশূন্যতা সম্ভবই হইতে পারে না। যতীন্দ্র বাবু বলেন শুধু আমি কি বলি, দেখ শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি

তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃনুয়াত্তৎ কেন কংমন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ?"

আরোও বলেন, শুধু শ্রুতি নয়, "এই শ্রুতি বাক্য অনুবাদ করিয়া পঞ্চদশীকার বলিতেছেন—

ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি ন॥

স্বষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান বর্জ্জন হেতু কেবল ভূমা মাত্র বিদ্যমান থাকেন। প্রলয়েও সেই ত্রিপুটী থাকে না।" যতীন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "স্থতরাং ব্রহ্মস্বরূপে জ্ঞান নাই। যেমন আকারও নাই, তেমনই জ্ঞানও নাই। যেখানে আকার (জগৎ) সেই খানেই জ্ঞান। আকার ও জ্ঞানের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু যে ঈশ্বর (অর্থাৎ) জগৎসংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম তাঁহাতে আবার আকারও আছে।"

যতীন্দ্র বাবুর মতে ঈশ্বরে জ্ঞান আছে, ব্রহ্মে জ্ঞান নাই। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেই ত অজ্ঞান থাকিবে, কেননা যতীন্দ্র বাবু বলেন জ্ঞান একটী relative idea বা এক আপেক্ষিক দ্বৈতভাব। স্থতরাং ঈশ্বরেও অজ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু যতীন্দ্র বাবু নিজে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেও কি অজ্ঞান আছে? যদি না থাকে তবে ব্রহ্মেও অজ্ঞান না থাকিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে। আর শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই, যে অবস্থাতে দ্বৈতভাব থাকে সেই অবস্থায় একে অন্যকে দেখে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে আস্বাদন করে, একে অন্যকে অভিবাদন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে জানে। যে অবস্থাতে তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) এই জ্ঞান হয় যে, 'আত্মাই সর্ব্বরূপী হইয়াছেন', সেই অবস্থাতে তিনি কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবেন, কাহার দ্বারা

কাহাকে আস্বাদন করিবেন, কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবেন; কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবেন, কাহার দ্বারা কাহাকে মনন করিবেন, কাহার দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবেন, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবেন? যাহার দ্বারা এই সমুদয় জানা যায় তাহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে?

যতীন্দ্রবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন :—

"যতক্ষণ পরমাত্মা হইতে অন্য পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকে, (অর্থাৎ যখন দ্বৈতজ্ঞান থাকে) তখন একে অন্যকে ভিন্ন বলিয়া দেখে, ভিন্ন বলিয়া ঘ্রাণ করে, ভিন্ন বলিয়া আস্বাদন করে, ভিন্ন বলিয়া বলে, ভিন্ন বলিয়া শ্রবণ করে, ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ভিন্ন বলিয়া স্পর্শ করে, ভিন্ন বলিয়া জানে। কিন্তু যখন 'সকলই পরমাত্মা' এই অদ্বৈত বোধ হয়, তখন এই সকল দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি কিছুই থাকে না, তখন কোন জ্ঞানই থাকে না, কারণ কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহার দ্বারা সকলকে জানা যায়, তাঁহাকে কি প্রকার জানিবে?

"তখন কোন জ্ঞানই থাকে না" একথা তিনি কোথায় পাইলেন? শ্রুতির তাৎপর্য্য এই, যে দ্বৈতাবস্থায় এক এবং অন্য এই ভিন্নতাবোধ থাকে, অদ্বৈত পদবীতে এই ভিন্নতাবোধ থাকে না, তখন আত্মা আপনাকে সর্ব্বরূপী বলিয়া জানে। দ্রষ্টা দৃষ্ট, শ্রোতা শ্রুত, জ্ঞাতা জ্ঞাত সকলই আত্মা, আত্মাতিরিক্ত দেখিবার, শুনিবার, জানিবার কিছুই থাকে না। তখন দেখা, শোনা, জানা থাকে না, এরূপ নয়। যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায় সবই আত্মা, যেহেতু, আত্মা সর্ব্বরূপী, এই জ্ঞান হইয়াছে। 'কাহাদ্বারা কাহাকে জানিবেন' ইত্যাদির অর্থ এই, যে ভিন্ন বস্তু থাকিলে ত একের দ্বারা অন্য জ্ঞাত হইবে, এস্থলে জ্ঞাতা জ্ঞাত দুই এক বস্তু। 'যাঁহার দ্বারা এই (বিষয়) সমুদায়কে জানা যায়, তাঁহাকে কাহাদ্বারা জানা যাইবে' ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিষয় সকল তাহাদের সাক্ষিরূপী আত্মার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, বিষয় সম্বন্ধে আত্মার ইদম্ জ্ঞান, আত্মা সম্বন্ধে আত্মার অহম্ জ্ঞান, ইদম্‌কে অহম্ দ্বারা জানা যায়, কিন্তু অহম্‌কে অহম্ বলিয়া জানিতে হয়, ইদম্‌রূপে জানা যায় না। অদ্বৈত

জ্ঞান হইলে 'ইদম্ আত্মাতিরিক্ত বস্তু' এই যে দ্বৈতজ্ঞান তাহা থাকে না। সুতরাং আত্মা তখন আপনাকে সর্ব্বরূপী বলিয়া জানে।

আপনাকে সর্ব্বরূপী বলিয়া জানাটা কি জ্ঞান নয়? অদ্বৈতাবস্থা যে জ্ঞানের অবস্থা তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিতে সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ঈশ॥ ৭॥

"যখন জ্ঞানির আত্মাই সমুদয় ভূত হয় (অর্থাৎ তাঁহার একাত্মপ্রত্যয় প্রকাশিত হয়) তখন (এরূপ) একত্বদর্শী ব্যক্তির মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না।"

যাঁহার একাত্মপ্রত্যয় হয় তাঁহাকে স্পষ্ট জ্ঞানী বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ রহিয়াছে। তবু বিচারক মহাশয়ের বিচারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে শুধু অজ্ঞান রাখিয়া যাইতে হয় তাহা নহে জ্ঞানও রাখিয়া যাইতে হয়। ইহার নাম কি শ্রুতিসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বিচার? আরও বলি, ব্রহ্ম সক্ষাৎকার হইলে যদি জ্ঞানই না থাকে, তবে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যেরা শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন কিরূপে? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ অবস্থায় অর্জ্জুনকে এত বড় গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখি, শুধু তত্ত্বজ্ঞান নহে, যুদ্ধ বিগ্রহ, শত্রু মিত্র প্রভৃতি বিশ্বসংসারের জ্ঞান রহিয়াছে। 'সকলই আত্মা', এই অদ্বৈত বোধ হইলে যদি কোন জ্ঞানই না থাকে, তবে বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বসংসারের জ্ঞান ছিল কেমন করিয়া? যতীন্দ্র বাবু বেদান্তের বেন-ভাষ্য দেখিয়া ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন কি?

যতীন্দ্রবাবুর মতে পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত শ্লোক উক্ত শ্রুতির অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ হইলে শ্রুতির যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইল তাহারই অনুকূল হইবে। প্রতিকূল হইলে শ্রুতির অনুবাদ নহে। আর স্মরণ রাখিতে হইবে পঞ্চদশীর স্থান উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা এই প্রস্থানত্রয় ও শাঙ্কর ভাষ্যের অনেক নিম্নে। এ সকলের বিরুদ্ধ মত পঞ্চদশী উপস্থিত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্য চতুর্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন :—

"কর্ম্মাপেক্ষায়াস্তু ব্রহ্মণ ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপন্নাঃ। কিং পুনস্তৎ

কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। যৎ প্রসাদাদ্ধি যোগিনাম প্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ কিমু বক্তব্যং তস্য-নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিবিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি।

সৃষ্টির পুর্ব্বে জ্ঞানের কর্ম্ম অর্থাৎ বিষয় না থাকাতে ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞাতা হইলেন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে শঙ্কর বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। তারপর বলিতেছেন, "পক্ষান্তরে জ্ঞানের জন্য যদি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়িণী শ্রুতিসমূহ কাজে কাজেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম কি যাহা সৃষ্টির পুর্ব্বে ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয় হয়? আমরা বলি, সেই কর্ম্ম নাম ও রূপ যাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে একও বলা যায় না, ভিন্নও বলা যায় না, এবং যাহা ব্যক্ত হয় নাই, অথচ ব্যক্ত হইতে উন্মুখ। যাঁহার প্রসাদে যোগিদের পর্য্যন্ত অতীত ও অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া যোগশাস্ত্রবিদেরা বলেন, সেই নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বরের যে সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার বিষয়ক নিত্য জ্ঞান আছে, এই বিষয় কি আর বলিতে হইবে?"

অব্যক্ত কিন্তু ব্যক্ত হইতে উন্মুখ, এমন যে নাম রূপ তাহাই সৃষ্টির পুর্ব্বে ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। পঞ্চদশীকারের ভূমা ব্যক্তের সহিত জ্ঞাতৃত্বাদি সম্বন্ধ রহিত, এই অর্থে তিনি ত্রিপুটীবর্জ্জিত। অব্যক্ত কিন্তু ব্যক্ত হইতে উন্মুখ যে নামরূপ, তাহার কোন জ্ঞান ব্রহ্মে নাই—ইহা পঞ্চদশীকারের অভিপ্রায় হইতে পারে না। যদি হয়, তবে তাহা ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ের স্পষ্ট প্রতিকূল বলিয়া শ্রদ্ধার বিষয় হইবে না। শঙ্কর বলেন "নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের যে সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার বিষয়ক নিত্যজ্ঞান আছে, এই বিষয় কি আর বলিতে হইবে?" যতীন্দ্র-বাবু বলেন, ব্রহ্মে কোন জ্ঞান নাই। বেদ পড়িয়া বেদের বিচার করিতে যাইলে এরূপ বিচার-বিভ্রাট না ঘটিয়া যায় কি? যতীন্দ্রবাবু পাছে ভাবেন ঈশ্বর অর্থে এখানে জগৎসংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে, সেই জন্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই যে এখানে "সৃষ্টির পুর্ব্বে ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞাতা হইলেন" এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বর কথা পরব্রহ্ম অর্থেই এখানে ব্যবহৃত। ভাষ্যকারের সঙ্গে একমত হইয়া আমরা বলি "ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-

বিষয়িণী শ্রুতিসমূহ কাজে কাজেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ শ্বেত ৩ অঃ, ৪ শ্লো।

যিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তি হেতু, যে বিশ্বাধিপ সর্ব্বজ্ঞ প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন্।

এ শ্রুতিতে রুদ্র বা ব্রহ্মকে মহর্ষি অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে অজ্ঞান রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞান রাখিয়া যাইতে হইবে বলিলে শুনিব কেন?

শ্রুতি আরো বলিতেছেন:—

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেত, ৬।১৫

(সেই পরমাত্মা) এই ভুবনের মধ্যে হংস (অর্থাৎ অবিদ্যাদি বন্ধন-কারণের বিনাশক), তিনি সলিলে (অর্থাৎ সলিলবৎ শুদ্ধান্তঃকরণে) সন্নিবিষ্ট অগ্নি (অর্থাৎ অবিদ্যাদাহক)। তাঁহাকে জানিয়া (সাধক) মৃত্যুকে অতি-ক্রম করেন; অমৃতত্ব প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

জানা বই আর মুক্তির উপায় নাই, অথচ যতীন্দ্র বাবু বলেন জ্ঞান রাখিয়া যাইতে হইবে। ইহা যে শুধু যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা নহে, শ্রুতিরও বিরুদ্ধ। আর নির্গুণ ব্রহ্মকে যদি জানা যায়, তবে নির্গুণ উপাস্য হইবেন না কেন? যতীন্দ্র বাবু বলেন, দেখ শ্রুতি বলিতেছেন,—

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

"চক্ষুদ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় যাঁহা হইতে নিজ দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি উপাস্য নহেন। যাঁহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাহা হইতে নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি উপাস্য নহেন।" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুত্যংশ উদ্ধৃত করিয়া আরোও বলিতেছেন,—"মনের অগোচর যাহা, বুদ্ধির অগম্য যাহা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, ভাষা যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে অসমর্থ, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি কিরূপে ধ্যান ধারণা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের প্রয়োগ হইতে পারে?" প্রথমোক্ত শ্রুতির অর্থ স্বকপোল-কল্পিত নয়, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যর অভিপ্রেত, ইহা প্রদর্শনার্থ তিনি নিম্নলিখিত ভাষ্য উদ্ধার করিয়াছেন:—

নেদং ব্রহ্ম যদিদমিত্যুপাধিভেদবিশিষ্টমনাত্মেশ্বরাদ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি।

আর তাহার অর্থ করিয়াছেন "লোকে যে উপাধিভেদবিশিষ্ট আত্মা ভিন্ন পদার্থ—যেমন ঈশ্বরাদি—উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।" শাঙ্কর ভাষ্য বলিতেছে লোক কর্ত্তৃক উপাসিত উপাদিভেদবিশিষ্ট অনাত্মা ঈশ্বরাদি ব্রহ্ম নহে। সিংহ মহাশয় বলেন এই propositionকে convert করিলে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন। কখনই নয়। উক্ত propositionকে convert করিলে পাওয়া যায় ব্রহ্ম লোক কর্ত্তৃক উপাসিত উপাধিভেদ বিশিষ্ট অনাত্মা ঈশ্বরাদি নহেন। সুতরাং যতীন্দ্রবাবুর পক্ষে "নেদং যদিদমুপাসতে" বাক্যের অর্থ 'ব্রহ্ম উপাস্য নহেন' বলা ভ্রমাত্মক হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই শ্রুত্যংশ মাত্র উদ্ধৃত না করিয়া অবশিষ্ট "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্নবিভেতি কদাচনেতি" এই টুকুও উদ্ধৃত করিলে প্রকৃতার্থ-নির্ণয় পক্ষে সাহায্য হইত না কি? শ্রুতির অর্থ—'যিনি বাক্য মনের অগোচর তাঁহার আনন্দকে জানিলে অভয় লাভ করা যায়'। বাক্য মনের অগোচরটুকু যতীন্দ্রবাবুর মনের মত হইয়াছে, তাই সে টুকুমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর তাহাই বা বলি কেন, তিনি এমন অনেক শ্রুতি নিজে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মকে জানা যায়। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শ্রুতি এক বলে, তিনি আর শুনেন। কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছেন "নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়, মানুষ যখন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব-প্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখানেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আবার সেই খানেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যায়।" এই কথাই অন্যত্র একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। "আমাদের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তবে কি মানুষ কখন ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না? পারে বৈ কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা যখন যোগিগণ নির্ব্বিশেষ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তখন তাঁহাদের সেই ব্রহ্মের সহিত অতি অল্পই পার্থক্য থাকে"। যদি নির্গুণকে জানিবার উপযোগী মানুষের কোন চিত্তবৃত্তি না থাকে, তবে আবার মানুষ তাঁহাকে জানে বলিতেছেন কেন? যদ্দ্বারা জানে, তাহাকে চিত্তবৃত্তি বল, আত্মবৃত্তি বল, বা আত্মাই বল, নামে কিছু আসে যায় না। না বলিয়া হাঁ বল কেন? ফল কথা, শ্রুতি যতীন্দ্রবাবুকে হাঁ বলিতে বাধ্য করিতেছে। শ্রুতিকে রাখিতে গেলে বেন ছাড়িতে হয়, আর বেনকে রাখিতে গেলে শ্রুতি ছাড়িতে হয়। এই উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া সিংহ মহাশয় এক মধ্যপথ উদ্ভাবন করিয়া ভাবিয়াছেন, বুঝি শ্যাম ও কুল উভয়ই বজায় রহিল। কিন্তু কই, বজায় তো থাকে না। 'নির্গুণকে যখন জানে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়' বলিয়াই বলিতেছেন "তখন তাঁহার (ব্রহ্মের) সহিত অল্পই পার্থক্য থাকে"। এ কিরূপ কথা! যতীন্দ্র বাবু এক নিশ্বাসে "পার্থক্য থাকে না ও পার্থক্য থাকে" এ দুই বলিতেছেন। মানুষ যদি মানুষ রহিল না, ব্রহ্মই হইয়া গেল, তবে তাহাতে ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই। আবার অল্পমাত্রও পার্থক্য আছে বল কেন? আর যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পার্থক্য থাকে, তবেই মানুষ যত কেন দেবত্ব লাভ করুক না, সে তাহার মনুষ্যত্ব হারায় না। যতীন্দ্রবাবু বলিবেন "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতির কি কোন অর্থ নাই?

আছে বৈ কি। ইহার অর্থ নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রের সাহায্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে :—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।" ইহার ভাব এই, যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিকার্য্য বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিশক্তি না পাইয়া মুক্তাত্মাগণ কেবল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। জগদ্ব্যাপারে কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই অধিকার, এ বিষয়ে জীবের অধিকার নাই। কেননা, জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

তাই বলি, ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ জীবের জীবত্ব বিনাশ নয়। জীব আপনাকে ব্রহ্মীভূত দেখিয়া কৃতার্থ হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখিতে পায়। জীবের ইহা বিনাশ নয়। কিন্তু ব্রাহ্মী স্থিতি। পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের অনু-গামী হইয়া শ্রুতি-সঙ্গত অর্থ করা আবশ্যক, নতুবা শুধু শ্রুতি উদ্ধার করি-লেই চলিবে না। নিরাকারবাদ শ্রুতি-সঙ্গত বলিতে যতীন্দ্রবাবু নিতান্ত নারাজ। তাই বলিতেছেন "নিরাকারবাদী বলেন তাঁহার প্রচারিত নিরা-কার ব্রহ্মবাদ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করি-য়াছেন, তিনিও নাকি তাহাই প্রচার করেন। শ্রুতি যে ব্রহ্মোপাসনার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিও নাকি সেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে শ্রুতি-প্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা তিনি একবারও ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখেন নাই। শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান, উভ-য়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।" শ্রুতির অসঙ্গত অর্থ করিয়া যতীন্দ্র বাবু ভাবিয়াছেন, হাতে আকাশ পাইলাম, আর নিরাকারবাদের সংক্ষিপ্তসার (অবশ্য তাঁহার মতে) পাঠ করিয়া আশা করিয়াছেন, পাতালপুরীর যাহা কিছু সম্বল সকলই দেখা হইল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আকাশ পাতাল দুইই কল্পিত, ও উভয়ের প্রভেদ নিতান্তই তাঁহার মনগড়া। তিনি আরও বলেন "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়।" যতীন্দ্র বাবু ব্রহ্মের প্রতিমা গড়িতে যেমন মজবুৎ, মানুষকে ব্রহ্ম করিতেও তেমনি আগুয়ান্। বৈষ্ণবেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণ "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"। আমাদের যতীন্দ্র বাবুও শ্রুতি ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হন না। সঙ্গত অর্থেই হউক,

আর অসঙ্গত অর্থেই হউক, শ্রুতি উদ্ধার করিতেই হইবে। তাই তিনি "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" এই শ্রুত্যংশের উদ্ধার করিয়া তাহার নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন,— "ব্রহ্মকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে সকলই জানা যায়।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যান। তিনি একদেশদর্শী নহেন, উহা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "এস্থলে একটা আপত্তি হইতে পারে, যে অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা হইতেছে সিদ্ধাবস্থা। এতদ্ভিন্ন একটী সাধনাবস্থা আছে। তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপযোগী নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, কিন্তু তখন মানুষ ব্রহ্ম হইতে অনেক তফাৎ থাকে, যে সকল শ্রুতিতে মানুষ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ বা অমৃতত্ব লাভ করে, এরূপ বলা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধাবস্থা লক্ষ্য করিয়া। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো' ও 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' প্রভৃতি শ্রুতিতে সাধনাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের সাধন ও নিরাকার উপাসনা শ্রুতি-বিরুদ্ধ না হইয়া বরং শ্রুতি-প্রতিপাদিত হইল।" যতীন্দ্র বাবু মনে করেন "ইহার উত্তর কঠিন নহে। শ্রুতি সাধনার যে অবস্থাতে কিম্বা যেরূপ অধিকারে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সিদ্ধাবস্থা হইতে বড় তফাৎ নহে। তদুত্তর হইল কি? বড় তফাৎ না হউক, কিঞ্চিন্মাত্র তফাৎ ত বটে। তাহা হইলে সে অবস্থা সিদ্ধাবস্থা নহে, সাধনাবস্থা, সাধক তখন ব্রহ্ম হইয়া যায় নাই, মানবই রহিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা নির্গুণকে জানিতে পারি না, নির্গুণের উপাসনা সম্ভব নয়, নির্গুণকে জানিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, এই সকল কথা অতি অসার বাক্যজাল বই আর কি? সাধনাবস্থায় যখন মানুষ নির্গুণকে জানিতে পারে ও উপাসনা করিতে পারে স্বীকৃত হইল, তখন "নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়" বলিয়া উপহাস কর কেন? পঞ্চদশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া সিংহ মহাশয় বলিতেছেন "নির্গুণ উপাসনা অতি উচ্চ অধিকারের কথা, তাহা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নির্গুণ উপাসনা পরিপক্ক হইলে সবিকল্প সমাধি লাভ হয় ও তৎপরে অনায়াসে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করা যায়।"

যতই কেন উচ্চ হউক না, তাহা উচ্চ সাধকের অধিকার। তবেই হইল, যে ব্রহ্মে লীন হইবার পূর্ব্বেও মানুষ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী।

শাস্ত্রমূলক যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হইল, যে সিদ্ধাবস্থার পূর্ব্বেও মানুষ নির্গুণকে জানিতে পারে, ও উপাসনা করিতে পারে। উপাসনার ক্রম কি? সগুণ উপাসনার স্থান কোথায়? সগুণ উপাসনাই কি সাকার উপাসনা? এই প্রকার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়া যতীন্দ্র বাবুর মতের সমালোচনা শেষ করা আবশ্যক। ক্রমে সেই সকল বিষয়ে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥"

"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি" ॥

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা বিদ্যা; পক্ষান্তরে যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্রকর্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়,—এই বলিয়া ঋষি যখন যাগযজ্ঞরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিপক্ষে সমর ঘোষণা করিলেন, তখন ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। কিন্তু ঋষি যে কেবল কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, অমৃতের যাত্রিগণের সম্মুখে বর্ত্তিকাহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥
"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥"

যিনি সমুদয় ভূতের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই প্রাণ স্বরূপ; তাঁহাকে যিনি জানেন সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হয়েন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হয়েন; ইনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

যে জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ আত্মা, শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন; ইনি সত্য, তপস্যা, সম্যগ্ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য।

কিন্তু এই উচ্চ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের জন্য দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না। তখন হোমগন্ধে দশদিক পরিপূরিত, সোমরসে ধরা প্লাবিত, পশুরক্তে মেদিনী কলঙ্কিত, সুতরাং দেশ তখন এই অধ্যাত্ম-যোগের কথা বুঝিতে পারিল না। এই শ্রৌত বেদান্তধর্ম্ম অরণ্যে উদ্ভূত হইয়া অরণ্যেই পরিপুষ্ট ও সাধিত হইতে লাগিল। কেবল বীজ সারবান্ হইলেই তাহাতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, যে জমিতে তাহা উপ্ত হইবে সেই জমির ঐ বীজ পোষণ ও রক্ষণোপযোগী শক্তি থাকা প্রয়োজন, নতুবা তাহাতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না। বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত যে আর কোনও প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাই যখন লোকে বুঝিত না, তখন "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" প্রভৃতি কথা যে তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অবোধ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই জমি প্রস্তুত করিবার জন্য সিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া রাজপুত্র গৃহত্যাগী হইলেন। শাক্যসিংহ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়াঃ" ঋষির এই অস্ফুট স্বর বজ্রনিনাদে ভারতাকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। এই প্রতিঘাতে যে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, তাহাতে যজ্ঞাগ্নি চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ধর্ম্ম আর বাহিরের ব্যাপার রহিলেন

না। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্ম্ম স্বাধীন আধ্যাত্মিক ভূমিতে রোপিত হইলেন। অন্তরের দিকে লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শম দমাদি সাধন-সম্পদ্ লাভে যত্নশীল হইল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মজীবনে যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত খুলিয়া দিলেন, তাহা সার্দ্ধ সহস্র বৎসর প্রবাহিত হইয়া ভারতক্ষেত্রকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতার ভূমিতে উত্তোলন করিল। সময় বুঝিয়া ব্রহ্মজ্ঞানহস্তে শঙ্করাচার্য্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আবার এক প্রবল আলোড়নে ভারতভূমি আলোড়িত হইয়া পড়িল। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। ভারতক্ষেত্রে "একমেবাদ্বিতীয়"মের বিজয়-নিশান প্রোথিত হইল। সূর্য্য আকাশমার্গে যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করেন, ততই যেমন পাদপচ্ছায়া খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতরাকার ধারণ করে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবে নাস্তিকতাও তেমনই ক্ষীণবীর্য্য হইয়া অন্তর্হিত হইল। বেদান্তধর্ম্ম দেশময় বিস্তারিত হইল বটে, কিন্তু উহা সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। শাক্যসিংহ সন্ন্যাসের উপর পদভর ন্যস্ত করিয়া যে জমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শঙ্করের বেদান্ত-বৃক্ষ সেই জমিতে উপ্ত হইল বলিয়া সন্ন্যাস-প্রধান হইল, সমাজকে তেমন প্রভাবিত করিল না। ধর্ম্ম সমাজ-বিমুখ হইল। বেদান্ত-বিধানের এই অপূর্ণতা দূর করিবার জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধানের আবির্ভাব। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বেদান্ত-ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা মস্তকে বহন করিয়া প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের এই মহা সম্মিলন-ক্ষেত্রে রাজর্ষি রামমোহন আবির্ভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম-স্রোত প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিদের দ্বারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই রামমোহনের মধ্যে এক বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা এখন দেখিব, এই স্রোত ব্রাহ্মসমাজে কি গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজর্ষি রামমোহন যে ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা বোধ হয় এখন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার একেশ্বরবাদ সমর্থন ও বিরোধীদের কথার প্রত্যুত্তর সকলই বেদান্ত ও বেদান্তা-বিরোধী শাস্ত্রের উপর স্থাপিত। উপাসনা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপেই বৈদান্তিক ছিল।

রামমোহন ও তাঁহার সমসাময়িকগণ ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্ত-সভা নামেই অভিহিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে বৈদান্তিক বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের এই চিরন্তন প্রথা হইতে তিনি এক চুলও অপসৃত হন নাই। জাতীয় জীবন যে স্রোত অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে স্রোতকে বন্ধ না করিয়া, প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তিত ও ভিন্নগতি প্রদান করিয়া, জাতীয় জীবনকে লক্ষ্য স্থানে লইয়া যাইতে হইবে, ঐ স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জাতীয় জীবনের অকল্যাণ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল নামে মাত্র বৈদান্তিক ছিলেন তাহা নহে। তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীই ছিলেন, সুতরাং আপনাকে শঙ্করের অনুবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞাপন করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। শঙ্করের অনুবর্ত্তী বলিতে কেহ যেন ইহা মনে না করেন, যে রামমোহন শঙ্করের ভুলভ্রান্তি ও অপূর্ণতাতে আবদ্ধ ছিলেন। অনুবর্ত্তীদিগের কার্য্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ব্ববর্ত্তীর মতের অনুসরণ করা নহে, কিন্তু উহাকে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা। কাণ্টের অনুবর্ত্তিগণ যেমন ক্রিটিক্যাল্ ফিলসফিকে তাঁহার ব্যক্তিগত ভ্রান্তি ও অপূর্ণতা হইতে উন্মুক্ত করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর আকার প্রদান করতঃ জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন, রামমোহনও সেইরূপ শাঙ্করীয় বেদান্তভাষ্যে অদ্বৈতবাদের একটা যে ভ্রান্ত গতি ছিল,—যাহা তাঁহা অপেক্ষা অল্প প্রতিভাশালী তাঁহার অব্যবহিত অনুবর্ত্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া বেদান্ত-ধর্ম্মে অনেক ভ্রান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন,—তাহাকে সংশোধিত করিয়া বেদান্তধর্ম্মকে এক উন্নততর ও পূর্ণতর ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে গুরু হইতে শিষ্যের যে মাহাত্ম্য কম প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসের আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উক্ত ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করতঃ রামমোহন ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে এক নূতন মহাযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। বেদান্তধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাই রামমোহনের বিশেষ কার্য্য। রামমোহনেই আর্য্য ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা। যে স্রোত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতীয় জীবনে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহা বিধানে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের শেষ পরিণতি। ব্রাহ্মসমাজই আর্য্য ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক সাধন-সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী। যাহারা পৌত্তলিকতার মৃতদেহকে নানা সাজে সজ্জিত করিয়া ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান করিতেছেন, তাহারা যে মৃতদেহের পূতিগন্ধে ক্লিষ্ট হইবেন, এবং বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সে সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ বিধানের বিনাশপক্ষীয় বিশেষ কায যজ্ঞাগ্নি-নির্ব্বাপণ। গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও যজ্ঞ এদেশে আর মস্তকোত্তলন করিতে পারিল না। শাঙ্কর বা বেদান্ত বিধানের বিনাশপক্ষীয় বিশেষ কার্য্য নাস্তিকতা-দলন। জ্ঞান-সূর্য্যের প্রভায় নাস্তিকতা হীনপ্রভ হইয়া গেল। ব্রাহ্ম বিধানের বিনাশপক্ষীয় বিশেষ কায পৌত্তলিকতা-উন্মূলন, শত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তাহা বিনষ্ট হইবে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহা বিধানে বাধা জন্মাইতে পারে।

যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম—"বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্যধর্ম্ম", এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বহিরাক্রমণের প্রত্যুত্তর—"Vedantic Doctrines Vindicated"। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবতঃ বেদান্ত সম্বন্ধীয় সম্যগ্ জ্ঞানের অভাব বশতঃই উহা এই সময়ে অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। বেদান্তে ভ্রান্তি থাকিতে পারে কি না এ প্রশ্ন তখন উঠে নাই। সুতরাং অভ্রান্ততাবাদ বেদান্তানভিজ্ঞতার ফল, কোনও মীমাংসা-লব্ধ সত্য নহে। সেই জন্যই এই অভ্রান্তবাদরূপ ভ্রান্তি হইতে পরিণামে "পরিবর্জ্জন" ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। জগতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়েরই শক্তি সমান। ক্রিয়াতে যদি কোনও অপূর্ণতা থাকে, প্রতিক্রিয়ার অতিপূর্ণতা তাহাকে সংশোধন করে। ক্রিয়াতে যদি কোনও ভ্রান্তি থাকে, প্রতিক্রিয়ার ভ্রান্তি তাহাকে স্বস্থানে আনয়ন করে।

সেই জন্য 'বেদান্ত অভ্রান্ত' এই ভ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত 'বেদান্ত পরিবর্জ্জন'রূপ প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে যে বেদান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু মহর্ষি-প্রেরিত চারিজন ব্রাহ্মণ কাশী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'বেদান্ত অভ্রান্ত নহে' ইহা দেখাইয়া দিলে 'Vedantism discarded'

এই কার্য্য দ্বারা, বেদান্ত-শাস্ত্র যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহারই পথ প্রশস্ত হইল। প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা কেবল বেদান্ত-সম্বন্ধীয় ভ্রান্তিকে অপনীত করিল, বেদান্তের প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারণ করিল; অভ্রান্ততাবাদ ও পরিত্যাগ, বেদান্ত যে এই দুইয়ের মধ্যপথরূপ স্বীয় প্রকৃত স্থান প্রাপ্ত হইবেন, তাহার দ্বার উন্মুক্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদান্ত-প্রভাব তিরোহিত হইল না, হইতে পারেও না। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মহর্ষি-প্রণীত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' বেদান্তেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি এই গ্রন্থদ্বয়কে ঈশ্বরানুপ্রাণিত গ্রন্থ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপেই বেদান্ত-নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মের সঙ্গে বেদান্তের এমনই যোগ, যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদান্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না। তবে যে এই মৌখিক বিচ্ছেদ ঘটিল, তাহা প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তৎপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন *। যদিও তিনি বেদান্ত ও বৈদান্তিক ঋষিদিগের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং এ দেশীয় ব্রহ্মবাদকেই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মবাদ মনে করিতেন, তথাপি বেদান্তধর্ম্ম প্রথম জীবনে তাঁহার উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে নাই। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, সুতরাং এই প্রতিক্রিয়ার সময়ে তিনি যে বেদান্তদর্শনালোচনায় আকৃষ্ট হইবেন, সেরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এই সাধন প্রভাবেই তিনি বেদান্তধর্ম্মে উপনীত হইয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন ও বেদান্তসাধন দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কেহ বা দর্শনের দ্বারা সাধনে, কেহ বা সাধনের দ্বারা দর্শনে, উপনীত হন। অন্যের কথা বলিতে পারি না, গভীর যোগভক্তি-পরায়ণ হিন্দু সাধকের পক্ষে, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, বৈদান্তিক অদ্বৈতভাবে উপনীত না হওয়া একরূপ অসম্ভব। কেশবচন্দ্র বেদান্তের দেশে জন্মিয়াছিলেন, বেদান্ত-রক্ত তাঁহার শিরায় শিরায় বহিতেছিল, সুতরাং তিনি সাধনার দ্বারাই বেদান্তমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্রই বৈদান্তিক

* কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বেদান্তের সম্বন্ধ দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা "ব্রহ্মতত্ত্বে" "মহাত্মা কেশবচন্দ্র ও বেদান্তধর্ম্ম" প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা এখানে সংক্ষেপেই করা গেল।

ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের উক্তি ও উপদেশেই এই ভাব অতি সুস্পষ্ট। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্রহ্মানন্দ বৈদান্তিক যোগ সাধন করিয়াছিলেন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। "সেবকের নিবেদনে" "যোগী অক্ষয় ও অপার" নামক উপদেশে তিনি বলিতেছেন,—"জীবাত্মা যখন যোগ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন আর তাঁহার অন্তজ্ঞান থাকে না, তাঁহার ক্ষুদ্রতা বোধ থাকে না। তখন সে অনন্তের সঙ্গে একাত্মা হইয়া আপনাকে আপনি অনন্ত মনে করে, তাঁহার আর স্বতন্ত্রতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি থাকে না। এই অসীমতা জীবের নহে, পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে এ অসীমতা বুঝিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদী যতক্ষণ আপনার দুই দিকে তট দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ জানিতেছিল, কিন্তু যখন অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল, তখন অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে পারিল না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়; কিন্তু যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন আর আপনার ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পায় না। ক্ষুদ্র নদীর জল অসীম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অকূল ও অনন্ত মনে করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্রহ্মময় জ্ঞান করে।" ব্রহ্মানন্দের সাধন-লব্ধ ব্রহ্মৈকত্ব-লাভের এই উপদেশ, আর বৈদান্তিক ঋষির "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি",—এই অভিজ্ঞতার কেমন সৌসাদৃশ্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেশবচন্দ্র সাধনবলেই এই বেদান্তমার্গে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সাধনার ফল সমাজে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। কেশবানুপ্রাণিত নববিধান "বেদান্তে পুনরাবর্ত্তন" ঘোষণা করিলেন। কেননা Vedantism discarded" এই ব্যাপারের প্রতিষেধরূপে "Our Return to the Vedanta" এই ঘোষণা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বেদান্ত সম্বন্ধে রাজর্ষি

রামমোহনের thesis (স্থাপন) এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের antithesis (খণ্ডন) ব্রহ্মানন্দের এই মহা synthesis (সমঞ্জসীকরণ)এ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বেদান্তের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ইহাই পরিস্ফুট হইল, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি বেদান্ত হইলেও, বেদান্তে যাহা আছে আমরা তাহাতেই আবদ্ধ থাকিব না, আমরা ইহাকে পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিব। বেদান্ত-সম্বন্ধে সকল প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইল। রামমোহনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজে বেদান্ত বিষয়ে যে ভ্রম হইয়াছিল, তাহা এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-প্রভাবে সংশোধিত হইয়া গেল। ১৮৮৫ খৃঃ ৭ই জুন তারিখের Liberal পত্রে "Our Return to the Vedanta" শীর্ষক প্রবন্ধে ঘোষিত হইল:—"We need not say very much upon our return to the Vedanta. This is a known fact. The foundation of Brahmoism was laid upon the Upanishads. Although we have advanced, the foundation remains the same."

বেদান্ত-শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে খৃষ্টীয় জগতে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইতিহাসের এক অধ্যায়ের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মার্টিন লুথার নূতন ভাব-প্রবাহে যখন খৃষ্টীয় জগৎকে ভাসাইয়া দিলেন, তখন সেই প্রবাহে গুরু ও শাস্ত্র সকলই ভাসিয়া গেল। ধর্ম্ম-জগতের গুরু পোপ্ তখন Antichrist (খ্রীষ্টশত্রু), জ্ঞান-জগতের গুরু এরিস্ততল্ তখন Godless bulwark of the papists" (পোপপন্থীদের নিরীশ্বর আশ্রয়)। লুথার এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে তিনি বলিলেন,—"If Aristotle had not been of flesh, I should not hesitate to affirm him to have been truly a devil." যে এরিস্ততলের দর্শনশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগৎ এতকাল পরিপুষ্ট হইয়াছে, ও আপনার ধর্ম্মমতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ধর্ম্মোন্মত্ত সংস্কারকদিগের হস্তে তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাও মানব মনের এক স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। যখন কোনও নূতন-ধর্ম্মভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হয়, তখন তাহার পক্ষে এরূপ কাজ কিছু অস্বাভাবিক নহে। ধর্ম্ম যখন মূর্ত্তিমান্, ঈশ্বর যখন প্রত্যক্ষ, তখন ধর্ম্মসাধনে যে আবার বাহিরের শাস্ত্র বা গুরুর কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা না

বুঝিয়া ধার্ম্মিক যে কোনও গুরুতর দোষে দোষী হন তাহা নহে। কিন্তু ধর্ম্মনেতাদিগের এটা বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে ধর্ম্মের এই উজ্জ্বল ভাব, এই শুভ মুহূর্ত্ত কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সাধক এই মুহূর্ত্তে পূর্ণ হৃদয়-পাত্র লইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিতে পারেন "আল্লা কতই খাব কতই দিলি", কিন্তু এই সাময়িক উত্তেজনার বুদ্‌বুদ্‌ যখন থামিয়া যায়, তখন এই সাধককেই আবার নিরাশ অন্তরে আক্ষেপের সহিত বলিতে হয় "আল্লা দেখায়ে বঞ্চিত করিলি।" মাতরিশ্বা সদাগতি ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও যেমন সর্ব্বদাই আকাশে শোঁ শোঁ শব্দে প্রবাহিত হয়েন না, তিনি যেমন কখনও ধীর, কখনও বেগবান্‌, ধর্ম্মও তেমনি কখনও মন্থর, কখনও বা খরবেগে প্রবাহিত হন। ভগবান্‌ হৃদ্বিহারী হইলেও সর্ব্বদাই তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত থাকেন না। বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় তাঁহার যে ক্ষণিক প্রকাশ, তাহা কেবল ভক্ত-হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে, তাঁহাকে স্থায়ীভাবে লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্ম-বিদ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্মভাব কখনও পরি-পুষ্টিলাভ করিতে সক্ষম হয় না, এবং আপনাকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। প্রেমের প্রবল বন্যায় যখন শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আবার জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা আছে তাহা না বুঝিলেও, সে ক্ষেত্রে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পারিতেন জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রেম দুর্গতির কি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃই বলি-তেন, জ্ঞানকে উপেক্ষা করা কি কুকর্ম্মই হইয়াছিল।

প্রথম বা apostolic যুগে ধর্ম্মসাধনের জন্য গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্য প্রয়ো-জন না হইলেও, ধর্ম্মমতের কোন প্রকার দার্শনিক ভিত্তি না থাকিলে, ঐ যুগের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধর্ম্ম-সমাজে নানা প্রকার সন্দেহ, কুসংস্কার ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা অনিবার্য্য। সেই জন্য লুথার যাইতে না যাইতেই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অনুবর্ত্তী মেলাংটন্‌ দেখিতে পাইলেন, যে দর্শনের সাহায্য ব্যতীত সংস্কার-কার্য্য বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। ব্যক্তিগত বিবেক, ও ধর্ম্মের কেবল সাধারণ মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া Anabaptist বা

Iconoclast প্রভৃতি ধর্ম্মোন্মত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সমাজ স্থাপিত হইতে পারে না। তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন,—"We cannot do without the monuments of Aristotle. I plainly perceive that if Aristotle shall be neglected, a great confusion of doctrine will follow." এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে আমাদের "Vedantism discarded" এবং "Our Return" এই দুইটী কার্য্যের সঙ্গে এরিস্ততল্ সম্বন্ধে লুথার ও মেলাংটনের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতে "History repeats itself" এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে।

যাহা হউক, মেলাংটন যে ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি খুজিতে যাইয়া প্লেতনিক্ বা নিওপ্লেতনিক মত গ্রহণ না করিয়া এরিস্ততলকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছিল। কেন না, যাঁহার চিন্তা বহুশতাব্দী ধরিয়া মানব মনকে নিয়মিত করিতেছিল, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নব পন্থা অবলম্বনে মানবহৃদয়ে মহাবিপ্লবের সম্ভাবনা। এরূপ বিপ্লবে উৎস-বিচ্যুত নির্ঝরের ন্যায় ধর্ম্মজীবন শুকাইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য, ইতিপূর্ব্বেই লুথার যাঁহাকে সয়তান বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই গুরু-পদে বরণ করা লুথার-শিষ্যদিগের অত্যন্ত সাহসের কার্য্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কার-কার্য্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এই সাহসটুকুর অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন কেহ হয় তো বলিবেন, সত্য যাহা তাহা সত্যই, অন্যের নামের ছাপে কি তাহার কোনও মূল্য বাড়ে? সত্যের সত্যতা বাড়ুক্ আর নাই বাড়ুক্, তাহার কার্য্যকারিণী শক্তি যে বাড়ে, তাহা নিশ্চিত। সম্প্রতি এক জন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। দেখিলাম তিনি রোগীর নিকট হইতে কোনও রূপ দর্শনী গ্রহণ করেন না। কৌতূহলবশতঃ কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরোপকারী হইতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ডাক্তার, সুতরাং পরোপকারের এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। 'পরোপকার করা কর্ত্তব্য' ইহা একটী উপাদেয় সত্য, সকলেই জানেন, কিন্তু সকল ডাক্তারই কি রোগীর বাড়ী যাইয়া নিস্বার্থভাবে তাঁহার

চিকিৎসা করেন? ইনিও করিতেন না, কিন্তু এই সত্যটি পিতৃ-আজ্ঞার আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে বলিয়াই তিনি আদরের সহিত এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। উলঙ্গ সত্য প্রচারে বিশেষ ফল হইবে না। যাহার নিকট সত্য প্রচারিত হইতেছে, সত্যকে তাহারই পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে হইবে, নতুবা সে সত্যকে আপনার জিনিষ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে সত্যের সার্ব্বভৌমিকত্ব বিনাশের কোনও আশঙ্কাই নাই, কেন না সার্ব্বভৌমিক বস্তুকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলেই তাহাকে বিশেষ আকারে ধারণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। একই সার্ব্বভৌমিক বস্তু বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় বিশেষত্ব ভুলিলে সংস্কারকগণ আপনাদের উদ্দেশ্য আপনারাই বিফল করিবেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে জাতীয় ভাবের শিরা ব্যতীত কোন সত্যই সমাজ দেহে প্রবিষ্ট হইবে না। সত্য প্রচার করিলেই হইবে না, সত্যের সঙ্গে পিতৃ-আজ্ঞার যোগ হওয়া চাই। ইহাকে কুসংস্কার বলিতে পারেন, কিন্তু এরূপ সুসংস্কৃত কুসংস্কার ব্যতীত জগতে কোনও কার্য্যই হয় নাই। এই যে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা দেশের লোকের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ ব্রাহ্মসমাজ সব সময়ে কথাগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজ দেশের শ্রোত্রাকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাই অনেক কথাই শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। সত্যের সত্যতায় কার্য্যপ্রবণতা নাই, কিন্তু সত্যের প্রতি হৃদয়ের যে ভাব, তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং সত্যকে হৃদয়াকর্ষকরূপেই লোক সমক্ষে উপন্যস্ত করিতে হইবে। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রচারিত করিতে হইলে ইহাকে হিন্দুধর্ম্ম রূপেই প্রচারিত করিতে হইবে। আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই সর্ব্বোচ্চ পরিণতি। সুতরাং এরূপ প্রচার যেমন সত্য-সঙ্গত, তেমনি প্রকৃত প্রচারপ্রণালী-সম্মত। বর্ত্তমান সময়ের একটী শুভ লক্ষণ এই, যে ব্রাহ্মসমাজে বেদান্ত-স্রোত একটু খরবেগে বহিতেছে। আশা করি, ব্রাহ্মসমাজ এ স্রোতকে অগ্রাহ্য করিবেন না।

বেদান্ত-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন করেন, যে উহা

অদ্বৈতবাদাত্মক, অদ্বৈতবাদে উপাসনা সম্ভব নয়, সুতরাং উহা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না। এখন দেখা যাক্, এই আপত্তিটী কতদূর যুক্তিসিদ্ধ। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত প্রকৃত উপাসনা সম্ভব নয়, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষভাবে কেবল আমার নিজ আত্মা ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহকেই জানিতে পারি। ব্রহ্ম বিষয় নহেন, তিনি চির-বিষয়ী। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল বিষয়ের বিষয়ত্ব। তিনি 'ইদম্' নহেন, তিনি 'অহম্'। 'অহম্' জ্ঞাতা, 'ইদম্' জ্ঞেয়। জ্ঞেয় অপেক্ষা জ্ঞাতা মহত্তর, বৃহত্তর। ব্রহ্ম অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু নাই। সুতরাং তিনি জ্ঞেয় নহেন, তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতা, এবং সর্ব্বঘটে অদ্বিতীয় জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই ঋষি বলিয়াছেন,—

"স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তি বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

গীতাও ইহার প্রতিধ্বণি করিয়া বলিতেছেন ;—

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি তু ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥"

ইহা অজ্ঞেয়তাবাদের কথা নহে, ইহাতে একটী অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের, উপাসনা-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা এই তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে, যে ব্রহ্মকে "অহম্" রূপে না জানিলে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইল না। জীবব্রহ্মের এই একত্ব বোধই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানের একমাত্র অবলম্বন। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারে ব্রহ্মদর্শন মনের কল্পনা মাত্র। যাহা কিছু আমার আত্মার সহিত এক নহে, যাহা কিছু আমার বাহিরে, তাহার জ্ঞান অসন্দিগ্ধরূপেই পরোক্ষ, পরোক্ষ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ উপাসনার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, অদ্বৈততত্ত্ব ভিন্ন আর কোথাও উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

অতএব জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্বে কিরূপে উপাসনা সম্ভব হয়, এই প্রশ্ন যাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদিগের অগ্রে ভাবা উচিত, যে এই একত্ব ছাড়া উপাসনা কখন সম্ভব কি না। বিশেষতঃ দ্বৈতবাদী সাধক—যথা, জেম্‌স্

মার্টিনো—যে অনুপ্রাণনের (inspiration) কোনও ব্যাখ্যা দিতে না পারিয়া ইহাকে অতি-প্রাকৃতিক(supernatural) ঘটনা বলিয়া থাকেন,সেই অনুপ্রাণন কেবল এই মৌলিক অভেদবাদের ভূমি হইতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রাণনকারী—এই উভয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান থাকা চাই, যেখানে উভয়ে এক, নতুবা একের ভাব অন্যে সংক্রামিত হইতে পারে না। আর যদি অনুপ্রাণন পরিত্যাগ করা যায়, তবে উপাসনার উপাসনাত্বই বিলুপ্ত হয়।

বেদান্তের বিপক্ষে আর একটী আপত্তি এই, যে ইহার মুক্তি-তত্ত্ব জীবের ব্যক্তিত্বের বিলোপকারী। এ কথা ঠিক যে কোনও কোনও বৈদান্তিক সম্প্রদায় মুক্তিকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বেদান্তের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। নকলের দোষে আসল পরিত্যাগ যুক্তি-সঙ্গত নহে। এদেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, এবং সেইরূপই লোকের নিকট প্রকাশ করেন, সেই জন্য কি আমরা আসল ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিব ? "সোঽহমস্মি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয়, যে মুক্তির অবস্থাতেও বৈদান্তিকগণ সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতেন। বিশেষতঃ উপনিষদে মুক্তির অবস্থার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিয়া কখনও একথা বলা যায় না যে ঋষি ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন।

ঋষি বলিতেছেন।—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
তদা মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥'

যে সকল কামনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যদি ব্রহ্মলাভে ব্যক্তিত্বই বিনষ্ট হয়, তবে "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এই কথার সঙ্গতি থাকে না। জীবের যদি জীবত্ব যায় তবে দেহটা ব্রহ্মের হইয়া পড়ে।

'যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥'

যখন এরূপ জ্ঞান হয়, যে পরমাত্মাই সমুদায় বস্তুরূপী হইয়াছেন, তখন এইরূপে একত্বদর্শী ব্যক্তির পক্ষে মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না। যদি ব্রহ্মৈকত্ব লাভে ব্যক্তিত্ব না থাকে, তবে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ" এই বাক্যের সার্থকতা কি? দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। মুণ্ডকোপনিষদে ঋষি যেখানে বলিতেছেন "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" সেই স্থানেই বলিতেছেন "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানম্"। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তিত্বের বিনাশ বেদান্তের অভিপ্রায় নহে।

শঙ্করাচার্য্য-কৃত "বিবেক চূড়ামণি" গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে শিষ্য গুরুর উপদেশ-সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া গুরুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। যদি ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের বিনাশ হয়, তবে এই ধন্যবাদের সঙ্গতি কোথায়?

যুক্তির দিক্ হইতেও দেখা যায়, যে ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান নিত্য বস্তু, জীবের ব্রহ্মজ্ঞান কালের ঘটনা; এই দুই কখনও এক হইয়া যাইতে পারে না। "ব্রহ্মসূত্রে" স্পষ্ট রহিয়াছে যে মুক্ত পুরুষ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও সৃষ্টি-শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের বিনাশ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশক বেদান্ত-শাস্ত্রই অসম্ভব হইত। সুতরাং বেদান্তের উপর এই বিনাশবাদ আরোপ করা যুক্তি সঙ্গতও নহে, শাস্ত্রসঙ্গতও নহে।

বেদান্ত সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি এই, যে বেদান্তের ঈশ্বর impersonal (ব্যক্তিত্ববিহীন) আপত্তিকারীগণ person (ব্যক্তি) বলিতে কি বুঝেন, জানি না। কিন্তু personএ যদি জ্ঞাতৃত্ব বুঝায়, তবে বেদান্ত "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইহা দ্বারা যে কেবল তাঁহার সাধারণ জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে বিশেষ ভাবে প্রত্যেককে জানেন, তাহাও দেখাইতেছেন। বেদান্তে 'পুরুষ' শব্দ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে, এবং পুরুষ যে অপরব্রহ্ম নহেন, পরব্রহ্মই, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইহা দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে। উপনিষদের সঙ্গে যাহারা অত্যল্প পরিমাণেও পরিচিত, ইহা বুঝিতে তাহাদের একটুকুও কষ্ট হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী বাক্য ব্যয় না করিয়া, ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় দুই চারিটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।"

যখন সমুদয় প্রাণী নিদ্রিত থাকে, তখন যে পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্যবস্তু-পরম্পরা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় এক রূপকে বহু প্রকার করেন।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবান্‌দিগের চেতন, যিনি একাকী সকলের কাম্য বস্তু সমূহের বিধাতা।

"সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ,"—সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা, এবং সকলের মহৎ শরণকে (ব্রহ্মবাদিগণ কীর্ত্তন করেন)।

"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে বেদান্তের ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও গুণশূন্য নহেন, কেন না ঋষি যাঁহাকে নির্গুণ বলিতেছেন, তাঁহা-কেই আবার কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতস্থিত, সাক্ষী, চেতয়িতা, ও সত্ত্বান্তর-নিরপেক্ষ বলিতেছেন।

তিনি যে আমাদের ধর্ম্মজীবনেরও নেতা ও প্রভু, তিনি যে পাপীর ত্রাতা, আমাদের মুক্তি যে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাও বেদান্তে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

পুরুষই মহান্ প্রভু, ইনি অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক, সুনির্ম্মল পরমপদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় ও অব্যয়।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন, আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশক (বা আত্মজ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য) দেবতার শরণ লই।

আবার পাপভয় ভীত মানবাত্মা তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছে,—
"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে আমাদের বেদান্তভীতি বেদান্তানভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে আমাদের এই অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়া সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের সেই দিকে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য আসুন আমরা ঋষির সহিত সমস্বরে প্রার্থনা করি:—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

যে অদ্বিতীয় বর্ণরহিত পরমাত্মা নানা শক্তিযোগে গূঢ় অভিপ্রায়ের সহিত অনেক বিষয়ের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে সমুদায় জগৎ প্রথমে জন্মে, এবং যাঁহাতে অন্তকালে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন্।

এই প্রার্থনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে তিনি আমাদের বিবেকেরও অধিষ্ঠাতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাত্মা রামানুজকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

১১শ শ্লোক। যাহারা শোকের অবিষয়, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ "ইহাদের পিতৃপুরুষগণ লুপ্তপিণ্ডোদক হইয়া পতিত হয়েন" ইত্যাদি দেহস্বভাব এবং আত্মস্বভাব-বিষয়ক জ্ঞান-প্রসূত বাক্য বলিতেছ। এ ব্যাপারে দেহস্বভাব ও আত্মস্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কিঞ্চিৎ মাত্রও শোকের কারণ নাই। মৃত দেহ এবং অমর আত্মার জন্য এতদুভয়ের স্বরূপজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই শোক প্রকাশ করেন না। অতএব "ইহাদিগকে বিনাশ করিব না" এই বলিয়া যে তুমি অনুশোচনা করিতেছ, এবং দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বলিতেছ, ইহাতে তোমাতে একটি বিপরীত ভাব দেখিতেছি। অতএব তুমি দেহস্বভাব, সেই দেহাতিরিক্ত আত্মা, এবং তৎপ্রাপ্তির নিত্য উপায়-স্বরূপ যুদ্ধাদি ধর্ম্ম, কিছুই জান না। এই নিষ্কাম যুদ্ধ আত্মতত্ত্ব লাভের উপায় স্বরূপ। আত্মার জন্ম শরীরের জন্মাধীন নহে এবং আত্মার বিনাশ শরীরের মরণাধীন নহে; কারণ আত্মার জন্মমরণ নাই। অতএব আত্মা শোকের বিষয় নহে। আর দেহ ত অচেতন, পরিবর্ত্তনশীল, ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বাভাবিক, সুতরাং দেহ ও শোকের বিষয় নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।

১২শ শ্লোক। প্রথমতঃ আত্মস্বরূপ শ্রবণ কর। আমি সর্ব্বেশ্বর, অতএব আমি যে বর্ত্তমানের পূর্ব্বে অনাদি কালে ছিলাম না, এমত নহে; কিন্তু ছিলামই; এবং তুমি প্রভৃতি এই সকল নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞগণও যে ছিলে না এরূপ নহে; ছিলেই। আমি, তুমি প্রভৃতি আমরা সকলে যে অতঃপর অর্থাৎ ইহার পরবর্ত্তী কালে থাকিব না তাহাও নহে; থাকিবই। আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা যে নিত্য, এ বিষয়ে যেমন কোনও সন্দেহ নাই, তদ্রূপ তোমরা জীবাত্মা সকলও যে নিত্য, ইহা মনে করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হইতে আত্মা সকলের ভেদ, এবং সেই আত্মা সকলের পরস্পরগত ভেদ যে পারমার্থিক, তাহা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, ইহা প্রতীতি হইতেছে। অজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তির অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য পারমার্থিক নিত্যতা উপদেশ করিবার সময়ে যখন ভগবান্ 'আমি' 'তুমি' 'ইহারা' 'আমরা' এই সকল বাক্য ব্যবহার করিতেছেন, তখন এই ভেদ উপাধিগত ভেদ হইতে পারে না,

কারণ, আত্মভেদ অতাত্ত্বিক হইলে তত্ত্বোপদেশ সময়ে ভেদনির্দ্দেশ সঙ্গত নহে। ভগবদুক্ত আত্মভেদ যে স্বাভাবিক, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" ইহার অর্থ,—'বহু নিত্য চেতনের মধ্যে যিনি একমাত্র নিত্য চেতন, তিনিই কাম্য বস্তু সকল বিধান করেন।'

যদি বল পরম পুরুষের ভেদদৃষ্টি অজ্ঞান-কৃত, তবে তার উত্তর এই যে, পরমার্থ-দৃষ্টি হেতু, নির্ব্বিশেষ কূটস্থ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার হেতু, যখন তাঁহার অজ্ঞান এবং তৎকার্য্যের নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন অজ্ঞানকৃত ভেদদর্শন ও তন্মূলক উপদেশাদি কার্য্য তাহার পক্ষে সঙ্গত হয় না। যদি এই পক্ষ গ্রহণ কর যে পরম পুরুষও অজ্ঞ, তবে বলি, পরম পুরুষের বাক্য যখন মিথ্যার্থ, তখন অর্জ্জুন-বাক্যের সহিত তদীয় বাক্যের কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং তদীয় বাক্য উপদেশ নহে।

যদি বল অদ্বৈতজ্ঞান-সম্পন্ন পরম পুরুষের এই ভেদজ্ঞান দগ্ধ পটাদির ন্যায় প্রতিহত হইয়া বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ইহা প্রতিবন্ধক হয় না, তবে বলি ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। মরীচিকায় জলজ্ঞানাদি প্রতিহতরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও যেমন তাহা জলাহরণাদির প্রবর্ত্তক হয় না, তদ্রূপ এস্থলেও ভেদজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের দ্বারা ব্যাহত হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও তাহার অলীকতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়তা নিবন্ধন তাহা উপদেশাদির প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। আর, ইহাও বলা যাইতে পারে না, যে ঈশ্বর পূর্ব্বে অজ্ঞ ছিলেন পরে শাস্ত্রাধ্যয়নলব্ধ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাঁহার ভেদজ্ঞান ব্যাহত হইয়াছে। কেন না, তাহা এই সকল শ্রুতিস্মৃতির বিরুদ্ধ, যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ) "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" (তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবল ও ক্রিয়াবল প্রভৃতি নানা পরাশক্তি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।) "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন (হে অর্জ্জুন, আমি অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় বিষয় জানি)।" আর, প্রতিপক্ষ বলুন দেখি পরমপুরুষ ও ইদানীন্তন গুরুপরম্পরা ইঁহাদিগের অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞানের অনুবর্ত্তমানে ইঁহারা স্ব স্ব নির্ণয়ানুরূপ অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান কাহাকে উপদেশ করেন।

যদি বল, যে প্রতিবিম্ববৎ প্রতীয়মান অর্জ্জুনাদির প্রতি উপদেশ প্রদান করেন, তবে বলি ইহাও সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না এতাদৃশ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কেহ নাই যে মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে বিভিন্ন বোধে কোনও বিষয় উপদেশ দিবে। ভেদজ্ঞান বাধিত হইলেও অনুবর্ত্তন করে,—এই কথাও প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন না, যেহেতু ভেদজ্ঞানের বাধক অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানদ্বারা আত্মাতিরিক্ত ভেদজ্ঞানের কারণ স্বরূপ অজ্ঞানাদি বিনষ্ট হয়। দ্বিচন্দ্র জ্ঞানাদি স্থলে দ্বিচন্দ্র জ্ঞানের হেতু যথার্থ তিমিরাদি দোষ চন্দ্রের একত্ব জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে বাধিতানুবৃত্তি হইয়াছে, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদি অনুবর্ত্তমান থাকিলেও প্রবল প্রমাণদ্বারা বাধিত হওয়াতে তাহা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এস্থলে ভেদজ্ঞান স্বীয় বিষয় ও কারণসহ অযথার্থ বলিয়া, বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানদ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং বাধিতানুবৃত্তি কোনরূপেই সম্ভব নহে, অতএব সর্ব্বেশ্বর এবং ইদানীন্তন গুরুপরম্পরার তত্ত্বজ্ঞান আছে বলিলে তাহাদের পক্ষে ভেদদর্শন ও তজ্জনিত উপদেশাদি অসম্ভব হয়। আর, ভেদদর্শন আছে বলিলে তৎকারণ অজ্ঞানও আছে বলিতে হয়, সুতরাং অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের উপদেশাদি অসম্ভব হয়। আর, গুরু আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া জানিলেই যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞান কার্য্যসহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন শিষ্যের প্রতি উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। যদি বল গুরু ও তাঁহার জ্ঞান কল্পিত, তবে তার উত্তর এই যে সেই যুক্তি অনুসারে শিষ্য এবং তাহার জ্ঞানও যখন কল্পিত, তখন এই যুক্তিতেও ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইতেছে না।

যদি বল, শিষ্য এবং তাহার জ্ঞান কল্পিত হইলেও পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত ইহার বিবোধ থাকা প্রযুক্ত ইহাতে ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইতেছে, তবে বলি আচার্য্যের জ্ঞান সম্বন্ধেও যখন এই একই কথা, তখন তাহাতেও ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, সুতরাং উপদেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। অতএব এমত অসমীচীন নিরন্তবাক্য বলার কি প্রয়োজন ?

১৩শ শ্লোক। আত্মা স্থায়ী, ইহা জানিয়া দেহী যেমন এক দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া কৌমার অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে

আত্মার বিনাশ হইয়াছে মনে করিয়া শোক করেন না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতেও আত্মাকে স্থায়ী জানিয়া তাহার জন্য শোকাভিভূত হন না। অতএব আত্মা সকল নিত্য বলিয়া তাহারা শোকের বিষয়ীভূত নয়। এস্থলে এই মাত্র কর্ত্তব্য :নিত্য :—আত্মারাই যখন অনাদি কর্ম্মাধীন, তখন সেই সেই কর্ম্মানুরূপ দেহাশ্রিত আত্মারা বন্ধন নিবৃত্তির জন্য সেই সেই দেহ দ্বারা শাস্ত্রবিহিত স্ববর্ণোচিত নিষ্কাম যুদ্ধাদি কর্ম্ম করুক্। যখন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অবর্জ্জনীয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগে শীতোষ্ণাদিপ্রযুক্ত সুখদুঃখসমূহ উৎপন্ন হয়, তখন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই সকল সহ্য করা উচিত, এই বিষয় পরে কথিত হইতেছে।

১৪শ শ্লোক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইহারা আশ্রয়ভাগী, এবং তন্মাত্র অর্থাৎ মূল ভূতের কার্য্য বলিয়া "মাত্রা" নামে অভিহিত। শ্রোত্রাদির সহিত ইহাদের যে সংযোগ, তাহা শীত, উষ্ণ, মৃদু, পরুষাদি সুখ দুঃখ প্রদান করে। 'শীতোষ্ণ' শব্দ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। যুদ্ধাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবে। আর, ইহারা উৎপত্তি এবং বিনাশশীল বলিয়া ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিগণের সহনযোগ্য। আরও, এই সকল বিষয় অনিত্য। বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মের বিনাশ হইলে ইহারা উৎপত্তি বিনাশশীলরূপেও থাকিবে না।

১৫শ শ্লোক। সেই সহনের আবশ্যকতা কি তাহা 'যং হি' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। যিনি ধৈর্য্যযুক্ত, এবং অবর্জ্জনীয় দুঃখকে সুখবৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অমৃতত্বের সাধনরূপে স্ববর্ণোচিত ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যুদ্ধাদিকর্ম্ম করেন, এবং যাঁহাকে সেই যুদ্ধাদির অন্তর্গত শস্ত্রপাতাদিরূপ মৃদুপরুষ স্পর্শ সমূহ ব্যথিত করিতে পারে না, তিনিই অমৃতত্ব সাধন করেন। অর্থাৎ তোমার তুল্য দুঃখাসহিষ্ণু ব্যক্তি তাহা করিতে পারে না। অতএব আত্মা নিত্য বলিয়া এই দুঃখাদিসহন কর্ত্তব্য, এই অভিপ্রায়।

১৬শ শ্লোক। 'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ' এই শ্লোক দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যে আত্মার নিত্যত্ব এবং দেহের স্বাভাবিক অনিত্যত্ব শোকের বিষয় নয়, তাহাই উপপন্ন করিবার জন্য 'নাসতঃ' ইত্যাদি শ্লোক আরব্ধ হইতেছে। অসৎ দেহের সদ্ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই, এবং সৎ আত্মার

অসদ্ভাব অর্থাৎ অসত্তা নাই। প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ জ্ঞাতব্য দেহ এবং আত্মা এতদুভয়ের অন্ত দর্শন করিয়াছেন। নির্ণয় নিরূপণের অন্ত, সুতরাং এস্থলে নির্ণয় অন্তশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অসত্ত্বই অচিৎ বস্তু দেহের স্বরূপ এবং সত্ত্বই চৈতন্যময় আত্মার স্বরূপ, এই নির্ণয় দৃষ্ট হইয়াছে। অসত্ত্ব বিনাশস্বভাব, আর সত্ত্ব অবিনাশস্বভাব। এই সম্বন্ধে ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—"তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিদ্দ্বিজ বস্তুজাতং। জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ" অর্থাৎ—

"অতএব হে দ্বিজ, বিজ্ঞান ব্যতীত বস্তু কোথাও কখনও কিছুই নাই। জ্ঞান যেমন সত্য, অন্য বস্তু তেমনি অসত্য।")

("অনাশীপরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে। তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতং॥ যত্তু কালান্তরেণাঽপি নান্য সংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসংভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিং"। অর্থাৎ—"পণ্ডিতেরা অবিনাশী এবং পরমার্থ বস্তুকে স্বীকার করেন। যাহা নশ্বর দ্রব্য তাহাই নশ্বর, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা কাল পরিবর্ত্তনেও নামান্তর প্রাপ্ত হয় না, হে রাজন্! পরিণামাদি-সম্ভূত সেই বস্তুই কি তাই?" এস্থলেও উক্ত হইতেছে "অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ" "অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি।" তাহাই সত্ত্বাসত্ত্ব কথনের হেতু বলিয়া বোধ হইতেছে। এস্থলে অসৎ কার্য্যবাদ অসঙ্গত বলিয়া, এই শ্লোক তদ্বিষয়ের অনুকূল নহে। [কারণই সৎ, কার্য্য অসৎ, ইহার নাম অসৎকার্য্যবাদ যে দেহ-স্বভাব এবং আত্ম-স্বভাব বিষয়ে অজ্ঞান-বিমোহিত, তাহার মোহ অপগমের জন্যই দেহ এবং আত্মার নশ্বর স্বভাব ও অবিনশ্বর স্বভাব বিষয়ক জ্ঞান বক্তব্য। তাহাই "গতাসূনগতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি" এই বলিয়া আরব্ধ হইয়াছে, এবং তাহাই "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি," "অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ" ইত্যাদির দ্বারা পরে সমর্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত অর্থ।

১৭শ শ্লোক। আত্মার অবিনাশিত্ব কি প্রকারে উপপন্ন হয় তাহাই 'অবিনাশী' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। যে আত্মতত্ত্বরূপ চেতনদ্বারা তদতিরিক্ত সকল অচেতন ব্যাপ্ত, সেই আত্মতত্ত্বকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। ব্যাপক বলিয়া আত্মা নিরতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং অবিনাশী, অতএব তদতিরিক্ত অন্য কোনও পদার্থ ইহার বিনাশ সাধনে অসমর্থ; কারণ সেই বস্তু আত্মা হইতে স্থূল বলিয়া উহা আত্মাদ্বারা ব্যাপ্য। শস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নাশক নাশ্য বস্তুকে ব্যাপিয়া শিথিল করে। মুদ্গর প্রভৃতিও বেগবৎ সংযোগদ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা বস্তু নাশ করে। অতএব আত্মতত্ত্ব অবিনাশী।

ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

তৃতীয় ভাগ। ব্রহ্মতত্ত্ব চতুর্থ সংখ্যা।

সাকারবাদের অদ্ভূত সমর্থন।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ, মহাশয় সাকারবাদ সমর্থনার্থ "সাকার ও নিরাকার-তত্ত্ববিচার" নামধেয় একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কোন কোন পাশ্চাত্য দর্শন ও হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব নহে। তিনি এই দুই স্তম্ভের উপর স্বীয় সাকার-দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানির সবিশেষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু এই স্তম্ভ-দ্বয় কিরূপ ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এই সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া নিরাকারবাদ সম্বন্ধীয় আপত্তি খণ্ডনে যত্নশীল হইব।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী-চরিত্রে তিনটী বিশেষ দোষ বা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, "না প'ড়ে পণ্ডিত"; দ্বিতীয়, কথায় কথায় বিলাত-আপিল; তৃতীয়, স্থানে অস্থানে শাস্ত্রের দোহাই, সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে শ্লোকোত্তলন (তাহা বুঝি আর নাই বুঝি) এবং সেই শ্লোকের স্বীয় মতানুযায়ী ব্যাখ্যা-প্রদান। আমাদের সমালোচনাস্থানীয় পুস্তক খানিতে এই তিনটী লক্ষণই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

১। "না প'ড়ে পণ্ডিত" কথাটীর অর্থ এই যে, যে বিষয়ে কিছুই জানি না, যে বিষয়ের কোন সংবাদই রাখি না, সে বিষয়ে এমন ভাবে কথা বলা, যাহাতে লোকে মনে করিবে, যে আমি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমাদের গ্রন্থকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ

পাঠ করিয়া ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না, যে তিনি কোনও রূপে ব্রাহ্ম সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। তিনি যে দুই খানা পুস্তক সমালোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সমালোচনা শেষ করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" ও "সাকার ও নিরাকার উপাসনা।" এই দুই খানি গ্রন্থে সাধারণ ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এগুলিতে গৌণভাবে বর্ত্তমান। যিনি এই দুই খানির সমালোচনা করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরসন রূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়াছেন, তিনি যে উক্ত মহাভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার কার্য্য পর্ব্বতের মূষিক-প্রসববৎ উপহাসাস্পদ। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি সকল উদ্ধৃত করতঃ তাহার সমালোচনা এবং ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার সে কার্য্য যে পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি পদে পদে ব্রাহ্ম সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরসন করা চাই। যে সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সেই সম্বন্ধে মত দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। কেন না তাহা না হইলে 'unbiased opinion' * হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি আধুনিক ধর্ম্ম বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ যে ইহাকে চিরকালই প্রাচীন মহর্ষিগণ প্রচারিত সনাতন ধর্ম্মরূপেই লোক সমক্ষে উপন্যস্ত করিয়া আসিতেছেন, সে খবর তিনি রাখেন না। রাজর্ষি রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আধুনিক ধর্ম্ম নহে, তিনি যে কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন না, তাহা প্রতিপক্ষদিগকে বুঝাইতে যাইয়া যে সকল যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া আধুনিক ধর্ম্ম বলিয়া লোক চক্ষুর সমক্ষে ইহাকে হেয় করিতে চেষ্টা করা লেখকের পক্ষে অতিশয় পক্ষপাতদুষ্টকার্য্য হইয়াছে।

---

* কার্লাইলের মৃত্যুর সময়ে একখানি এদেশীয় ইংরেজের সম্পাদিত সাময়িক পত্রে লিখিত হয়—"আমরা কার্লাইল বা রাস্কিন্ কাহারও গ্রন্থ পড়ি নাই। কিন্তু আমাদের নিরপেক্ষ মত ('unbiased opinion') এই যে দুজনের লেখার মধ্যে রাস্কিনের লেখাই উৎকৃষ্ট।" কোন বই পড়িলেই তৎসম্বন্ধীয় মত biased হইয়া যায়!!

গ্রন্থকার যে রামমোহন রায়ের উক্তির সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণেও পরিচিত, তাহার নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থে নাই। অথচ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে 'না প'ড়ে পণ্ডিত'। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রচারে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, ব্রাহ্ম সাহিত্য, বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের উক্তিগুলি পাঠে যদি তাহার শতাংশ পরিশ্রমও করিতেন, তবে তাঁহাকে আজ সাকারবাদ সমর্থনরূপ উৎকট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁহারা আসল বস্তুটীর সমালোচনা না করিয়া তাহার একটী নকলের সমালোচনায় অজ্ঞ লোকদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া থাকেন। সমালোচক জানেন তাঁহার শক্তি কতটুকু। সেই শক্তি-অনুযায়ী সমালোচনাস্থানীয় বস্তুটীকে গড়েন, এবং তৎপর তাহাকে ভাঙ্গেন। অজ্ঞ লোকে মনে করে যে আসল বস্তুটীরই বুঝি বিনাশ হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আসল বস্তুটীর উপর ঐ শক্তি প্রযুজ্য নহে বলিয়াই এই নকলাভিনয়। তাহাতে আসল বস্তুর গায়ে আঁচড়ও লাগে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে সময়ে সময়ে এরূপ অভিনয় সহ্য করিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। তবে অভিনয় স্বেচ্ছাকৃত কি না পাঠকবর্গ গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া বিচার করিবেন। গ্রন্থকারের যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিত, তিনি যদি ব্রাহ্ম সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হইতেন, (সমালোচনার পূর্ব্বে যেরূপ পরিচয় তাঁহার অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল) তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেরই মীমাংসা তথায় লাভ করিতে পারিতেন। তিনি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপদোচিত কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। তিনি না প'ড়ে পণ্ডিত বলিয়াই তাঁহার এই ক্রটী হইয়াছে।

এখন সিংহ মহাশয় হয়তো বলিবেন যে আধুনিক দার্শনিক ব্রাহ্ম সাহিত্য সমালোচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তবে তাঁহার সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নাই। কেন না বাবু হীরালাল হালদার-প্রণীত "Two Essays" এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রণীত "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ও "ব্রহ্মতত্ত্বে" যে অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহার খণ্ডন বা উল্লেখ না করিয়া আধুনিক ব্রহ্মবাদের সমালোচনা শেষ করা সমালোচকোচিত হয় নাই। সিংহ মহাশয়

সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেন নাই, তিনি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক অর্থে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

২। আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালী-চরিত্রের দ্বিতীয় লক্ষণ—কথায় কথায় বিলাত-আপিল। এই লক্ষণটীও আমাদের লক্ষ্যস্থানীয় গ্রন্থখানিতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কেন না, ইহাতে একাধিক ইংরেজ পণ্ডিতের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে গ্রন্থকার সবিশেষ পরিচিত কি না তাহা পরে বিবেচ্য। তাহার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে আমি একটী কথা বলিব। বর্ত্তমান সময়ে অথবা কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বঙ্গ সাহিত্যে এক শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের নামে সময়ে অসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে পুনরুত্থান-কারী বলা হয়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিতে আমি ঋষি-প্রচারিত বেদান্ত-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় বুঝি। এই শ্রেণীর লেখকগণ অবশ্য শিক্ষিত। এই শিক্ষিত-দিগের মধ্যে বেদান্তধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ, তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে অশি-ক্ষিত অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে ইহার অবস্থা কি, তাহা নিরূপণ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি বাল্যকাল হইতেই যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতি অতি আগ্রহের সহিত শুনিয়া আসিতেছি। এই গুলির ভিতর দিয়াই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই সকলের মধ্যে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়াছি; এখন বুঝিতেছি যে তাহা সাংখ্য ও বেদান্তের কথা। আচার্য্য শঙ্করের প্রসাদে এদেশে বেদান্তের বহুল প্রচার হইয়াছিল, অজ্ঞ লোকের মধ্যেও তাহার প্রভাব লক্ষিত হয়। তাই বলিয়া তাহা যে জাতীয় জীবনের অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আর দশটা বাক্যগত জন-শ্রুতির ন্যায় এই সব কথাও লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে, জাতীয় জীবনের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পায় নাই, কার্য্যকরী হইবার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। জাতীয় জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু জীর্ণ হয় নাই। সম্প্রতি এক দিন পাঁচালী শুনিতে গিয়াছিলাম। প্রথম গানটী শুনিয়া বুঝিলাম, যে প্রকৃতিই সর্ব্বেসর্ব্বা, পুরুষের স্থান অতি নিম্নে। মনে করিলাম সংগীতকার সাংখ্য-বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন। হরি হরি! পরের সংগীতেই দেখি-

লাম, প্রকৃতি মায়াবাণে বিদ্ধ হইয়া আকাশে উড়িলেন, তিনি মায়া, স্বপ্ন, মিথ্যা। পুরুষই সব। এই স্থানেই শেষ নহে। একই গানের প্রথম পদ হয় তো বেদান্ত, দ্বিতীয় পদই সাংখ্য। আমাদের দেশে এই সকল উচ্চ উচ্চ কথার একটা "বদ্ হজ্‌মি" ঘটিয়াছে *। এক প্রকার অজীর্ণ রোগ আছে, যাহাতে কোনও কোনও বস্তু অনেক কাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই পাকস্থলীতে অবস্থিতি করে। বেদান্তও আমাদের জাতীয় জীবনে সেই অবস্থাতেই স্থিতি করিতেছে। এক প্রকার চিকিৎসা আছে, যাহাতে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা এই অপরিপক্ব বস্তু পাকস্থলী হইতে উঠাইয়া ফেলা হয়। ইহা হাতুড়ে বৈদ্যের কাজ। কেহ কেহ পৌত্তলিকতার বিষবড়ি প্রয়োগে উদ্বমনের দ্বারা এই প্রাচীন বেদান্ত বিধানকে তুলিয়া ফেলিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহাদিগকে হাতুড়ে বৈদ্য-শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সুচিকিৎসক, যাহাতে ভক্ষিত দ্রব্য জীর্ণ হইয়া দেহের রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জায় পরিণত হয় সে জন্য "হজ্‌মি গুলির" ব্যবস্থা করেন। বেদান্তকে পরিপাক পাওয়াইতে হইলে সেইরূপ হজমিগুলির প্রয়োজন। সেরূপ ব্যবস্থা কি কিছু হইয়াছে? ভয় নাই, হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই 'হজ্‌মিগুলি।' রাজর্ষি রামমোহন বৈদ্যনাথের নিকট হইতে প্রাচীন বেদান্ত বিধানের পূর্ণতা এই ব্রাহ্ম বিধানরূপ পরিপাকের বড়ি লইয়া বর্ত্তমান যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা পৌত্তলিকতার বিষবড়ি প্রয়োগে জাতীয় জীবন বিনাশের আয়োজন করিতেছেন, তাঁহারা সুবিবেচনার কাজ করিতেছেন না। তাঁহারা যে বিফল-মনোরথ হইবেন, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। শাক্যসিংহের পরে শঙ্করের আবির্ভাব যেমন স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছিল, শঙ্করের পরে রামমোহনের আবির্ভাব তেমনই স্বাভাবিক। একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী অসম্পূর্ণ। ব্রাহ্ম বিধানেই বৌদ্ধ ও শাঙ্কর

---

* কেহ যেন এ কথা মনে না করেন, যে সাধারণ পাঁচালীকারগণ এক একটী রামমোহন বা বিজ্ঞানভিক্ষু। যেন তাহারা সাংখ্য-বেদান্তের একটা সমন্বয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা যে সাংখ্য-বেদান্তের কথা বলে, তাহার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই, কোনও organic unity নাই। বড় বড় কথা শুনতে ভাল, তাই বলে।

বিধানের পূর্ণতা। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেই এ দেশে বেদান্তের অজীর্ণতা ঘুচিবে, প্রাচীন মহর্ষিদিগের সাধনার সার্থকতা হইবে।

এখন কেহ হয় তো আপত্তি করিতে পারেন, যে, আমি শাঙ্কর অর্থাৎ বেদান্ত বিধানের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্ম বিধানকে উপন্যস্ত করিয়া অন্যান্য বিধান সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছি, সুতরাং একদেশ-দর্শিতা দোষ দুষ্ট হইয়াছি। আমি যাহা বিশ্বাস করি তাহাই বলিয়াছি। আমি ভারতের ঐতিহাসিক যুগে যে তিনটী স্থায়ী মহাবিধান স্বীকার করি, তাহা বৌদ্ধ, বেদান্ত ও ব্রাহ্ম। আর যে সকল সাময়িক বিধান আবির্ভূত হইয়াছে তাহারা কেবল এই সকলের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে, তাহারা স্থায়ী বিধান নহে। যিশুর পক্ষে অভিষেককারী যোহনের যে কাজ, উক্ত বিধানত্রয়ের পক্ষেও ক্ষুদ্র বিধানগুলির সেই কাজ। যে ভূমিতে এই তিন বিধান-বৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে ইহারা সেই ভূমিতে সার দিয়া গিয়াছে *।

অশিক্ষিতদিগের মধ্যে বেদান্তের অবস্থা কি তাহা আমরা দেখিলাম। শিক্ষিতদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব কিরূপ তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাক্।

সিংহ মহাশয় তাঁহার 'তত্ত্ব বিচারে' ম্যান্‌সেল্ সাহেবকে প্রথম ওকালত-নামা দিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরসন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge, and therefore we can not represent the Deity as he is, but as he appears to us."

আমি যখন প্রথম ম্যান্‌সেল্ পাঠ করি, তখন আমার মনে হইয়াছিল, যে সাহেব যদি আমাদের দেশে এরূপ যুক্তির অবতারণা করিতেন তবে বেদান্তের ভূমিতে দাঁড়াইয়া এক কথায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিতাম। আমার মনে হইয়াছিল "আত্মজ্ঞানেই ব্রহ্মজ্ঞান" জীবব্রহ্মের এই মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক বৈদান্তিক অধ্যাত্মবাদই তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রতিবাদ। ম্যান্‌সেল্ যে conditionএর কথা বলিতেছেন

* "ব্রহ্মতত্ত্ব," তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় "ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাহা এ স্থানে খাটিতেছে না। আমাদের আত্মজ্ঞান কোনও conditionএর ভিতর দিয়া হয় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলেই যে তিনি conditioned হইয়া পড়িবেন, এ আশঙ্কার কোনও ভিত্তি নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সিংহ মহাশয় এই যুক্তিকেই অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িয়াছে। যুক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উহা চিন্তাবিভ্রমের ফল। যাহা হউক, আমরা বেদান্তের ভূমি হইতে তাঁহার সহিত বিবাদ করিব না। আমরা দেখি, সিংহ মহাশয়ের বিলাত আপিল কতটা সাময়িক হইয়াছে। তিনি খবরই রাখেন না, যে বহুকাল হইতে তাঁহার উকীল মহাশয় ওকালতি হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন, তাঁহার আপিলের পূর্ব্বেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া গিয়াছে। ম্যান্‌সেলের জীবদ্দশাতেই সুপ্রসিদ্ধ জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল ম্যান্‌সেলের ভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহারই যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করতঃ এই যুক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের যদি কিছু বিশেষ পরিচয় থাকিত, তবে তিনি এই প্রাচীন কথা লইয়া এত মাথা বকাইতে প্রবৃত্ত হইতেন না। সাকার নিরাকার সকলই আমরা conditionএর ভিতর দিয়া জানি; সেই জন্য, নিরাকার যদি অজ্ঞেয় হয় তবে সাকার আরও অজ্ঞেয়, কেন না সাকারকে জানার conditions আরও বেশী। বস্তু নিজে যে কি তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধেও জানি না, জড় সম্বন্ধেও জানি না, অসীম সম্বন্ধেও জানি না, সসীম সম্বন্ধেও জানি না। আমাদের নিকট যাহা যে ভাবে প্রকাশ পায় তাহা সেই ভাবেই জানি। সুতরাং ঈশ্বর আমাদের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হন আমরা তাঁহাকে সেই ভাবেই জানি। সাকার সম্বন্ধেও সেই কথা। ম্যান্‌সেল্‌ মিলের এই কথার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। ইহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। ইহা লইয়া পুনরান্দোলন অত্যন্ত অসাময়িক হইয়াছে। মিলের যুগও অতীত হইয়া দর্শন জগতে নবতর যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, সিংহ মহাশয় অবশ্য সে সব খবর লইবার সময় পান নাই। বিলাত-আপিল করার পূর্ব্বে এ বিষয়ে একটু খবর লইলে ভাল হইত। আশা করি তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে এ সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিবেন, এবং তিনি সে আশা আমাদিগকে দিয়াছেন।

নতুবা তাঁহার তত্ত্ব-বিচারের তথ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া আমাদিগকে প্রতি-পদেই অর্দ্ধ শতাব্দী পশ্চাবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হইতেছে। অশিক্ষিত গ্রাম্য-লোকে প্রতিবাসীর সঙ্গে বিবাদ করিয়া "দোহাই কোম্পানী বাহাদুর" বলিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মবাদ নিরসনের জন্ম ম্যান্‌সেলের দোহাইও আমার নিকট সেইরূপ বলিয়া মনে হইতেছে। এখন যদি কেহ এদেশে মোকদ্দমা হারিয়া 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টারে'র নিকট আপিল করে, তবে তাহার কার্য্যটী যেরূপ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরূদ্ধে ম্যান্‌সেলের নিকট আপিলও সেই শ্রেণীর কার্য্য হইয়াছে।

সিংহ মহাশয় ম্যান্‌সেলের অনুবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, ঈশ্বর নিজে যে কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি আমাদের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত হন আমরা তাঁহাকে সেই ভাবেই জানি। কথা এই, তিনি নিজে যাহা ঠিক সেই ভাবেই যে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন না তাহার প্রমাণ কি? যাঁহারা বলেন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" তাঁহাদের কাছে ঐ condition-বাদ খাটিবে না! আমরা ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোনও condition-এর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মজ্ঞান হয় না। সুতরাং আমাদের আত্মায় চিন্ময় ব্রহ্মের-স্বরূপ প্রকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যাঁহারা বস্তুসত্তা (being) ও বস্তুজ্ঞান (knowledge) এই দুয়ের একত্বে বিশ্বাসী, তাহাদের নিকট এই conditionবাদের কোনও মূল্যই নাই। বস্তু এবং জ্ঞানে তাহার প্রকাশ, এ দুই একই। বঙ্কিমচন্দ্রের দোহাই দিয়া সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, "মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি।" তৎপরেই বলিতেছেন, "পাশ্চাত্য দর্শনেরও সিদ্ধান্ত এই, Pure Being অথবা Noumenal side of God আমাদের ধারণা হইতে পারে না"। নির্গুণ-সগুনের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। Noumena and Phenomena, নির্গুণ ও সগুণ, ইহারা একই বস্তুর দুই দিক্, নির্গুণকে ছাড়িয়া সগুণ, সগুণকে ছাড়িয়া নির্গুণের কোনও অর্থই নাই। একটীকে জানিতে হইলেই অপরটিকে জানিতে হইবে। একটী হইতে অপরটিকে ছিন্ন করা যায় না। তুমি যখন বল ইহা Phenomenon, Noumenon নয়, তখন তুমি নিশ্চয়ই জান

Noumenon কি, নতুবা 'ইহা Phenomenon' এই জ্ঞান তোমার অসম্ভব। Phenomenonএর জ্ঞানের সঙ্গে Noumenonএর জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন এক পাতের দুই পৃষ্ঠা, এক হইতে অপরকে ছিন্ন করিবার সাধ্য নাই। এই দুই আপেক্ষিক সত্তাজ্ঞানের একটীর পরিপুষ্টি সম্পূর্ণরূপে অপরটীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান উচ্চতর পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞান ঘৃণাক্ষরেও যদি সিংহ মহাশয়ের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিত, তবে এ কথার অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইত না। নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য দর্শনের ঘাড়ে নিঃসংশয়ে ইহার বিপরীত ভাব আরোপ করিতে সাহস করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং আপনাদের মতকে অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান পাণ্ডা স্পেন্সারের মতালোচনার সময় আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। সিংহ মহাশয় সগুণ ও নির্গুণ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য সাগর লঙ্ঘন না করিয়া যদি একবার মনোযোগের সহিত ঘরে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে আর তাঁহাকে সগুণ নির্গুণের মধ্যে একটা একান্ত প্রভেদ আনয়ন করিয়া এত গণ্ডগোলে পতিত হইতে হইত না। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, যে সগুণ ও নির্গুণ দুই ব্যক্তি নহেন, একই মহান্ পুরুষ, যিনি বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপী। একের উপাসনা অন্যকে ছাড়িয়া হয় না। উহা একই উপাসনার দুই দিক্। সিংহ মহাশয় একবার গীতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখুন্ সেখানে সগুণ ও নির্গুণকে কেমন একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ শুনুন্,—

ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫॥

ব্রহ্মের যে চিন্ময়ী শক্তি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই নির্গুণ প্রকৃতি হইতে যাঁহারা এই বিশ্বকে ছিন্ন করিয়া লইয়া ইহার বিষয় চিন্তা করিতে চাহেন, তাঁহারা যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সগুণ প্রকৃতি স্বীয় অস্তিত্বের জন্য যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছ তাঁহাকে

চিন্তা না করিয়া এই প্রকৃতির চিন্তা ও ধারণা অসম্ভব। তাই তাঁহাকে জানিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন :—

"প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।"

সিংহ মহাশয় বিলাতী গুরুর নিকট "তাঁহাকে জানিবার আমাদের কোনও চিত্তবৃত্তি নাই" এই যে ভ্রান্ত সংস্কার লইয়া আসিয়াছেন, জানিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন যে ভগবান্ তাঁহার ডাক শুনিয়া সে সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন কি? না ভগবান্ কেবল আক্ষেপই করিবেন, যে—

ত্রিভিগু'ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭ ১৩॥

সত্ত্ব-রজঃ-তমগুণসংমূঢ় ব্যক্তিরা যে তাঁহার দিকে তাকায় না সেই জন্য ভগবান্ আক্ষেপ করিতেছেন। সগুণ সগুণ বলিয়া যাঁহারা এক গণ্ডগোল তুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা এ কথাটা একবার তলাইয়া দেখিবেন কি?

নিগু'ণকে ছাড়িয়া সগুণে লোকের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিবার জন্য সিংহ মহাশয় বলিতেছেন, যে ঈশ্বরের "সগুণ প্রকাশমান্ অবস্থাই চিন্তনীয়, সুতরাং উপাস্য।" আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নিগু'ণকে ছাড়িয়া সগুণ অসম্ভব, নিগু'ণই সগুণকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এখন দেখা যাক্ "সগুণ প্রকাশমান্ অবস্থাই উপাস্য" এই কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে। যাহা প্রকাশিত তাহা দেশ কালের অধীন। দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া কিছু প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশ ও কাল প্রকাশের অপরিহার্য্য প্রকরণ। কিন্তু এই দেশ ও কাল আত্মাধীন, আত্মার আশ্রিত। উহা যত কেন বড় হউক না, আত্মাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। আমাদের জ্ঞান প্রতিপদেই এই দেশ ও কালকে অতিক্রম করিতেছে। দেশ ও কাল যত কেন দূরে সরিয়া যাউক না, আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। ইহা বলিতে পারে না "এইখানে থাম, আর আসিও না।" ইহা বলিবার পূর্ব্বেই জ্ঞান তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের প্রকাশমান্ অবস্থা যত কেন বৃহৎ হউক না তাহা সসীম, আত্মা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাকেই যদি উপাস্যরূপে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে উপাসক অপেক্ষা উপাস্য ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন। ইহা অসম্ভব; সুতরং কেবল সগুণের

উপাসনা হয় না। কেবল সগুণোপাসনা একটা কথার কথা মাত্র, উহার কোনও অস্তিত্বই নাই। আবার কেবল নির্গুণ বলিয়াও কোন বস্তু নাই। কেবল সগুণ, কেবল নির্গুণ, এই কথাগুলি 'অশ্বডিম্বাদিবৎ' কেবল শব্দেরই অধিগম্য, ইহাদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সিংহ মহাশয় যে সগুণ ও নির্গুণোপাসনার দুইটী বিরুদ্ধ পক্ষ করিয়াছেন তাহাদের বস্তুগত কোনও সত্তা নাই। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যে (synthesis)এ যে উপাসনার উৎপত্তি, তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পথই প্রদর্শন করিতেছেন। এই সগুণ ও নির্গুণ ভাবযুক্ত যে মহান্, ভূমা, অখণ্ড ও অদ্বয় পরমাত্মা তিনিই একমাত্র উপাস্য, যিনি বলিতেছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" গীতা ১০।৪২।

যিনি একাংশে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপী পরব্রহ্মের মধ্যে এক রেখা টানিয়া তাঁহাকে খণ্ড করিলে চলিবে না। তাঁহার যে এই প্রকটরূপ, ইহার অন্তরালে সেই অপ্রকট পুরুষকে দেখিতে হইবে, নতুবা অনন্তের যাত্রী এই মানবাত্মা কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা অসীম, সে অনন্তের যাত্রী, তাহার উপাস্যও ভূমা হওয়া চাই। সুতরাং ঈশ্বরের এই সসীম প্রকাশমান্ সগুণ অবস্থা কখনও উপাস্য হইতে পারে না। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন :—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখম্॥" ছান্দোগ্য, ৭।২৩॥

এই যে সগুণ ও নির্গুণ ভাবযুক্ত উপাসনা-প্রণালী, ইহাতেই জ্ঞান ও ভক্তির মিলন। পাখী যেমন দুই খানি পক্ষযোগে আকাশে আনন্দে বিহার করে, এই দুই ভাবযুক্ত উপাসনা-প্রণালীর সাহায্যে মানবাত্মাও তেমনি ব্রহ্মাকাশে উড়িতে উড়িতে তাহার গম্য স্থানে যাইয়া উত্তীর্ণ হইবে। কল্যাণ পথে অগ্রসর হইতে হইলে উহাই একমাত্র উপায়।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

সিংহ মহাশয় সগুণ প্রকাশমান অবস্থাতেই আমাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, কিন্তু ঋষি এই প্রকাশের অতীত সেই অপ্রকাশ, যাহাকে অবলম্বন

করিয়া এই প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে তাহাকেই আত্মায় দেখিতে বলিতেছেন, নতুবা শান্তি নাই। ঋষি বলিতেছেন—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ কঠ ৫।১৩।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে সগুণ নির্গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

ম্যান্‌সেল্ ও তজ্জাতীয় পণ্ডিতদিগের মতের একটী প্রধান ভ্রান্তি এই, যে ইঁহারা মানব চিন্তার অতীত, জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত এক দেবতা কল্পনা করেন, এবং পরে মানব মন ধারণা করিতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহারা এই স্থূল কথাটা লক্ষ্য করেন না, যে যাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে চিন্তার সীমার বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করেন, তিনি যদি বস্তুতঃ তাহাই হইতেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের অবিষয় হইয়া পড়িতেন, তাঁহার সম্বন্ধে হা বা না কিছুই সম্ভব হইত না। এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যখন বলেন, যে আমাদের এমন কোনও "চিত্তবৃত্তি" নাই যাহা দ্বারা ঈশ্বরকে জানিব, তখন মনে হয়, তাঁহারা যেন উচ্চ কণ্ঠে বাক্য-লহরী দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যে মানুষের এমন কোনও ইন্দ্রিয় নাই যদ্দারা সে বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। গুরু শিষ্য কাহারও এদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। পড়ে নাই বলিয়াই অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমাদিগকে চর্ব্বিত চর্ব্বণের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ম্যান্‌সেলের ঐ উদ্ধৃতাংশের যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিলে সাকার ও নিরাকার সকলই অজ্ঞেয় হইয়া পড়ে। কিন্তু সিংহ মহাশয় সাকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করেন নাই যে, যে অস্ত্রে নিরাকার বিনাশ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সাকারকেও অক্ষত রাখিবে না। তিনি মাপিয়াছেন কিন্তু গুণেন নাই। তাঁহার এই ভ্রান্তি হইবার দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথম কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি,—পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতার অভাব। তিনি যাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের মত এবং সেই

মত লইয়া ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি তিনি সবিশেষ জ্ঞাত থাকিতেন, তবে আর এই সকল পুরাতন কথা লইয়া তিনি আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি নিজেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরসনে যতটা অভিনিবিষ্ট, সত্যান্বেষণে ততটা নহেন। সেই জন্য অস্ত্র নিক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি ভাবিবার অবসর পান নাই, যে উহা আপাততঃ বিপক্ষদলনে সমর্থ হইলেও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বীয় বক্ষও বিদীর্ণ করিবে। তিনি লক্ষ্য করেন নাই যে, যে যুক্তিতে তিনি নিরাকারবাদকে নিরস্ত করিতে উদ্যত, তাহা তাঁহার সাকার বাতিককে অধিকতররূপে আড়ষ্ট করিতেছে। তিনি কালিদাস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ডালের কর্ত্তনে এতই মনোনিবেশ করিয়াছেন, যে ডালের পতনে যে তাঁহাকেও ভূপতিত হইতে হইবে তাহা দেখিতে পান নাই। এই যুক্তির শেষ পরিণাম যে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা, তাহা তিনি অনুধাবন করেন নাই। তিনি যদি তাহা করিতেন, তবে গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ ও পুতুল পূজার জন্য আহ্বানধ্বনি করিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহার গুরুভক্তি বা ভগবদ্ভক্তির নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু তাঁহার পথ প্রদর্শকগণ তাঁহাকে কোন্ অন্ধকারময় রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি।

সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় উকীল অধ্যাপক বেন্। নিরাকার কণ্টক নিরাকরণ মানসে তিনি বেনের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের পাদুকা ধারণ করিয়াছেন। তিনি বেনের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান তাহা ভূয়োদর্শন-লব্ধ। "তিনি" (বেন্) নাকি "প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান sensation ও muscular feeling হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর জ্ঞান আমাদের সম্ভব নয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান-পরম্পরা যোগেই সকল জ্ঞান উৎপন্ন, সুতরাং নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না, ইতি। গ্রন্থকার বেনের মনোবিজ্ঞানের দুই পাত উল্টাইয়াই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন, এবং এই বলেই অধ্যাত্মবাদ নিরসনে বদ্ধপরিকর

হইয়াছেন। উদ্যম প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু এটী এদেশে প্রথম উদ্যম নহে। বহুদিন পূর্ব্বে একবার চার্ব্বাক্ মহাশয় ঠিক এই মত প্রচার করিয়াই ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন। এবারে সিংহ মহাশয় পাশ্চাত্য চার্ব্বাকদিগের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা এই দুই মতের একতা কোথায় তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন। এই মত সাহায্যে ব্রহ্মবাদের বিপক্ষে হঠাৎ পুনরুত্থিত হইবার পূর্ব্বে, এই মত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে কিরূপ আলোচনা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের চার্ব্বাক্দিগের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ছিল। ইংলণ্ডে এই মতের প্রচারক—একরূপ প্রবর্ত্তক বলিলেও হয়,—সুপ্রসিদ্ধ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ অবশেষে এই মতের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষণিক বিজ্ঞান সকলকে একত্রিত করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, যে অতীন্দ্রিয় কোনও স্থায়ী বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। তিনি দেখিলেন যে, ভাব-যোগ ও প্রত্যাশার বলে জগৎ গড়া যায় বটে, কিন্তু ভাব-যোগ ও প্রত্যাশাকে গড়ে কে? ইন্দ্রিয়-ঘটিত এই অস্থায়ী বিজ্ঞান-পরম্পরাকে একত্রিত করিয়া জগৎ ও আত্মায় পরিণত করিতে হইলে এক অতীন্দ্রিয় নিত্য বস্তুর প্রয়োজন, যিনি এ সকলের অতীত। নতুবা স্মৃতি, ভাবযোগ, প্রত্যাশা কিছুই সম্ভব নহে। ইহা দেখিয়াই তিনি এ মত সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। ইহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় দর্শনের সঙ্গে যদি সিংহ মহাশয়ের একটুও যোগ থাকিত, তবে আর তিনি অধ্যাত্মবাদ নিরসনের জন্য এই মতের শরণাপন্ন হইতেন না। যাহা হউক, সিংহ মহাশয় বোধ হয় মিল্ পড়েন নাই। তিনি যদি বেন্‌ও ভাল করিয়া পাঠ করিতেন, তাহা হইলেও এই খবর পাইতে পারিতেন। বেন্ এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে মিল্ বড় বেশী স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু মিল্ যে দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছিলেন বেন্ তাহার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই। এই মতে যে কেবল স্মৃতি প্রভৃতি অসম্ভব, তাহা নহে, আত্মজ্ঞানই অসম্ভব। তিনিই এই দেশকালসমন্বিত বিচিত্রতাপূর্ণ জগতের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, যিনি নিত্য, স্থায়ী, এবং এ সকলের অতীত, যত্র 'সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব,' যাহাতে গ্রথিত সর্ব্বে সূত্রে যথা মণিচয়। সিংহ মহাশয় দর্শন

জগতের এই পুরাতন মীমাংসার কোনও সংবাদ রাখেন না। রাখেন না বলিয়াই এত আস্ফালন করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বোচ্চ পাশ্চাত্য দর্শন-সম্মত এবং আর্য্যঋষিদিগের প্রচারিত এই ব্রহ্মবাদকে দুখানা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে উড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি মহাসিন্ধু উত্তরণে তৃণ ভেলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অতিসাহসিকতার কারণ কি ? এরিস্ততল্ বলিয়াছেন,—মানুষের সাহস পাঁচ প্রকারে জন্মে। তাহার মধ্যে একটী অজ্ঞতা-প্রসূত,—যাহার বিরুদ্ধে যাইতেছি তাহার বলের পরিমাণানভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। সিংহ মহাশয় যে গুরুভার মস্তকে লইয়াছেন তাহার ওজন তিনি জানেন না, তাই তিনি এত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের এই প্রতিবাদ অনেকের নিকট তীব্র বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমরা একটী বিশেষ কারণে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নব চার্ব্বাকের আবির্ভাবে বিশ্বাসী ভক্তহৃদয়ে পাছে ভয়ের সঞ্চার হয়, সেই জন্য আমরা এরূপ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম, তাহাতে যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে, আশা করি, চারিদিক বিচার করিয়া, সিংহ মহাশয় আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

এই বেন্=পর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের চিন্তা শক্তির একটু পরিচয় না দিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন,—"অধ্যাপক বেন্ (Bain) বলেন,—

There is no such thing known as a tree wholly detached from perception, and we can speak only of what we know."

"অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ররূপে বৃক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ আমরা জানি না, এবং আমরা যাহা জানি তাহাই কেবল ব্যক্ত করিতে পারি।" ইহার একটু পরেই সিংহ মহাশয় বলেন, "যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জড়-জগতের সত্তা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে বলেন, তাঁহারাই আবার জ্ঞানের ক্রিয়াতে জড়জগতের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।" তিনি নিজের এই মত বেন্ হইতেই সমর্থন করিয়াছেন। এই দুইটী উক্তির স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের জ্ঞানের অতীত বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান তাহা বহির্জ্জগৎ হইতে উৎপন্ন। সিংহ মহাশয় কিন্তু এই সকল যুক্তির

উপরেই সাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাকেই লোকে বলে, "হেলে দেখে হেলে পড়, কেউটে ধর্ত্তে চাও।" যিনি চিন্তাঘূর্ণীপাকের এই সহজ একটী ঢেউ সাম্‌লাইতে অক্ষম, তিনিই একখানা ছেঁড়া মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে অধ্যাত্মবাদ খণ্ডনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন! যেমন গুরু তেমনি চেলা না হইলে কি আসর জমে? ইনিই নাকি একজন "Able refuter of Brahmoism" (ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল খণ্ডনকারী)।

সিংহ মহাশয়ের তৃতীয় গুরু পণ্ডিত-প্রবর হার্‌বার্ট স্পেন্‌সার। তিনি স্পেন্‌সারের অনেক মত তুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলেন নাই। আমরাও কিছু বলিতাম না। কিন্তু সিংহ মহাশয় ভয় দেখাইয়াছেন,—"পাশ্চাত্য দর্শনেরও সিদ্ধান্ত এই যে, Pure Being অথবা Noumenal side of God আমাদের ধারণা হইতে পারে না।" Noumenal side ছাড়িয়া দিয়া কেবল phenomenal sideএ বদ্ধ থাকিলে কিরূপ অসঙ্গতি দোষ ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা স্পেন্‌সারের মত আলোচনা করিব। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে ইনিই এই মতাবলম্বীদিগের অগ্রণী। পাশ্চাত্য জগতের সিদ্ধান্ত বলিতে সিংহ মহাশয় হয়তো ইঁহারই সিদ্ধান্ত মনে করেন, সুতরাং ইঁহার মত সমালোচনা ব্যতীত এই 'সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে আমরা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না। সেই জন্য প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা পরিহারার্থ আমরা স্পেন্‌সারের মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

স্পেন্‌সারের মতের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। সেই জন্য আমরা মতটীর উল্লেখ মাত্র করিব। সকলেই অবগত আছেন স্পেন্‌সার অজ্ঞেয়তাবাদী। যদিও আদিকারণের জগদতীত অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক, জগদতীত এক মহাসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ আস্থাবান্, এমন কি এরূপ এক সত্তা ব্যতীত জগৎ অসম্ভব, ইহা অতি জোরের সহিত বলিয়াছেন, তথাপি তিনি মনে করেন, যে আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে সক্ষম নহি। কিন্তু এই এক নিশ্বাসেই তিনি আবার বলিতেছেন, যে সেই আদিকারণ অনাদি, অনন্ত, নিত্য; তিনি শক্তি-স্বরূপ, তাহা হইতেই সকল হইয়াছে এবং তিনিই জ্ঞানরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। ইহা যে কিরূপ স্ববিরোধী মত তাহা সকলেই বেশ বুঝিতেছেন। এটা যে কিরূপ অজ্ঞেয়তা-

বাদ তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। একজন আদিকারণ আছেন, তাঁহার কতক-গুলি স্বরূপও আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে, অথচ আমরা তাঁহাকে জানি না। আমরা তাঁহার স্বরূপের যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা ধর্ম্মার্থে অপ্রচুর হইলেও অজ্ঞেয়তাবাদ বিনাশের পক্ষে তাহাই যে প্রচুর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, স্পেন্সার শক্তির জ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে আমরা আমাদের আত্মার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তদতিরিক্ত কোনও শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। অথচ তিনি আদিকারণে জ্ঞান আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন। এটা যে কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। আমরা আমাদের আত্মায় যে শক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি তাহা আত্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে। সুতরাং এই শক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তি ধারণা করিবার যদি আমাদের অধিকার না থাকে, তবে আদি কারণে শক্তি আরোপ করিয়া আত্মত্ব আরোপ না করা কি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে? স্পেন্সার অজ্ঞেয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার উৎসাহাতিশয্য বশতঃ (সিংহ মহাশয়ের যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম-নিরসনে উৎসাহ!) ইহা দেখিতে পান নাই। সেই জন্য স্বীয় মতকে নানা প্রকারে স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। এখানেই শেষ নহে, আরও আছে। তিনি এই অজ্ঞেয় শক্তির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ইহাকে পূজাও করিতে হইবে। যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহাই জানি না, তাহাকেই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে। এই অসঙ্গতির কারণ কি? Noumenal side পরিত্যাগ করিয়া phenomenaয় বদ্ধ থাকিবার চেষ্টাই ইহার কারণ। যাঁহাকে ছাড়িয়া phenomena সম্ভব নয়, phenomenaকে ভাবিতে গেলে প্রতিপদেই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে এবং জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক তাঁহার কথা বলিতে হইবে। সুতরাং আগে হইতে তাঁহাকে জানিতে পারি না বলিয়া আরম্ভ করিলে প্রতি পদেই অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। কেন না,—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক, ২।২।১১॥

স্পেন্সার যদিও জ্ঞেয়তাবাদের দিকে অনেকটা অগ্রসর, তথাপি তাহা

স্পষ্ট স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কেন না Absolute (জগদতীত)কে জানিবার মত আমাদের আয়োজন নাই। আয়োজনের কোন প্রয়োজনও নাই। যে আলোকে phenomena দেখিতেছ, তাহাকে দেখিতে অন্য কোনও আলোর আবশ্যক হয় না। Phenomena, phenomena বলিয়া যে হট্টগোল তুলিয়াছ, তাহা একটু থামাও, তিনি স্বপ্রকাশ, আপনিই প্রকাশিত হইবেন। যে আলোকে জগৎ দেখ, সে আলোতো তোমার সঙ্গেই, স্বীয় আত্মার প্রতি একবার দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে। সূর্য্যকে দেখিবার জন্য অন্য আয়োজন চাই না, আকাশের দিকে তাকাও। ইঁহারা মনে করেন সূর্য্যালোকে জগৎ দেখি সত্য, কিন্তু সূর্য্যকে দেখিতে পারি এমন কোন আলো যখন নাই, তখন অবশ্যই সূর্য্য দেখা যায় না। এই ভ্রান্তি বশতঃ ইঁহারা দৃষ্টিকে একমাত্র জগতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রতি পদেই সূর্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে। ইঁহারা মনে করেন সূর্য্যকে দেখিবার জন্য যাহা কিছু আলো জ্বালিব, তাহা সূর্য্য অপেক্ষা কম জ্যোতিষ্মান্, সুতরাং তাহা সূর্য্যকে প্রকাশ করিবে না। এই জন্যই তাঁহারা সূর্য্য হইতে পশ্চাৎ ফিরিয়াছেন। তাঁহারা যদি ইহা বুঝিতেন, যে সূর্য্য জগৎ আলোকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকেও প্রকাশিত করিতেছেন, কেন না একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী প্রকাশ হয় না, অন্যকে প্রকাশ করিতে গেলেই নিজেকে প্রকাশ করিতে হয়, তবে আর তাঁহাদিগকে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। তাই কবি বলিতেছেন—

তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই ?
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন, জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে। ব্রহ্মসঙ্গীত॥

যাহা হউক যে বাদ নিজেই নিজের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত, তাহার প্রতিবাদ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অথচ এইরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়াই সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে সমর ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাকেই সাধারণতঃ গ্রাম্য ভাষায় বলে 'গরজ বড় বালাই'। যে দেশের পিতৃপুরুষ পূজ্যপাদ প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ ব্রহ্মকে 'হস্তামলকবৎ' প্রত্যক্ষ করিয়া "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" শব্দে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, সেই দেশে হিন্দুসন্তান যখন

আর্য্যামির বহিরাবরণে স্ফীত-কলেবর হইয়াও সেই ব্রহ্মেরই অজ্ঞেয়তা প্রতিপাদন মানসে পাশ্চাত্য গুরুর শরণাপন্ন হন, তখন সেই অন্ধ-নীয়মান অন্ধদিগের কার্য্য লইয়া দুই দণ্ড আমোদ ও বিশ্রাম সুখ ভোগ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা লইয়া যে কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি মস্তক ঘামাইতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন এক শ্রেণীর লোক সম্প্রতি আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও রূপ গ্লানি শুনিলেই অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা ও ফলাফল চিন্তা না করিয়াই আনন্দে এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, যে তাঁহাদের বিচার-শক্তি একবারে লোপ পায়। এই শ্রেণীর একখানা পত্রিকায় সমালোচনা-স্থানীয় গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে,—সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, নিরাকারবাদগ্রস্ত শিক্ষিতেরা এখন সাকারবাদ প্রচার করিতেছেন। যতীন্দ্রবাবু পাশ্চাত্য শাস্ত্র-প্রভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, যে নিরাকার উপাসনা সম্ভব নহে, ইত্যাদি। যতীন্দ্রবাবু শিক্ষিত, কেন না তিনি বি, এ, উপাধিধারী। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, তখন সলি (Sully) কিম্বা তজ্জাতীয় কোনও psychology (মনোবিজ্ঞান) অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে অবশ্য সুপণ্ডিত। অতএব তিনি পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সার সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তিনি যখন বলিতেছেন, যে, নিরাকার কিছুই না, সাকারই সব তখন নিঃসংশয়-রূপে প্রমাণিত হইল, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মত দিয়াছেন,—তোমরা নিরাকার পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠী মাকাল পূজা করিতে আরম্ভ কর। আমরা বলি, ইহা যদি সুবাতাস হয়, তবে তাহা বন্ধ হইয়া শ্বাসরোধে মৃত্যুও দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

৩। আমরা বাঙ্গালী-চরিত্রের তৃতীয় লক্ষণা করিয়াছি, বুঝি আর নাই বুঝি হিন্দুশাস্ত্র লইয়া টানাটানি। সিংহ মহাশয় এই শাস্ত্র আলোচনা করিতে যাইয়া পদে পদে হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও স্বীয় চিন্তা-বিভ্রম (confusion of thought) প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিলাতী গুরু-দিগের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, যে "আমাদের এরূপ কোনও চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি।"

তাই তিনি বিশ্বাতীতকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইবার জন্য জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্র খুলিয়াই তিনি এক মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। ম্যান্‌সেল্‌-সাহায্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন, এখানে প্রতি পদেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে। তাই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা কি নির্গুণ ব্রহ্মকে জানি না? পাঠক অবশ্যই আশা করেন, সিংহ মহাশয় উত্তর দিবেন—জানি না। কেন না, এই সবে পাঁচ পংক্তি পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—তাঁহাকে জানিবার আমাদের কোনও চিত্তবৃত্তি নাই। কিন্তু সিংহ মহাশয় অন্যরূপ উত্তর দিতেছেন। তিনি বলেন, মানুষ ব্রহ্মকে জানিতে "পারে বই কি? কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়।" ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ কি হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট সে রায় শুনিতে চাহি নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জানিবারই যখন শক্তি নাই, তখন জানি কিরূপে? ব্রহ্ম হওয়া তো জানার পরের ব্যাপার। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় সিংহ মহাশয়ের বিচারশক্তির ইহাই চরমোৎকর্ষ নহে। তিনি এখানে বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিলে "মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া যায়।" কিন্তু আপনারা একটু অগ্রসর হইয়া দুই পাতা পরেই দেখিতে পাইবেন, তিনি বলিতেছেন, যে "নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব ছাড়িতে হয়।" ওখানে বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মনুষ্যের মানুষত্ব যায়; এখানে বলিলেন,—মানুষত্ব গেলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এবং পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—ব্রহ্মকে জানিতে পারে এরূপ চিত্তবৃত্তিই তাহার নাই। কিরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইলে এরূপ প্রলাপোক্তি সম্ভব তাহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। সিংহ মহাশয় উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্বের অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া যুক্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার প্রথম বিপত্তি নহে। আমরা দেখাইয়াছি বেনের সাহায্যে অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ স্থাপন করিতে যাইয়াও তিনি এইরূপ যুক্তির গোলকধাঁদায় পড়িয়া ঘূর্ণায়মান হইয়াছিলেন।

যিনি সাকার বস্তুতে ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বরে আকারারোপ, এই দুই কথায়

কোনও বিভিন্নতা দেখিতে পান নাই, তাঁহার নিকট আমরা চিন্তা-জগতের কোনও উচ্চ মীমাংসা আশা করি নাই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া পৌত্তলিকতা স্থাপন-প্রয়াসী, তাঁহার এই চিন্তা-বিপর্য্যয় দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সিংহ মহাশয় অন্যান্য শ্রুতির সহিত নিম্নলিখিত শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং।
গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ মুণ্ডক, ৩।২।৯॥

তিনি ইহার কি অর্থ করিয়াছেন তাহার আভাস পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। আরও কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন্। সিংহ মহাশয়ের মীমাংসা এই, যে "আমিত্ব বর্জ্জন না করিতে পারিলে, সেই অখণ্ড অনন্ত পুরুষকে জানা যায় না। আবার যখন তাঁহাকে জানা যায়, তখন আর আমার আমিত্ব থাকিতে পারে না"। কেননা "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ কখনও কেহ বলিতে পারে না"। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার পূর্ব্বে একটা 'আমি'কে বর্জ্জন করিতে হইবে, তার পর ব্রহ্মকে জানার পরেও আর একটা "আমি" খসিয়া পড়িবে। সিংহ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্নস্বরূপ এই দুইটা "আমি" কোথায় পাইলেন তাহার সন্ধান আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি? আমরা ত অন্তররাজ্য খুঁজিয়া একটা 'আমি'র বেশী পাই না। যাহা হউক, সিংহ মহাশয়ের কথার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষের অধিকার নাই। ঋষিরা যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মেরই জন্য, মানুষের জন্য নহে। এই যুক্তি শুনিয়া পাঠকের মনে কি ভাব হইতেছে বলিতে পারি না, আমার কিন্তু সিংহ মহাশয়ের যুক্তি পাঠ করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের যুক্তি স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিল। যাহা হউক, ইহাই যদি ঋষির কথার উদ্দেশ্য হয়, তবে "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানম্" ইত্যাদি কথা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। হিন্দু শাস্ত্রে যাঁহার একটুকুও অধিকার আছে, জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে যাঁহার একটুকুও জ্ঞান আছে, তিনি কখনও

এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। "ব্রহ্মৈব ভবতি" এ কথার অর্থ ইহা নহে, যে জীবের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে 'তাঁহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না, তিনি শোক হইতে রক্ষা পান, পাপ হইতে রক্ষা পান' এই সকল কথার কোনও অর্থই থাকে না। কথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, জীব যে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতেছিল, তাহার সেই সংস্কার চলিয়া যায়, তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের মৌলিক একত্ব অনুভব করেন। কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মের সঙ্গে কখনও এক হইতে পারে না। ব্রহ্মের আত্ম-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, নিত্য। কিন্তু জীবের যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের সঙ্গে যে তাহার একত্ববোধ, তাহা একটী ঘটনা, কালে সিদ্ধ। সুতরাং এই দুয়ের সূক্ষ্ম ভেদ চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবে। ঋষিরা তাহা জানিতেন। "সোহহমস্মি," "তত্ত্ব-মসি" প্রভৃতি বৈদান্তিক মহাবাক্যই তাহার প্রমাণ। সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি", ইহা কেহ বলিতে পারে না, "সোহহমস্মি" এই মহাবাক্য সেই কথার প্রতিবাদ করিতেছে। কেবল এই মহাবাক্য নহে, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" এই প্রসিদ্ধ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছে। ঋষি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিতে-ছেন,—না পারে; ঐ শুন, "জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্"। যতীন্দ্র-বাবু মুখে ত শাস্ত্রের প্রতি খুব শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন, এই ঋষিবাক্য তাঁহার কোনও কাযে আসিবে কি? দেশ পতিত হইলেও এত অধঃপতিত নহে, যে লোকে ঋষির অভিজ্ঞতা পরিত্যাগ করিয়া যতীন্দ্রবাবুর এই গায়ের জুরি কথা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। তবে যতীন্দ্রবাবু এখানে বলিতে পারেন, যে "পুরুষ" পরব্রহ্ম নহেন, অপর ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ। কিন্তু শ্রুতি তাহারও প্রতিবাদ করিতেছেন,—

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ কঠ, ৩।১১॥

"আমি ব্রহ্ম" ইহা জানিলেও যে জীবের ব্যক্তিত্ব সূক্ষ্ম ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে, এই কথা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েই অনুমোদন করিতেছে। সিংহ মহাশয় শ্রুতি মানেন কি? শ্রুতি বলেন "য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"। ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ হয়, 'ব্রহ্ম হইয়া যায়' না।

আরও একটী কথা। ঐ শ্রুতিই বলিতেছেন, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য-

বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ”। (বৃহদারণ্যক, ৫।৮।১০)। শ্রুতির মতে আমাদিগকে ইহলোকেই অর্থাৎ এই দেহে অবস্থিত থাকিতে থাকিতেই, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, সিংহ মহাশয় বলেন—ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই দুই একত্র করিলে তাহার এই ফল দাঁড়ায় যে এমন সময় আসিতে পারে যখন আমাদের এ লোকে বহু দেহধারী ব্রহ্মের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু শ্রুতির মতে ব্রহ্ম এক ও অশরীরি। উদ্ধৃত শ্রুতি-বাক্যটী লইয়া সিংহ মহাশয়ের অনুসরণ করিলে ঘরে বাহিরে, হাটে মাঠে, নগরে প্রান্তরে ব্রহ্মের গড়াগড়ি ছড়াছড়ির সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। কেননা, এক সময়ে একাধিক মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, একথা শ্রুতি বলেন নাই, শাস্ত্র-সম্মত যুক্তিও একথা বলে না, নিরঙ্কুশ যুক্তিও একথা সমর্থন করিবে না। ইহাই হইল পুনরুত্থান-চিন্তাশীলতা! এই যুক্তির উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-নিরসন প্রতিষ্ঠিত !!

যাহা হউক, সিংহ মহাশয়ের আলোচনায় যত কেন অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি থাকুক্ না, বেদান্ত আলোচনা করিয়া সিংহ মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে মানুষের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব ; সুতরাং উত্তরার্দ্ধের দ্বারা তাঁহার আলোচিত বিষয়ের পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ নিরাকৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যদি কেহ অগ্রসর হন, সিংহ মহাশয়ের পক্ষে তাহাকে বাধা দিবার কিছুই নাই। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, যে শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান ও বর্ত্তমান ব্রহ্মজ্ঞান এক পদার্থ নহে, কেননা শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষ ব্রহ্ম হয়, কিন্তু ইহাতে মানুষ মানুষই থাকে। কোন্ অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষ ব্রহ্ম হয়, এবং কোন্ অর্থে মানুষই থাকে ;তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ইহাতে শ্রৌত ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মে কোনও বিভিন্নতা নাই। যাহা কিছু বিভিন্নতা তাহা কাল ও অবস্থার। কাল ও অবস্থার শত বিভিন্নতা সত্বেও বাল্যকালের ধূলি খেলায় রত যতীন্দ্র মোহন ও বর্ত্তমানের সহস্র সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ডেপুটী বাবু যতীন্দ্র মোহন যেমন একই ব্যক্তি, কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্বেও এই দুই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম একই পদার্থ।

তর্কের খাতিরে যতীন্দ্র বাবুকে একটী প্রশ্ন করি। তাহা এই, যে তিনি কি করিয়া জানিলেন যে বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মজ্ঞানের পর মানুষই থাকে, ব্রহ্ম

হইয়া যায় না। তিনি তো আর সকল ব্রাহ্মের সঙ্গেই পরিচিত নহেন। কিম্বা এ পর্য্যন্ত কেহ হয় নাই বলিয়া যে ভবিষ্যতেও হইবে না, তাহা কে বলিল? চারা গাছে ফুল ফল নাই বলিয়া যে কোনও কালে তাহাতে ফুল ফল হইবে না তাহা বলা যুক্তি-সঙ্গত নহে এবং উহা যে ফলবান্ বৃক্ষের চারা নয় এরূপ মত দেওয়াও অত্যন্ত গর্হিত। যতীন্দ্র বাবু বিচারক, তাঁহার কথার উপরে অনেকের জীবনমৃত্যু নির্ভর করে, সকল দিক্ বিচার না করিয়া এরূপ রায় প্রকাশে তাঁহার বৈষয়িক ক্ষতিরও বিশেষ সম্ভাবনা।

সিংহ মহাশয় দায়ে পড়িয়া যদিও স্বীকার করিয়াছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, তথাপি বেদান্তধর্ম্মকে দূরে পরিহার করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ভয় দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মোপাসনা এত কঠিন, যে তাহা বুঝিতে পারিলে কেহই তাহার বাড়ীর কাছ দিয়াও যাইতে চাহিবে না। কেহ তাহার বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে চাহিবে কিনা তাহা জানি না, কিন্তু উহা যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, তাহা সিংহ মহাশয়ের নূতন আবিষ্কার নহে। প্রাচীন ও নবীন সকল ব্রাহ্ম আচার্য্যগণই ইহার কাঠিন্য বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। কিন্তু সিংহ মহাশয় সে খবর রাখেন কিনা বলিতে পারি না। কঠিন বলিয়াই তো প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, দুর্গম বলিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ত অতি কাপুরুষের কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য উপাধি লাভ করিতে কি তেল খরচ হইয়াছিল, সিংহ মহাশয় কি এত সত্বরেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? বি, এ, পাস বড় কঠিন, আগে এণ্ট্রান্স, পরে এফ্, এ, পাস করিলে তবে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। অতএব কাহারও এ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং এস আমরা দিদি মার উপকথা শুনিয়া বিদ্যালাভ শেষ করি—এই বলিয়া যদি সিংহ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিতেন, তবে কি আর তাঁহার উপাধিলাভ হইত, না পুস্তকের উপরিভাগে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে বি, এ, এই কথা দুটী লিখিতে পারিতেন? ব্রহ্মসাধনের কঠোরতা প্রতিপাদন জন্য তিনি উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী এই,—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ কঠ, ২।২৪॥

তিনি ইহা দেখিয়াই ভয় পাইয়াছেন। চিত্ত-সংযমের নামে সিংহ মহাশয়ের বুঝি হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি ব্রহ্মোপাসনার ত্রিসীমায় আসিতে প্রস্তুত নহেন। ভয় পাইবারও কথা। যে দেশে নৈতিক চরিত্রে শত জঘন্যতা বর্ত্তমান সত্ত্বেও লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হয়, যে দেশে উপাস্য দেবতা চরিত্রহীন হইয়াও উপাসকের ভক্তি শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হন না, সেই দেশে জন্মিয়া সোজা ধর্ম্ম থাকিতে ধর্ম্ম সাধনে সংযম প্রভৃতি বিভীষিকা দেখিয়া কেহ কেহ যে ভীত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দেশের এই দুরবস্থা চিরকাল ছিল না। এমন সুদিন ছিল যখন পিতৃপুরুষগণ ধর্ম্মের জন্য সকলই সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই ত্যাগ ও সংযমের পথ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন বলিয়াই কি সিংহ মহাশয় তাহার উপর এত খড়্গহস্ত? ঋষিরাও জানিতেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সংযম চাই, ত্যাগ চাই, উপাসকের শান্ত সমাহিত হওয়া চাই। তাঁহারা জানিতেন এ পথ অতি দুর্গম। তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন,—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ॥ কঠ, ৩।১৪ ॥

তাঁহারা ইহা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে অজ্ঞানতার অন্ধকার গহ্বরে আলস্য-শয্যার আশ্রয় লইবার পরামর্শ দেন নাই। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্যই তাঁহারা বিষয়ান্ধ জীবকে আহ্বান করিতেছেন— "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ॥ কঠ, ৩।১৪॥

সিংহ মহাশয় পাশ্চাত্য গুরুর প্ররোচনায় 'অজ্ঞেয়' বলিয়া যাঁহাকে পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই জানিবার জন্য ঋষিরা আমাদিগকে ডাকিতেছেন। তাঁহাদের এ আগ্রহ কেন? এই জন্য, যে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। আর যে গতি নাই, তাই তাঁহাকে জানিতে হইবে। ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"। বৃহদারণ্যক, ৫।৮।১০ ॥ যে তাহাকে না জানিয়া ইহ লোক হইতে অপসৃত হয় সে অতি দীন, কৃপাপাত্র। কঠিন হউক, সহজ হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেই হইবে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কখনও ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে না। সিংহ মহাশয় পৌত্তলিকতার ধূমোদ্গীরণ দ্বারা লোক চক্ষুকে যত কেন আকুলিত করিতে

চেষ্টা করুন্ না, ভারতাকাশ আলোড়িত ও সর্ব্ব কোলাহল নির্ব্বাপিত করিয়া ঋষির ঐ মধুর আহ্বান-ধ্বনি আমাদের শ্রুতি-গোচর হইতেছে। ঐ শুনুন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ"। (শ্বেত, ২।৫।)

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥ শ্বেত, ৩।৮।

সংসার-সাগর উত্তরণ করিবার যখন ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন তরণী নাই ও এই সাগর যখন আমাদিগকে উত্তরণ করিতেই হইবে, তখন যত কেন দুরূহ হউক না, তল্লাভে আমাদিগের যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মানুষ স্বভাবতঃই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিরত, তাহাতে আবার যাঁহারা কৃত্রিম বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া মানুষকে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই মুণ্ডক ঋষি বলিয়াছেন,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ"।

ব্রহ্মজ্ঞান জনসমাজ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য সিংহ মহাশয় আর একটী সনাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শ্লোকের স্বমতানুযায়ী বিকৃত ব্যাখ্যা। "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিবচন গুলিকে ব্রাহ্মসমাজ রাজর্ষি রাম মোহনের সময় হইতেই অত্যন্ত আদর করিয়া আসিতেছেন। সিংহ মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি সর্ব্ব প্রথম এই গুলির উপরেই পতিত হইয়াছে। সিংহ মহাশয়—"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ॥ (কেন, ৫)। এই শ্লোকের এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন "যাঁহাকে মনদ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাঁহা হইতে নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম; তিনি উপাস্য নহেন।" আমরা উদ্ধৃত শ্রুতিটী বুঝিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু শব্দ, অর্থ কিম্বা ভাষ্যের দ্বারা কোথাও যে "তিনি উপাস্য নহেন" এই কথা সূচিত হইয়াছে এরূপ বোধগম্য হইল না। উপনিষদ্ খানা আবার পড়িলাম, দেখিলাম শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ (কেন, ১)।

মন কাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? প্রধান প্রাণ কাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার ইচ্ছাতে লোক এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন?—গুরু অন্যান্য উত্তরের মধ্যে বলিতেছেন "যন্মনসা" ইত্যাদি, অর্থাৎ "লোকে যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন বলিয়া (ব্রহ্ম-বিদেরা) বলেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, এই যে (পরিমিত) বস্তু (লোকে) উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। কিন্তু কৈ? "তিনি উপাস্য নহেন "এ কথা তো কোথাও পাইলাম না। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ও সিংহ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত, এই দুইয়ের কোন সামঞ্জস্য খুজিয়া পাইতেছি না। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—"ইন্দ্রিয়গণকে কে পরিচালিত করে"? গুরু উত্তর করিলেন "ব্রহ্ম"। পাছে শিষ্য ব্রহ্মকে সাধারণ লোকের উপাস্য কোনও পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সঙ্গে এক বলিয়া ভাবেন, সেই জন্য বলিলেন "নেদং যদিদমুপাসতে"। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে ব্রহ্ম যদি উপাস্য না হইতেন, তবে গুরুর পক্ষে এরূপ ভয় হইত না, এবং তাঁহার উপাস্যের সঙ্গে সাধারণ উপাস্যের ভিন্নতাও দেখাইতে যাইতেন না। ব্রহ্ম উপাস্য বলিয়াই "নেদং যদিদমুপাসতে" এই কথার সার্থকতা। কিন্তু সিংহ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত "তিনি উপাস্য নহেন"। কোন কোন মীমাংসকের এইরূপ বুদ্ধিবিকার লক্ষ্য করিয়াই হয়তো এই লৌকিক উক্তি রচিত হইয়াছে—"এখান থেকে মার্লাম ছুরী লাগ্লো কলা গাছে, হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ্ গেল রে বাপ্"। সিংহ মহাশয় কি উপনিষদ্ খানা পাঠ করিয়াছেন? ঋষি উপসংহারে কি বলিয়াছেন তাহার খবর তিনি রাখেন কি? ঐ শুনুন্ ঋষি বলিতেছেন,—

"অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ॥ (কেন, ৩০)। তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভি-হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ (কেন, ৩১।) উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা চ উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥ (কেন, ৩২)।

অর্থাৎ—তৎপর আত্মবিষয়ক উপদেশ এই যে মন যেন তাঁহার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) নিকটে যায় (অর্থাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত হয়), এবং ইহা দ্বারা (অর্থাৎ

মনের দ্বারা) তাঁহাকে বার বার স্মরণ করে, (ইহাই মনের বা সাধকের) সঙ্কল্প।
তিনি সম্ভজনীয়রূপে প্রখ্যাত, তিনি সম্ভজনীয়রূপে উপাসিতব্য। যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তাঁহাকে সকল প্রাণী বিশেষরূপে পাইতে ইচ্ছা করে। (আচার্য্য শিষ্যকে বলিলেন, তুমি বলিয়াছিলে) হে ভগবন্! আমাকে উপনিষদ্ বলুন। (সেই হেতু) তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইল, ব্রহ্ম বিষয়িণী উপনিষদ্ তোমাকে বলিলাম।—সিংহ মহাশয় যাঁহাকে "তিনি উপাস্য নহেন" বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন ঋষি তাঁহাকেই বলিতেছেন,—"তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্"।

ঐ যে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলিতেছেন,—

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ"।

এখনও কি সিংহ মহাশয় বলিবেন, "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন"। কেনোপনিষদে হাত দেওয়া সিংহ মহাশয়ের পক্ষে এক মহা ভ্রান্তির কার্য্য হইয়াছে। কেন না, জানিবার "চিত্তবৃত্তি" নাই বলিয়া যাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি উপদেশ দিতেছেন, ঋষি বলিতেছেন ইহ জগতেই যদি তাঁহাকে না জান, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে,—

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কেন, ১৩)।

সিংহ মহাশয় তো বলিতেছেন,—জানিবার 'চিত্তবৃত্তি' নাই, কিন্তু শ্রুতি বলেন "তদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। 'দৃশ্' ধাতু দেখিয়া কেহ যদি বলেন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ, "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা"। তিনি আমাদের বিজ্ঞানগোচর, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। কেন না শ্রুতি বলেন,—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে ধ্যায়মানঃ॥ (মুণ্ডক,৩।১।৮)।

যে রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার ধ্যানে নহে, কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহাকেই হৃদয়ে অভিপ্রকাশিত দেখিতে হইবে, এবং তাহাকে জানার উপরেই মুক্তি নির্ভর করে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই ঋষি বলিতেছেন,—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্ৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ (কঠ, ৬।৯।)

মুক্তিপ্রার্থী হইয়া "ব্রহ্মকে জানা যায় না," "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন" প্রভৃতি নিরর্থকবাক্য বলিলে আর চলিতেছে না।

সিংহ মহাশয়ের সাহসিকতা যে কেবল উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নহে, তিনি স্বমত পরিপোষণার্থ "নেদং যদিদমুপাসতে" এই টুকুর শাঙ্কর ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সব টুকু ভাষ্য উদ্ধার করিতে সাহসে কুলায় নাই। শঙ্কর বলিতেছেন "নেদং ব্রহ্ম যদিদমিত্যুপাধিভেদবিশিষ্টম-নাত্মেশ্বরাদ্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি"। সিংহ মহাশয় ব্যাখ্যা করিতেছেন "অর্থাৎ লোকে যে উপাধি ভেদবিশিষ্ট আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ—যেমন ঈশ্বরাদি উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম নহে"। "অর্থাৎ উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম নহে" এই টুকু শাঙ্কর ভাষ্যের কোন্ খান্‌টার ব্যাখ্যা, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। শঙ্কর বলিতেছেন—উপাধিভেদবিশিষ্ট যাহা কিছু অনাত্ম বস্তু, (সাধারণতঃ লোকের উপাসনা যাহাতে আবদ্ধ,) তাহা ব্রহ্ম নহে। ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই,—ব্রহ্ম "ইদম্" নহেন, তিনি "অহম্"; অনাত্মা নহেন, আত্মা; বিষয় নহেন, বিষয়ী। অনাত্মার সঙ্গে একীভূত যে ঈশ্বরাদি অর্থাৎ দেবতা সকল, তাঁহাদের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহে। সিংহ মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন শঙ্কর এক জন সংস্কারক। লোকদিগকে দেববাদ হইতে ব্রহ্মবাদে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। ঈশ্বরাদি শব্দে তিনি এখানে দেহাভিমানী পরিমিত দেবতাদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেন না পরমেশ্বর যে উপাস্য তাহা তিনি বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, শঙ্করের কথায় কোনও সত্য আছে কি না, শঙ্করের সঙ্গে আমাদের ঐক্য বা পার্থক্য কি, তাঁহার ভাষ্যের কোনও টীকা প্রয়োজন কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, বলিবার স্থানও ইহা নহে; কিন্তু "উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম নহে" ভাষ্যের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। 'এ দেশে ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য' এই দেশপ্রসিদ্ধ সংস্কারের কথাও কি সিংহ মহাশয় অবগত নহেন? নতুবা 'ব্রহ্ম উপাস্য নহেন' এ কথা শাঙ্কর ভাষ্য হইতে প্রমাণ করিতে যাইবেন কেন?

সিংহ মহাশয় কেবল ভাষ্যের বিদ্যা দেখাইয়াই নিরস্ত হন নাই, আবার Logicএর বিদ্যাও প্রদর্শন করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যার শেষে

তিনি বলিয়াছেন, "এই proposition convert করিলে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম উপাস্য নহেন।" আমরা দেখিয়াছি তিনি শাঙ্কর ভাষ্যের ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং conversionও ভুল হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ—উপাধি-ভেদ-বিশিষ্ট অনাত্ম বস্তু ব্রহ্ম নহেন। ইহাকে convert করিয়া অর্থ করিলে হয় 'ব্রহ্ম উপাধি-ভেদ-শূন্য আত্মবস্তু'। সিংহ মহাশয়ের ভাব অনুসারে সাধারণ 'লোকে যাঁহার উপাসনা করে' এই কথার উপরে যদি জোর দেওয়া যায়, তবে conversionএর অর্থ হয় 'ব্রহ্ম উপাধি-ভেদ-শূন্য, আত্মস্বরূপ, উপাস্য'।

"নেদং যদিদমুপাসতে" এই কথা গুলির ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিতেছেন,—"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধীত্যুক্তেঽপি নেদং ব্রহ্মেত্যনাত্মনোঽব্রহ্মত্বং পুনরুচ্যতে"। অনাত্ম বস্তু ব্রহ্ম হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইবার জন্য "নেদং" প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি "অনাত্মবস্তু ব্রহ্ম নহেন" ইহাকে convert করিয়া অর্থ করিলে "আত্মবস্তু ব্রহ্ম" ইহাই কি পাওয়া যায় না? তবে convert করিয়া "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন" ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? শাঙ্কর ভাষ্যের আশে পাশে ত্রিসীমায় কোথায়ও তো "ব্রহ্ম উপাস্য নহেন" ইহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

যাহা হউক, সিংহ মহাশয়কে ধন্যবাদ, যে তিনি এখানে conversionএর কথাটা তুলিয়াছেন, তাহাতেই বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হইল। তুলিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহার অবলম্বিত পণ্ডিতোচিত ভাষায় তাঁহার উত্তর দিবার সুবিধা পাইলাম। আশা করি সিংহ মহাশয় তাঁহার মর্‌চে ধরা Logic খানা খুলিয়া একবার conversion বিষয়টা ভাল করিয়া দেখিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের বিপক্ষে সিংহ মহাশয়ের আর একটী উপায়,—শ্লোকার্দ্ধ উত্তোলন। তিনি ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তা প্রতিপাদন জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন", এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেন না, অপরার্দ্ধে জ্ঞানের কথা রহিয়াছে। পেচক যেমন সূর্য্যালোক ভয় করে, সিংহ মহাশয়ও বোধ হয় কেবল জ্ঞান নহে কিন্তু জ্ঞানবাচক শব্দ গুলিও তেমনি ভয় করেন। ইতি পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি "তদেব ব্রহ্ম ত্বং

বিদ্ধি” ইহার “ত্বং বিদ্ধি” এই টুকুর অনুবাদ করা হয় নাই। বোধ হয় “বিদ্ধি” কথাটা দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়াছেন। এখানেও রহিয়াছে “বিদ্বান্” সুতরাং পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ‘আনন্দ’ যদি জানা হয়, তবে আর তিনি অজ্ঞেয় থাকেন না, সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যও চারি পদের দুই পদ তিনি গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা, চতুষ্পদ লইয়া লোক সমাজে উপস্থিত হইলে, সিংহ মহাশয়ের কার্য্য সিদ্ধি হইত না। তাই এই দুই পদ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেই যে আর সকলের দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা ঐ দুই পদও খুজিয়া বাহির করিয়াছে, সুতরাং সিংহ মহাশয় লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

সিংহ মহাশয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথা মানিবেন কি? গোবিন্দাচার্য্য তাঁহার কারিকায় বলিয়াছেন,—“উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম যত্তৎ শব্দোপলক্ষিতম্।
যতোবেতি যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতি সম্মতম্” ॥

সিংহ মহাশয় যে “যতোবাচো” শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—“ব্রহ্ম উপাস্য নহেন” গোবিন্দাচার্য্য ব্রহ্মোপাসনাকে সেই “যতোবাচ ইত্যাদি শ্রুতিসম্মত” বলিতেছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বিরুদ্ধ মত প্রচার করাই কি “হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান”? সিংহ মহাশয় তাহাই করিয়াছেন অদ্ভুত প্রয়াস!

উপনিষদ্ পাঠ করিয়াও লোকে কিরূপে বলিতে পারে যে “ব্রহ্ম উপাস্য নহেন”, “আমাদের এমন কোনও চিত্তবৃত্তি নাই যে তদ্দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে জানিতে পারি,” তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিম্নে একটী শ্রুতি উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ (মুণ্ডক, ২।২।৫।)

যাহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণ সহ মন ধৃত রহিয়াছে, সেই আত্মাকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃতভাবের সেতু (অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়)।

এখনও কি সিংহ মহাশয় বলিতে চাহেন, যে “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” এই শ্রুত্যর্দ্ধের আক্ষরিক গণনা ও বিকৃত ব্যাখ্যাই বেদান্ত-ধর্ম্মের সার? আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি, ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সিংহ মহাশয় ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রচার করিয়া স্বীয় হিন্দুত্বের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। উপনিষদের প্রাচীন ঋষি বলেন,—ব্রহ্মকে জানা ছাড়া অন্য সকল কথা পরিত্যাগ কর, কিন্তু সিংহ মহাশয় সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচারের সার নিষ্কাশন করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মকে জানা যায় না, কেন

না, তাঁহাকে জানিবার মত আমাদের "চিত্তবৃত্তি" নাই, অতএব তোমরা চা'ল কলার নৈবেদ্য সাজাও। আধখানা শ্রুতি মুচ্‌ড়াইয়াই তিনি মনে করিয়াছেন—শ্রৌত ধর্ম্মের পার দর্শন করিয়াছি। এই যাঁহার শ্রুতি বিষয়িণী বিদ্যার পরিধি, সেই সিংহ মহাশয়ই ব্রাহ্মদিগকে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন,—শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান যে কি তাহা নিরাকারবাদী একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই তো! দেখিয়াছেন কেবল সিংহ মহাশয়ের ন্যায় সাকারবাদী!

সিংহ মহাশয়ের দুঃসাহসিকতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার অধিকার নাই এবং সেই জন্যই 'পৌত্তলিকতা অঙ্গের ভূষণ হউক' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরসনের জন্য ব্রহ্মবাদীদিগের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র বেদান্তের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন! তাঁহার এই বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়াই লোকে বলিতেছে—

"হাতি ঘোড়া গেল তল" ইত্যাদি।

অশিক্ষিত লোক মণ্ডলীর মধ্যে বেদান্ত ধর্ম্মের অবস্থা কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শিক্ষিতাভিমানী অথচ পৌত্তলিকতা-পোষক লোকের মধ্যে বেদান্তের প্রভাব কি তাহার নমুনা কতকটা দেখা গেল। এখন বোধ হয় পাঠকবর্গের বুঝিতে কষ্ট হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা কেন 'পরিপাকের বড়ি' বা 'হজ্‌মিগুলি' বলিয়াছি। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব।

আমরা যে শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিলাম, তাঁহাদিগকে 'পুনরুত্থানকারী' বলা হয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান বলিতে আমরা বেদান্তধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় বুঝি। সুতরাং যাঁহারা চার্ব্বাকদিগের শরণাপন্ন হইয়া সেই বেদান্তধর্ম্মকে দূরীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁহাদিগকে 'পুনর্ব্বিনাশকারী' বলিলেই যথার্থ কথা বলা হয়।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিব। সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে দেশ যখন উপক্রুত হইয়াছিল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের এক মহোপকার করিয়াছেন। লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিধাতার এক মহাভ্রান্তি নহে, ইহারও যে একটু স্থান আছে, ইহারও অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্য যে একটা যুক্তি আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সিংহ মহাশয় ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই! তবে তিনি যে ব্রাহ্মদিগকে প্রাচীন মণ্ডলীতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে, অর্থাৎ বংশগত পৌরোহিত্য, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তদুত্তরে তাঁহারা বর্ত্তমান শিষ্টাচারের ভাষায় বলিবেন,—'Declined with thanks.'

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

THE SPIRITUAL DISCIPLINES TAUGHT IN THE *BHAGAVADGITA*.

The venerable Svámí Madhusúdan Sarasvatí, one of the most respected of the commentators of the *Bhagavadgítá*, says in the introduction to his learned commentary :—"The object of the *Gítá* is complete deliverance, the total cessation of worldly life and its cause (*i.e.* ignorance). The state of deliverance is the attainment of the highest place of the All-pervading, the perfect condition that consists in truth, intelligence and bliss, and the attainment of which is taught by the threefold Vedas. Just as there are three *kándas* or sections in the Vedas, *karma*, (work), *upásti* (adoration) and *jnána* (knowledge), so there are three sections in the *Gítá*, which consists of eighteen chapters. Every six chapters form a distinct section. The first six chapters treat of work, and the last six of knowledge. As there can be no harmony between these two, for they are opposed to each other, *bhakti* or reverential devotion to God is taught in the intervening chapters. *Bhakti*, which which removes all obstacles, is related to both work and knowledge. It is of three kinds—that which is united to work, that which is joined to knowledge and that which is pure, unmixed. In the first section, the object *tvam*, thou, as pure self, is investigated with proofs, by the way of renouncing work, *i.e.* work inspired by desire. In the second, the object *tat*, it, that is the All-blissful Lord, is ascertained by the way of inculcating devotion to him. In the third, the unity of the two, the meaning of the phrase (*Tat tvam asi*, "Thou art that)" is clearly indicated. This is the relation of the three sections."

Thus Sva´mi Madhusúdan conceives the object of the *Gítá* in the spirit of the later Vedantic school

* Contributed by the Editor of the *Brahmatattva* to *The Oriental.*

of the great Sankaráchárya. He not only takes the *Gítá* to be a Vedantic work,—which it really is in all essentials, notwithstanding its attempt to fuse together a number of contending elements,—but he conceives it as nothing but an exposition of the great phrase—*mahávkáya*, as it is called by the followers of Sankara—which, though contained and expounded in the *Chhándogya Upanishad*, was brought into prominence and used as a watchword by the Vedantists of the school just named. The Svámi's conception cannot be very acceptable to Vaishnavas of the Bengal School, who are of a decidedly dualistic turn of mind; but the Svámi is a pronounced Vaishnava himself, and combines in him a reverence for both the Vedanta and the Bhakti Sastras, specially the *Srimadbhágavatam*, on which he wrote an elaborate commentary. Without any partiality for either dualistic or Vaishnava tendencies of thought, we must confess, for ourselves, to some doubt as to the correctness of the division which the Svámi has made of the chapters of the *Gítá*,—nay of the very idea that the writer of the work had the *mahávákya* distinctly before him as a guiding thread for the arrangement of his thoughts. But there can be no doubt that the treatise is an exposition of the three main aspects of spiritual life—knowledge, love and work,—and if we give up the idle hope of finding an exactly logical division of chapters in an ancient work like the *Bhagavadgítá*, the Svami's division of the book into three parts, each containing six chapters and treating respectively of *karma*, *bhakti* and *jnána*, will be found to be practically a very convenient one. Let us see, then, how these three sections deal with their respective subject-matters.

As has already been said, the first six chapters treat of work, or rather duties, personal, sacrificial and social. Of personal duties, the subjugation of the passions is the one which occupies the author

most. He is not for the total extermination of our natural appetites and propensities. It is his distinct opinion that they should have their legitimate play. What he insists upon is that the soul should not be subject to them,—should not be guided by them. For the soul to be under the guidance of sensuous passions, is like a boat to be under the caprices of fitful winds. The passions should always be under the guidance of Reason. It is Reason that should lead them to their legitimate satisfaction. Desires for earthly gratification should be eschewed. Satisfaction should be sought within. If earthly pleasures come to the soul without being sought after, without being pursued, they may be accepted. The soul should be like the ocean, satisfied with its own fulness and wanting nothing, and yet receiving the waters of the rivers flowing into it.

Consistently with the principle of renouncing selfish desires, the performance of sacrificial and other duties with a view to obtaining objects worldly or other-worldly, for personal satisfaction, should also be given up. In the *Karmaka´nda* of the Vedas, and in the *Dharma Sa´stras* or treatises on moral and social duties, various duties are inculcated, and to each a reward here or hereafter is attached. The performance of these duties for the sake of the rewards promised for them is not calculated to promote that calmness and serenity of mind, that entire subjection to Reason which the author of the *Gita´* inculcates. Hence he speaks often and emphatically against the performance of duties from interested motives. He is not against duties, either sacrificial or social. On the contrary, he dwells on the obligatoriness of sacrifices as acknowledgements of our debt to the gods, the various powers of Nature, and the necessity of social duties for the preservation of the social order and the perpetuation of the world. What he insists upon is, that duties should be done

from a pure sense of duty, and not from any desire for individual satisfaction here or hereafter. The pleasant or painful effects of duties should not be thought of, and such thoughts should not be allowed either to exult or depress us. Duty should be done from a pure, unselfish motive, with a constant consciousness of God's presence and as an act of worship offered to him.

But this lofty mood of mind,—this profound consciousness of God and this pure sense of duty for duty's sake,—cannot be attained without a systematic cultivation of devout meditation. The *Gíta´* therefore gives detailed directions as to how such meditation should be practised. After dwelling on the nature of the seat on which the devotee should place himself and other circumstances favouring a proper concentration of mind, the author next speaks of the process of making the mind calm,—rendering it free from distracting thoughts due to worldly desires. He then tells the devotee to fix his thoughts on the Self, which he has taught, by a previous analysis, how to discriminate from limited objects. The nature of true meditation is then described by an enumeration of its beneficial effects. These effects are, mainly, an intense joy far surpassing the pleasure derived from earthly objects, drawing away of the heart from temporal objects, and a growing consciousness of God in all things internal and external.

The subject of concentrating the mind in God having been already introduced at the close of the last section, the second section, beginning with the seventh chapter, deals in greater detail with the various modes of devout meditation. Knowing that the act of worship, in the proper sense, is impossible unless the mind has a correct knowledge of God's relation to the finite soul and the world,—unless it knows how and where to seek the object of its worship,—the author of the *Gíta´* proceeds to enlighten

the reader in these matters. The objective world, he says, is the *apara´ prakriti* or lower nature of the Deity, and the subjective world, the world of finite souls, is his *para´ prakrti* or higher nature. It is the latter, it is the divine intelligence, that manifests itself in the form of individual souls, and that, on the other hand, supports the objective world. Both these aspects of existence are identical with God, and he may be sought both in and out; but the distinction of higher and lower, of the supporting and the supported, drawn between them, should not be forgotten. The *Gi´ta´* condemns, in almost unmeasured terms, the popular disregard of this distinction, —the exclusive identification of God with material objects and the ignoring of the transcendent nature of the Deity. These remarks are extremely important with reference to the current forms of popular worship. However, the transcendent aspect of the Divine nature being always kept in view, it is a very useful discipline to try to realize the Divine presence in the more glorious objects of Nature and in the more exalted specimens of human character. On this discipline, and on two more which are inculcated in this section, we cannot do better than repeat what the present writer said on another occasion. *

(2) *Bibhu´ti yoga* consists in the habit of realising the presence of God in those objects of Nature which are characterized by superior power, grandeur, beauty or usefulness, as also in men of uncommon heroism, wisdom or holiness. All objects are indeed manifestations of God, but for ordinary mortals, it is not possible to take them as such before they have passed through a course of spiritual development. It is easier to realise God in unusually great objects and persons than in Nature in general and in ordinary persons. The Himalayas help us incomparably more in feeling the Divine presence than small hills,

* In *Hindu Theism*, pp. 157-160.

the Ganges more than ordinary streams. So, it is easier to feel the divinity of man when contemplating a Ra'ma or a Krishna, a Kapila or a Vya'sa than a person of mediocre powers and attainments. The *Gi'tà*, therefore, exhorts us to contemplate these *bibhtu'tis* or special manifestations of God as a help to his realisation everywhere. In the enumeration of these *bibhu'tis*, the author of the *Gitá* of course follows his own scientific and historic light, a light which may be insufficient for us, or even mislead us sometimes. But whether this or that *bibhu'ti* mentioned by him be such a glorious object or not as he describes it to be, the discipline inculcated by him must be pronounced to be a really efficacious one, and must be adopted by those who, not contented with the mere knowledge or belief that God is, or that he is near, seek to make this knowledge a living reality. We may correct and enlarge the list of divine manifestations by the light of modern science and history. In doing so, we should be only following the spirit of the *Gi'ta'*, for it distinctly says at the close of its enumeration of *bibhu'tis*, that it is unnecessary to name any more than what have been named, as the whole world is God's manifestation—one aspect of his nature.

(3) *Visvarupa-darshanam*, the vision of God as manifested in the, or, to be more correct, *as* the various visible objects of Nature, comes naturally after *bibhu'ti-yoga*. The devotee has attained success in the practice of seeing God in special objects. He now desires to see him in all objects. It is of course impossible to see God with carnal eyes, and so Arjuna, who represents the worshipper, obtains *divya*, *i. e.* heavenly or spiritual eyes from his Guide and Instructor. When such eyes are obtained in the course of spiritual culture, the veil, the materiality, of Nature is removed, and it appears as the manifold form of the Formless. So the veil of humanity that enshrouds

the divinity of man is also taken away, and we, like Arjuna,, lament our blindness in treatmg with lightness and irreverence the Infinite One in the persons of our friends and connexions. The vision of God as the All-in-all must be, at less advanced stages of spiritual life, too dazzling a one to be borne for a long time, and so Arjuna is represented as praying Krishna, after looking at him as the spiritualized cosmos, to hide his glorious cosmic form and re-assume his everyday human appearance. We do the same every day when, from the contemplation of Nature and humanity from the divine standpoint in our moments of rapt worship, moments in which we rise above ordinary conceptions and earthly relations, we relapse into our habitual moods and feel comfort in finding ourselves among the realities of the material world and embraced by the sweet relations of domestic and social life. But nevertheless, the difference between a life occasionally visited by the blessed vision of the All-in-all, and one to which such a vision is a stranger, is immense ; and notwithstanding the failures of ordinary devotees, a life in which the perpetual vision of all things in God and God in all things is a never failing light and the ordinary conceptions and relations of practical life only a system of unavoidable conventionalities, is by no means inconceivable. Whether or not such a life has ever been realised in flesh, it guides every earnest soul in all its struggles and aspirations, and is realised in every step it takes towards union with the All-holy.

(4) *Bhakti-yoga*, the offering of reverential worship to God. The author of the *Gi´ta´* is never tired of speaking of the great importance of reverential worship. Some of the forms in which it should be offered are, (1) contemplation of God's power, wisdom and goodness, (2) remembering him constantly with a devout heart, (3) conversing on him with

devout persons, (4) singing his praises with fellow-worshippers, and (5) doing all actions as his service.

The third section, which consists of the last six chapters of the book, and which, according to Sva´mi´ Madhusúdan, treats of *jnána*, the highest stage of spirituality, deals with the practical duties of life as much as with knowledge. The distinction of subject and object, already touched in the last section, is here drawn up more fully. It is not merely the objects of sense that belong to the objective world ; many subtle objects, including even thoughts and feelings,—in fact, all that can be made objects of reflection—are included in the class of *kshetras*, and the pure and transcendent intelligence that reveals objects is alone called the *Kshetrajna*. God himself, it is distinctly said, is the *Kshetrajna* or subject in all objects. The distinction of subject and object, again, pervades all things. All things present a union of subjective and objective aspects,—there being nothing which is purely subjective or purely objective. But because God is the objectivity of all objects and the subjectivity of all finite subjects, his infinitude, his transcendence of all limits, must never be forgotten ; he must be worshipped as *Purushottama*, the Supreme Person, transcending objects and higher than finite persons. These general principles of the Divine science being laid down, the *Gi´ta´* proceeds to a nice discrimination of the three fundamental qualities of Nature, *sattvam*, *rajas* and *tamas*, the principles of knowledge, action and ignorance, and taking these as fundamental categories, it reduces all virtues, all duties, one may even say all objects whatever, into them. *Sattvam*, *rajas* and *tamas* are, in this comprehensive view of things, only different names for *good*, *middling* and *bad*, and according as the author places an action or a trait of character in the one or the other class, it is seen what value he attaches to it in his estimate of the ideals, aspirations and disciplines of spiritual life.

With this trichotomy of moral distinctions, and in some instances, with the dichotomy of *daiví* and *ásurí* (*sampat*), he estimates the value of the various classes of meats, sacrifices, penances, charities, knowledge, actions, agents, intelligence, attention and happiness that exist in the world. The things which he pronounces *sáttvika* from one standpoint and *daiví* from another, must be understood as the things that are favourable to and in harmony with the highest spirituality, We need not enter into the details given by the author. We shall close by extracting the brief description, in the last chapter of the *Gítá*, of a truly wise life :—

"He who, abandoning egotism, stubbornness, arrogance, desire, anger, and all belongings, has no thought that this or that is mine, and who is tranquil, becomes fit for assimilation with Brahman, and, with a tranquil self, he grieves not, desires not ; but being alike to all beings, obtains the highest devotion to me (God). By that devotion he truly understands who I am and how great. And then, understanding me truly, he enters into me. Always performing all duties with a sense of dependence on me, he, through my favour, obtains the imperishable and eternal seat."

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

২৫শ শ্লোক। সেইজন্য, যেরূপ বলা হইল আত্মাকে সেইরূপ জানিয়া, "আমি ইহাদিগের হত্যাকারী, আমাকর্ত্তৃক ইহারা হত হইতেছেন" এরূপ শোক করা তোমার উচিত নহে।

২৬শ শ্লোক। আত্মার অনিত্যত্ব স্বীকার করিয়া "অথচৈনম্" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইতেছে। এখানে "অথচ" স্বীকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তুমি যদি প্রকরণোক্ত এই আত্মাকে নিত্যজাত মনে কর, অর্থাৎ লৌকিক মত অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক দেহের জন্মের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ জাত, এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে তাহাকে নিত্য মৃত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও, যে আত্মা অনিত্য, হে মহাবাহো, তাহার বিষয়ে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যে জন্মে তাহার বিনাশ, এবং যে বিনষ্ট হয় তাহার জন্ম, এই উভয়ই অবশ্যম্ভাবী।

২৭শ শ্লোক। এইরূপ যদি হয় তবে "জাতস্য" ইত্যাদি। জাত ব্যক্তির পক্ষে মরণ ধ্রুব অর্থাৎ অবধারিত, আবার মৃত ব্যক্তির জন্মও ধ্রুব, সুতরাং অপরিহার্য্য যে এই জন্মমরণরূপ বিষয়, সেই অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে।

২৮শ শ্লোক। কার্য্যকারণ-সংঘাতাত্মক অর্থাৎ কার্য্যকারণ-সমাবেশে উৎপন্ন যে এই ভূত সকল, ইহাদের সম্বন্ধেও তোমার শোক করা যুক্ত নহে, যেহেতু 'অব্যক্তাদীনি' ইত্যাদি। 'অব্যক্তাদি' অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত, অদর্শন বা অনুপলব্ধি আদি যাহাদিগের এমন যে কার্য্যকারণ-সংঘাতাত্মক পুত্রমিত্রাদিরূপ ভূতসমূহ, তাহারা অব্যক্তাদি। এবং যাহারা উৎপন্ন হইয়া মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'ব্যক্তমধ্য' (অর্থাৎ মধ্য সময়ে ব্যক্ত) পুনরায় অব্যক্ত ভাব, অদর্শন, নিধন অর্থাৎ মরণও যাহাদিগের, তাহারা 'অব্যক্ত নিধন,' অর্থাৎ মরণের পরও তাহারা অব্যক্তত্বই লাভ করে, এই অর্থ। আর, এই বিষয়ে উক্ত আছে, "অদর্শন হইতে আসিয়াছে, পুনঃ

অদর্শনেই গিয়াছে, সে তোমার নয়, তুমি তাহার নও, অনর্থক কেন শোক কর।" সে বিষয়ে আর কি পরিদেবনা? যাহা পূর্ব্বে অদৃষ্ট ছিল, পরে দৃষ্ট হইয়াছে, পুনরায় অদৃষ্ট হইবে, এরূপ ভ্রমজাত বিষয়সমূহে পরিদেবনা, অর্থাৎ প্রলাপ অনর্থক।

২৯শ শ্লোক। প্রকরণোক্ত এই আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়। সর্ব্ব সাধারণের যাহাতে ভ্রান্তি হয়, তাহার জন্য একা তোমাকে দোষ দিয়া কি হইবে? এই আত্মা কেন দুর্ব্বিজ্ঞেয় তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, "আশ্চর্য্যবৎ" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ আশ্চর্য্য, অদৃষ্ট, হঠাৎ লোক চক্ষুর সম্মুখে আগত; কেহ কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ সেইরূপ আশ্চর্য্যের ন্যায় দেখেন। তদ্রূপ অন্য কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন। এবং অন্য কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। শুনিয়া, দেখিয়া, বলিয়াও কেহ কেহ আত্মাকে জানেন না। অথবা, যিনি আত্মাকে দেখেন তিনি আশ্চর্য্যতুল্য, যিনি আত্মার কথা বলেন বা শ্রবণ করেন তিনি অনেক সহস্রের মধ্যে এক জন (অর্থাৎ অতি বিরল), অতএব আত্মা দুর্ব্বোধ্য, এই অভিপ্রায়।

৩০শ শ্লোক। এখন প্রকরণোক্ত বিষয় উপসংহার করিয়া বলিতেছেন, "দেহী" ইত্যাদি। যেহেতু দেহী, শরীরী মানুষ নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব হেতু নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই অবধ্য, অতএব সকলের দেহে অর্থাৎ শরীরে এই আত্মা অবধ্য। সকলের বলার তাৎপর্য্য এই যে তিনি সর্ব্বগত। যেহেতু স্থাবরাদি সকল ভূতে অবস্থিত হইয়াও সকল দেহের বিনাশ হইলেও এই দেহী বধ্য নহেন, অতএব ভীষ্মাদি ভূতসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তোমার শোক করা উচিত নহে।

৩১শ শ্লোক। এখানে পরমার্থ তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিলে যে শোক কিম্বা মোহ সম্ভব নহে, তাহাই উক্ত হইয়াছে, পরমার্থ তত্ত্বের দিক্ হইতেই কেবল নয়, কিন্তু "স্বধর্ম্মম্" ইত্যাদি। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, সে দিক হইতে বিচার করিলেও তোমার বিকম্পিত অর্থাৎ বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অভিপ্রায় এই যে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হেতু, আত্মস্বাভাব্য হেতু, তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে। আর সেই ধর্ম্মযুদ্ধ পৃথিবীজয় দ্বারা ধর্ম্মার্থ ও প্রজারক্ষণার্থ। যাহা ধর্ম্ম হইতে

বিচ্যুত নহে তাই ধর্ম্ম্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিকতর শ্রেয় আর কিছু নাই। 'হি' অর্থ যেহেতু।

৩২শ শ্লোক। কি হেতু সেই যুদ্ধ কর্ত্তব্য? সেই হেতু বলা হইতেছে "যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদি। আর 'যদৃচ্ছয়া' বিনা প্রার্থনায়, 'উপপন্ন' আগত, 'অপাবৃত' উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বার। যে ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হন, হে পার্থ, তাহারা কি সুখী নহেন?

৩৩শ শ্লোক। এইরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত (যুদ্ধ)ও, এই ভাবে "অথ" ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন। যদি তুমি এইরূপ 'ধর্ম্ম্য' অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অচ্যুত বিহিত 'সংগ্রাম' অর্থাৎ যুদ্ধ না কর, তবে, অর্থাৎ এই কর্ম্ম না করাতে, তুমি স্বধর্ম্ম এবং মহাদেবাদির সমাগমজনিত কীর্ত্তি বিনাশ (অর্থাৎ পরিত্যাগ) করিয়া কেবল পাপই প্রাপ্ত হইবে।

৩৪শ শ্লোক। কেবল যে তোমার স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি নষ্ট হইবে তাহা নহে, কিন্তু "অকীর্ত্তিম্" ইত্যাদি। যাঁহারা যুদ্ধে আসিয়াছেন তাঁহারা তোমার 'অব্যয়' অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী অকীর্ত্তিও ঘোষণা করিবে। আর 'ধর্ম্মাত্মা', 'শূর' ইত্যাদি গুণের দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক। অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

৩৫শ শ্লোক। আরো, "ভয়াৎ" ইত্যাদি। দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথগণ তোমাকে, কৃপাপরবশ হইয়া নহে, কিন্তু কর্ণাদির ভয় হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছ বলিয়া মনে করিবে। কাহারা মনে করিবে? তাহা বলিতেছেন,—যে দুর্য্যোধন প্রভৃতির নিকট 'বহুমত' অর্থাৎ 'ইনি বহু গুণযুক্ত' এইরূপে সম্মানিত হইয়া তুমি পুনরায় ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইবে।

৩৬শ শ্লোক। আরো "অবাচ্যবাদান্" ইত্যাদি। তোমার শত্রুরা তোমার নিভৃত কবচাদি যুদ্ধনিমিত্ত সামর্থ্যের কুৎসা করিয়া অনেক প্রকার অবক্তব্য বাক্য বলিবে। সেই নিন্দাপ্রাপ্তির দুঃখ অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই নাই।

৩৭শ শ্লোক। পক্ষান্তরে কর্ণাদির সঙ্গে যুদ্ধ করিলে কি হইবে, "হতো বা" ইত্যাদি। যদি হত হও তবে স্বর্গ লাভ হইবে, কর্ণাদি যোদ্ধাদিগকে জয় করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে। উভয়েই তোমার লাভ, ইহাই অভিপ্রায়। যখন

এইরূপ, তখন হে কুন্তীনন্দন, হয় শত্রুদিগকে জয় করিব না হয় নিজে মরিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যুদ্ধের জন্য মন স্থির করতঃ উত্থান কর, ইহাই অর্থ।

৩৮শ শ্লোক। "যুদ্ধ আমার স্বধর্ম্ম" এই ভাবে যিনি যুদ্ধ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই উপদেশ শ্রবণ কর। "সুখে দুঃখে" ইত্যাদি। সুখ দুঃখ তুল্য মনে করিয়া, রাগ দ্বেষ না করিয়া, লাভ অলাভ জয় অজয় সমান বোধ করিয়া তৎপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ যুদ্ধ করিলে তুমি পাপফলভাগী হইবে না। এই উপদেশ প্রাসঙ্গিক।

৩৯শ শ্লোক। শোক মোহ অপনোদনার্থ 'স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য' (স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা লৌকিক যুক্তির কথাই বলা হইয়াছে, প্রকৃত কথা বলা হয় নাই। পরমার্থ দর্শনই এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে এবং সেই উক্তিই "এষা তেঽভিহিতা" ইত্যাদি দ্বারা উপসংহার করা হইতেছে। শাস্ত্রবিষয়বিভাগ প্রদর্শনার্থ এখানেই তাহা দেখান হইতেছে, পরে এই বিষয়ে 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্' (জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের, কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের) এই দুই নিষ্ঠাবিষয়ক শাস্ত্র সহজেই প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং শ্রোতারাও বিষয়বিভাগের দ্বারা সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে, সেই জন্য বলিতেছেন "এষা তে" ইত্যাদি। তোমাকে সাংখ্যে অর্থাৎ পরমার্থ বস্তুবিবেক-বিষয়ে সাক্ষাৎ শোক মোহাদি সংসারদোষের নিবৃত্তির কারণ স্বরূপ এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান বলা হইল, এখন ঐ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়ভূত কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য হইয়া সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মযোগ কর্ম্মানুষ্ঠানের বা সমাধিযোগ বিষয়ে যে বুদ্ধি পরে উক্ত হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। প্ররোচনার জন্য সেই বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন :—হে পার্থ যে যোগবিষয়া বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞান লাভ করতঃ তুমি কর্ম্মবন্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক বন্ধন ছেদন করিবে, ইহাই অভিপ্রায়।

৪০শ শ্লোক। অন্য আর কি "নেহাভি" ইত্যাদি। এই কর্ম্মযোগরূপ মোক্ষমার্গে অভিক্রমনাশ অর্থাৎ প্রারম্ভের নাশ নাই। যেমন কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না যে তাহার আরম্ভের ফল নিশ্চয়ই হইবে, ইহাই অর্থ। আর চিকিৎসার ন্যায় প্রত্যবায়ও নাই। কিন্তু এই যোগধর্ম্ম অল্প-

মাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে ইহা জন্মমরণাদিরূপ মহা সংসারভয় হইতে ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করে।

৪১শ শ্লোক। এই যে সাংখ্য বিষয়ে বুদ্ধির কথা বলা হইল, এবং যোগ বিষয়ে যে বুদ্ধির কথা বলা হইবে, .সেই বুদ্ধি "ব্যবসায়া" ইত্যাদি। হে কুরুনন্দন, এখানে অর্থাৎ শ্রেয়োমার্গে সম্যক্ প্রমাণ জনিতা বলিয়া বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়স্বভাবা এবং একই, অন্য বহুশাখাযুক্ত বিপরীত বুদ্ধির বিনাশকারিণী। পক্ষান্তরে অন্য যে বুদ্ধিসমূহ, যাহাদের শাখা সকল বিষয়ে প্রসারিত হওয়াতে অনন্ত, অপার, অনুপরত সংসার নিত্যই বিস্তৃত হয়, এবং যে সকল অনন্ত ভেদবুদ্ধি প্রমাণজনিত বিবেক বুদ্ধিরূপ নিমিত্ত বশতঃ সংসার উপরত হয়, সেই সকল বুদ্ধি বহু শাখা অর্থাৎ বহু ভেদযুক্ত,—প্রতি শাখা ভেদে অনন্ত এই সকল বুদ্ধি কাহাদিগের? না, অব্যবসায়ীদিগের, অর্থাৎ প্রমাণজনিত বিবেক বুদ্ধি-বিহীন ব্যক্তিদিগের।

৪২শ ও ৪৩ শ্লোক। যাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নাই তাহাদের "যামিমাম্" ইত্যাদি। বক্ষ্যমাণ, পুষ্পিতবৃক্ষের ন্যায় শোভমান, শ্রবণরমণীয় বাক্য বলিয়া থাকে। কাহারা? অল্পমেধা অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিরা। "বেদবাদরতা" ইত্যাদি বহু অর্থবাদ এবং সাধন প্রকাশক বেদবাক্যে রত। হে পার্থ, স্বর্গ পশ্বাদি ফল সাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এরূপ যাহারা বলিয়া থাকে। এবং তাহারা "কামাত্মানঃ" ইত্যাদি। কামাত্মা অর্থাৎ কামস্বভাব, কামপর। স্বর্গই পর অর্থাৎ পুরুষার্থ যাহাদিগের তাহারা স্বর্গপর অর্থাৎ স্বর্গপ্রধান। কর্ম্মের ফল কর্ম্মফল, জন্মই কর্ম্মের ফল, জন্মকর্ম্মফল, তাহা প্রদান করে এই অর্থে জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ, সেই বাক্য বলে ইহার সঙ্গে অন্বয়। ক্রিয়া সমূহের বিশেষ ক্রিয়াবিশেষ, তাহা বহুল অর্থাৎ বেশী যে সকল বাক্যের মধ্যে সেই সকল বাক্যকে, অর্থাৎ স্বর্গপশুপুত্রাদি বিষয় যে বাক্যের দ্বারা বিশেষভাব প্রকাশিত হয়, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য গতি, তাহার সাধনভূত যে সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, তাহার বহুল অর্থাৎ অধিক পরিমাণ যাহাতে সেইরূপ বাক্যকথনশীল ব্যক্তিরা মূঢ় অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ আইসে।

৪৪শ শ্লোক। এবং তাহাদিগের "ভোগ" ইত্যাদি। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যই করণীয়, এইরূপে ভোগৈশ্বর্য্যপ্রবল অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্যই যাহাদের আত্মভূত এই-

রূপ ব্যক্তিদিগের সেই ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে বিবেক ও প্রজ্ঞা যাহাদের, এইরূপ ব্যক্তিদিগের সাংখ্য ও যোগ বিষয় যে বুদ্ধি তাহা সমাধিতে অর্থাৎ পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত সকল সমাহিত হয় যাহাতে সেই অন্তঃকরণে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না।

৪৫শ শ্লোক। যাহারা এইরূপ বিবেক বুদ্ধি রহিত কামপর, তাহাদের যে ফল তাহা বলিতেছেন, "ত্রৈগুণ্য" ইত্যাদি। সংসারই যাহাদের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশের বস্তু সেই বেদসমূহ ত্রৈগুণ্য বিষয়, কিন্তু, হে অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ নিষ্কাম হও। সুখ দুঃখের কারণভূত নিজ ও পরপক্ষ এইরূপ যে পদার্থ ইহারাই দ্বন্দ্বশব্দবাচ্য, তাহা হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ দ্বন্দ্বশূন্য হও। তুমি সদা সত্ত্বস্থ অর্থাৎ সত্ত্বগুণান্বিত হও। অপ্রাপ্ত বস্তুর উপার্জ্জন যোগ, উপার্জ্জিত বস্তুর রক্ষণ ক্ষেম, এই যোগক্ষেম লইয়া যিনি ব্যস্ত, শ্রেয়ো-মার্গে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অতি দুষ্কর, অতএব যোগক্ষেমরহিত হও, আত্মকাম ও অপ্রমত্ত হও, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী তোমার প্রতি এই উপদেশ।

৪৬শ শ্লোক। সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মে যে সমস্ত অনন্তফলের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা যদি প্রার্থনীয় না হয় তবে ঈশ্বরোদ্দেশে সে সমস্ত অনুষ্ঠিত হইবে কেন? ইহা যদি বলা হয়, তবে শুন "যাবান্" ইত্যাদি। যেমন এই সংসারে কূপতড়াগাদি অনেক প্রকার সীমাবদ্ধ জলাশয়ে যে পরিমাণ স্নান পানাদি কার্য্যরূপ প্রয়োজন সে সমস্ত কার্য্য সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলেও সেই পরিমাণে সম্পাদিত হয় অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভূত হয়, এরূপ সর্ব্বপ্রকার বেদোক্ত কর্ম্মে যে কর্ম্মফল, সে প্রয়োজন পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর যে প্রয়োজন অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানের যে ফল,—যাহা সর্ব্বত্র জলপ্লাবন স্থানীয়,—সম্পাদিত হয় অর্থাৎ তাহার অন্তর্ভূত হইয়া যায়। *

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্" (সকল কর্ম্ম সমূহ) ইত্যাদিও বলিবেন। সেই জন্য জ্ঞাননিষ্ঠারূপ অধিকার পাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কূপতড়াগাদি স্থানীয় যে কর্ম্ম, তাহা করা কর্ত্তব্য।

৪৭শ শ্লোক। এবং তোমার "কর্ম্মণি" ইত্যাদি। তোমার কর্ম্মেই অধি-

---

* এই সংখ্যার পরিশিষ্ট দেখুন।

কার, জ্ঞাননিষ্ঠায় নহে। এবং কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তোমার ফলে অধিকার না হউক্, অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমার কর্ম্মফলে তৃষ্ণা না হউক। যখন তোমার কর্ম্মফলে তৃষ্ণা হইবে, তখন তুমি কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ হইবে, অতএব তুমি কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণভূত হইও না। যখন মানুষ কর্ম্মফল তৃষ্ণাপ্রযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে কর্ম্মফলেরই উৎপত্তির কারণ হয়। "যদি কর্ম্মফল ঈপ্সিত না হয়, তবে দুঃখপূর্ণ কর্ম্মের প্রয়োজন কি ?" ইহা মনে করিয়া তোমার অকর্ম্মে সঙ্গ না হউক অর্থাৎ অকরণে প্রীতি না হউক।

৪৮শ শ্লোক। যদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে কিরূপ করা কর্ত্তব্য ইহা বলিতেছেন,—"যোগস্থঃ" ইত্যাদি। হে ধনঞ্জয়, কেবল ঈশ্বরার্থে যোগস্থ হইয়া, 'তাহাতেও ঈশ্বর আমার প্রতি তুষ্ট হউন' এইরূপে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম কর। ফলতৃষ্ণাশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে সত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞান প্রাপ্তিরূপ যে সিদ্ধি এবং জ্ঞান অপ্রাপ্তিজনিতা যে অসিদ্ধি, এই দুই সম্বন্ধেই তুল্য হইয়া কর্ম্ম কর। সেই যোগ কি যাহাতে স্থিত হইয়া "কর্ম্ম কর" ইহা উক্ত হইয়াছে ? তাহা এই—সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে যে সমতা তাহাকেই যোগ বলা হয়।

৪৯শ শ্লোক। আর যে ঈশ্বরারাধনার্থে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই কর্ম্ম হইতে "দূরেণ" ইত্যাদি। হে ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জন্মমরণাদির হেতু বলিয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম হইতে উৎকট অর্থাৎ অত্যন্তরূপে অধম অপকৃষ্ট। যেহেতু এইরূপ, সেই জন্য যোগবিষয়িণী বুদ্ধিতে অথবা তাহার পরিপকতা জাত সাংখ্য বুদ্ধিতে অভয় প্রাপ্তির কারণ রূপ আশ্রয় প্রার্থনা কর, অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞানে শরণ লও। যেহেতু অশ্রেষ্ঠ কর্ম্মকারিগণ তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া দীন অর্থাৎ কৃপাপাত্র হয়। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "হে গার্গি এই অক্ষরকে না জানিয়া যে এই লোক হইতে গমন করে সে কৃপাপাত্র।"

৫০শ শ্লোক। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া যায় তাহা শ্রবণ কর, "বুদ্ধি" ইত্যাদি। বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সমত্বকর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত, যেহেতু এরূপ ব্যক্তি সত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ উপায় দ্বারা ইহলোকে পাপপুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করে, সেই জন্য সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগে

যুক্ত হও, যেহেতু যোগ কর্ম্মবিষয়ে কৌশল। ঈশ্বরার্পিতচিত্ততার দ্বারা স্বধর্ম্ম-নামক কর্ম্মে বর্ত্তমান ব্যক্তির সিদ্ধ্যসিদ্ধিবিষয়ে যে সমত্ববুদ্ধি, তাহাই কৌশল। যেহেতু বন্ধনস্বভাবাত্মক কর্ম্মসমূহও সমত্ববুদ্ধি দ্বারা স্বভাবতঃই নিবর্ত্তিত হয়, সেই জন্য তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হও।

৫১ শ্লোক। যেহেতু "কর্ম্মজম্" ইত্যাদি। "কর্ম্মজং" (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন) "ফলং ত্যক্ত্বা" (ফল পরিত্যাগ করিয়া) এই দূরবর্ত্তী পদের সঙ্গে সম্বন্ধ। ভাল মন্দ দেহলাভ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ফল। সেইজন্য সমত্ববুদ্ধি-যুক্ত সাধুগণ ফল পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, জন্মই বন্ধ জন্মবন্ধ, তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত,—জীবিত অবস্থাতেই জন্মবন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর ভোগনামক সর্ব্বোপদ্রবরহিত পরম পদ প্রাপ্ত হন, ইহাই অর্থ। অথবা "বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" এখান হইতে আরম্ভ করিয়া পরমার্থদর্শনরূপ সর্ব্বত্র সম্প্লুতোদকস্থানীয় কর্ম্মযোগ হইতে উৎপন্ন সত্ত্বশুদ্ধি দর্শিত হইয়াছে, কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এই সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারাই প্রত্যক্ষরূপে সুকৃতদুষ্কৃতের বিনাশ হয়।

৫২ শ্লোক। যোগানুষ্ঠানজনিত সত্ত্বশুদ্ধি হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি কখন পাওয়া যাইবে তাহা বলা হইতেছে, "যদা" ইত্যাদি। যে সময়ে তোমার বুদ্ধি মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য অর্থাৎ মলিনতা যাহা আত্মানাত্ম-বিবেক বোধকে মলিন করিয়া বিষয়ের প্রতি অন্তঃকরণকে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে অতিক্রম করিবে অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই সময়ে তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে। তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত তোমার সম্বন্ধে নিষ্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।

৫৩ শ্লোক। যদি বল, মোহকলিলদূরীকরণরূপ উপায় দ্বারা আত্ম-বিবেকোৎপন্নপ্রজ্ঞাপ্রাপ্ত আমি কখন কর্ম্মযোগোৎপন্ন ফল পরমার্থযোগ লাভ করিব? তবে তাহা শুন, "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ইত্যাদি। অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধ-প্রকাশক অধ্যাত্ম শাস্ত্রাতিরিক্ত অন্য প্রকার শাস্ত্রের শ্রবণ দ্বারা নানাত্ব প্রতিপন্ন অর্থাৎ বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ চাঞ্চল্য বর্জ্জিত হইয়া যে সময়ে সমাধিতে অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয় সেই আত্মাতে স্থিরীভূত এবং বিকল্পবর্জ্জিত হইবে সেই সময়ে বিবেকপ্রজ্ঞারূপ সমাধি প্রাপ্ত হইবে।

৫৪ শ্লোক। অর্জ্জুন প্রশ্নবীজ লাভ করিয়া লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিলেন, "স্থিতপ্রজ্ঞস্য" ইত্যাদি। হে কেশব, যাহার প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার "আমি পরব্রহ্ম" এই প্রজ্ঞা হইয়াছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ সামাধিতে স্থিত ব্যক্তির ভাষণ বচন কিরূপ? অন্য কর্ত্তৃক ইনি কিরূপে অভিহিত হয়েন? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ংই বা কিরূপ কথাবার্ত্তা বলেন, কিরূপে থাকেন, কিরূপ ব্যবহার করেন? অর্থাৎ তাঁহার ভাষণ ব্রজন কিরূপ?

৫৫ শ্লোক। এই শ্লোকের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতেছেন। যিনি প্রথম হইতেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া, এবং যিনি কর্ম্মযোগের দ্বারা, জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাতে প্রবৃত্ত, তাহাদের উভয়ের "স্থিতপ্রজ্ঞস্য" ইত্যাদি। "প্রজহাতি" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায়পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও সাধন উপদিষ্ট হইতেছে। কৃতকার্য্য হইবার যে সমস্ত লক্ষণ, অধ্যাত্ম শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই সমস্ত সাধনই উপদিষ্ট হয়। কেননা সে সমস্তই যত্নসাধ্য। যে সমস্ত সাধন-রূপ লক্ষণ যত্নসাধ্য শ্রীভগবান্ সেই সমস্ত "প্রজহাতি" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন। হে পার্থ, যে সময়ে সাধক মনে স্থিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ইচ্ছা-সমূহকে আত্যন্তিকরূপে পরিত্যাগ করেন—যদি বল সর্ব্বকাম পরিত্যাগ করিলে তুষ্টি লাভ হয় না এবং শরীর ধারণোপযোগী কামনাই তাহাদের অবশিষ্ট থাকে, ইহা বলিলেও উন্মত্তপ্রমত্তের ন্যায় প্রবৃত্তিই প্রাপ্ত হওয়া হয়, তবে তাহার এই উত্তর দেওয়া যাইতেছে। প্রত্যগাত্মস্বরূপ আত্মাতে স্বীয় আত্মা দ্বারাই পরমার্থদর্শনরূপ অমৃত রস লাভে তুষ্ট এবং বাহ্যলাভনিরপেক্ষ ব্যক্তি "আর কিছুতে প্রয়োজন নাই" এরূপ প্রত্যয়বান্ হইলে সেই জ্ঞানীকে তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় অর্থাৎ যাহার আত্মনাত্মবিবেকোৎপন্ন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, যিনি পুত্র, বিত্ত ও সংসার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আত্মারাম আত্মক্রীড় সন্ন্যাসীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

৫৬ শ্লোক। আরও "দুঃখেষু" ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখ উপস্থিত হইলেও যাহার মন বিশেষ ভাবে ক্ষুভিত অর্থাৎ বিচলিত হয় না, তিনি অনুদ্বিগ্নমনা। আর সুখ উপস্থিত হইলেও যিনি বিগতস্পৃহ থাকেন অর্থাৎ যাহার তৃষ্ণা দূরীভূত হইয়াছে। অগ্নির ন্যায় ইন্ধনাদি প্রদানেও যাহার সুখ বৃদ্ধি হয় না তিনি বিগতস্পৃহ। রাগ এবং ভয় এবং ক্রোধ রাগভয়ক্রোধ,

বিগত হইয়াছে রাগভয়ক্রোধ যাহা হইতে তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ, এরূপ সন্ন্যাসী তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।

৫৭ শ্লোক। আরও "যঃ সর্ব্বত্র" ইত্যাদি। যে মুনি দেহ, জীবন প্রভৃতি বিষয়ে মমতাবর্জ্জিত, সেই সেই বিষয়ের শুভ বা অশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না, দ্বেষও করেন না, অর্থাৎ শুভ প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হন না, হৃষ্ট হন না, অশুভ প্রাপ্ত হইয়া দ্বেষ করেন না, এইরূপ হর্ষবিষাদবর্জ্জিত ব্যক্তির বিবেকোৎপন্না প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়।

৫৮ শ্লোক। আরও "যদা সংহরতে" ইত্যাদি। এবং যখন জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত এই যোগী, কূর্ম্ম যেমন ভয়ে সর্ব্বত্র হইতে স্বীয় অঙ্গসমূহকে টানিয়া লয়, এইরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ।

৫৯ শ্লোক। বিষয় গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়সমূহ নিবৃত্ত হয়, যেমন কূর্ম্ম নিজ অঙ্গসমূহকে টানিয়া লয়; কিন্তু সেই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না, উহা কিরূপে সংহৃত হয়, তাহা বলা হইতেছে। "বিষয়া" ইত্যাদি। যদিও বিষয়াহরণে নিবৃত্ত কষ্টসাধ্য তপস্যায় নিযুক্ত মূর্খ ব্যক্তিরও বিষয়ের প্রতি যে লালসা তাহা ছাড়া বিষয়োপলক্ষিত বিষয়শব্দবাচ্য ইন্দ্রিয় সমূহ অথবা বিষয়সমূহই নিবৃত্ত হয়। "নিজ ইচ্ছাতে স্বীয় রসের দ্বারা প্রবৃত্ত রসিক রসজ্ঞ" ইত্যাদি বাক্য থাকাতে প্রমাণ হয় 'রস' শব্দ রাগার্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু ইহার রঞ্জনকারী সেই সূক্ষ্ম রসও পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া 'আমিই সেই' এইরূপ জ্ঞানে বর্ত্তমান ব্যক্তির নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান নির্বীজতা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌দর্শন না হইলে রসের উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং যাহাতে সম্যগ্‌দর্শন লাভ হয় এরূপ স্থৈর্য্যের জন্য যত্ন কর্ত্তব্য, ইহাই অভিপ্রায়।

৬০ শ্লোক। যিনি সম্যগ্‌দর্শনরূপ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে অগ্রে ইন্দ্রিয়দিগকে স্ববশে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু উহাদিগকে স্থাপন না করার দোষ বলিতেছেন,—"যততঃ" ইত্যাদি। হে কৌন্তেয়, যেহেতু যত্ন করিতেছে এমন মেধাবী পুরুষেরও—'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবী) এই পরবর্ত্তী পদের সঙ্গে 'পুরুষ' এই পদের সম্বন্ধ—প্রমথনশীল অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপকর ইন্দ্রিয়সমূহ

বিষয়াভিমুখ পুরুষকে বিক্ষুব্ধ করে, আকুলিত করে, এবং আকুলিত করিয়া যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তির বিবেকবিজ্ঞানযুক্ত মনকে বলের সহিত প্রকাশ্যেই হরণ করে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়বশীকরণ আবশ্যক।

৬১ শ্লোক। "তানি" ইত্যাদি। সেই সকলকে সংযমিত বশীভূত করিয়া সমাহিত সন্ন্যাসী 'মৎপর' অর্থাৎ এই সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্মা বাসুদেব যাহার পক্ষে পর, শ্রেষ্ঠ, তিনি 'আমি তাহা হইতে অন্য নহি' এরূপ ভাবে অবস্থিতি করিবেন; কারণ এরূপ ভাবে অবস্থিত যে যতির বশে অভ্যাস প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থিতি করে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

৬২ শ্লোক। এখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যে ব্যক্তি পরাভূত হইবে তাহার সর্ব্বানর্থের মূল কথিত হইতেছে, "ধ্যায়তঃ" ইত্যাদি। শব্দাদি বিষয় সমূহের চিন্তাকারী, আলোচনাকারী পুরুষের সেই বিষয়সমূহে আসক্তি প্রীতি উৎপন্ন হয়, কোন প্রকারে প্রতিহত হইলে সেই কাম হইতে ক্রোধ জন্মে।

৬৩ শ্লোক। ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, 'সম্মোহ' অবিবেক, কার্য্যাকার্য্য বিষয়বিভ্রম জন্মে, এই অন্বয়। কারণ, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হইয়া গুরুর প্রতিও কোপ করে, সম্মোহ হইতে সেই স্মৃতির ভ্রংশ হয় যাহা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে সঞ্চিত সংস্কার হইতে জন্মে; স্মৃতি উৎপন্ন হইবার কারণ বর্ত্তমান সত্বেও স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। তারপর, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ; কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অন্তঃকরণের বিচারশক্তির অসমর্থতাকে বুদ্ধিনাশ বলে। বুদ্ধিনাশে নাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ ততক্ষণ পর্য্যন্তই পুরুষ প্রকৃতপক্ষে পুরুষ, যতক্ষণ তাহার অন্তঃকরণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ, তাহাতে অসমর্থ হইলে পুরুষ নষ্টই হয়, অতএব তাহার অন্তঃকরণের বুদ্ধির নাশে সে প্রণষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

৬৪ শ্লোক। বিষয়চিন্তা সকল অনর্থের মূল বলিয়া কথিত হইল, এখন এই মোক্ষ কারণ উক্ত হইতেছে, "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি। রাগ এবং দ্বেষ রাগদ্বেষ, তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক; তদ্বিষয়ে যিনি মুমুক্ষু হন তিনি তাহাদিগের হইতে বিমুক্ত (অর্থাৎ রাগদ্বেষবিযুক্ত) আত্মার বশ্য বশীভূত, তাহাদিগের হইতে মুক্ত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবর্জ্জনীয় বিষয়সমূহ অনুভব করতঃ, ইচ্ছানুসারে বিধেয় (বশীকরণীয়) আত্মা

অন্তঃকরণ যাহার তিনি প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন। 'প্রসাদ' অর্থ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য।

৬৫ শ্লোক। প্রসন্নতা হইলে কি হয় তাহা বলা হইতেছে, "প্রসাদে" ইত্যাদি। প্রসন্নতা লাভে এই যতির আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখের বিনাশ হয়। আরও, যেহেতু স্বচ্ছান্তঃকরণ ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্র আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিত হয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিশ্চল হয়। যেহেতু স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির কৃতকৃত্যতা এইরূপ সেইজন্য যোগী রাগদ্বেষবিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা শাস্ত্রসম্মত অবর্জ্জনীয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই ব্যাক্যার্থ।

৬৬ শ্লোক। সেই প্রসন্নতার প্রশংসা করা হইতেছে, "নাস্তি" ইত্যাদি। অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মস্বরূপবিষয়িণী বুদ্ধি নাই অর্থাৎ হয় না, এবং অযুক্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই; এবং আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে অভিনিবেশ করে না তাহার উপশম (আরাম) নাই, অশান্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? কারণ বিষয়সেবার তৃষ্ণা হইতে ইন্দ্রিয়গণের যে নিবৃত্তি তাহাই সুখ, বিষয়বিষয়িণী তৃষ্ণা সুখ নহে, সে তৃষ্ণা কেবল দুঃখই, অর্থাৎ তৃষ্ণা থাকিলে সুখের গন্ধ মাত্রও উৎপন্ন হয় না।

৬৭ শ্লোক। কিজন্য অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই তাহা বলা হইতেছে, "ইন্দ্রিয়ানাম্" ইত্যাদি। কারণ যে মন স্বীয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের অনুসরণ করে, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের কল্পনায় প্রবৃত্ত সেই মন এই যতির আত্মানাত্মবিবেকোৎপন্ন প্রজ্ঞা বিনাশ করে। কিরূপে? বায়ু যেমন জলপথ-গমনেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের নৌকাকে মার্গচ্যুত করিয়া উন্মার্গে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া মনোবিষয়িণী কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়।

৬৮ শ্লোক। "যততো হি" ইত্যাদি শ্লোকে উপন্যস্ত বিষয়ের অনেক প্রকার মীমাংসা বলিয়া এবং সেই বিষয়কে প্রমাণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন, "তস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তিতে দোষ প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য, হে মহাবাহো! যে যতির ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল হইতে মানসাদি সর্ব্ব প্রকার ভেদদ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

রামমোহনরায়-চতুষ্পাঠ্যাঃ কস্যচিচ্ছাত্রস্য।

মহাত্মা রামানুজকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের

বঙ্গানুবাদ।

১৮শ শ্লোক। বিনাশিত্বই যে দেহ সকলের স্বভাব, ইহা উক্ত হইতেছে। উপচয়রূপ এই দেহ সকল অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ বিনাশস্বভাব। যেহেতু উপচয়াপচয়াত্মক ঘটাদি অন্তশীল বলিয়া দৃষ্ট হয়। নিত্য শরীরী আত্মার কর্ম্মফলভোগ হেতু যে ভূতসমষ্টিরূপ দেহ হয় তাহা পুণ্যগত, 'পুণ্যেরদ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়' ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মাবসানে এই সকল দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আত্মাকে অবিনাশী বলিবার হেতু কি? তাহার অপ্রমেয়ত্ব বা অপ্রমাণ-নিরূপত্ব। নিশ্চয়ই আত্মা প্রমেয়রূপে উপলব্ধ হয় না, কিন্তু প্রমাতৃরূপে উপলব্ধ হয়। এই বিষয়ে পরে বলা হইবে—

"এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

আর, অনেক উপচয়াত্মক বলিয়া যে আত্মা উপলব্ধ হয় তাহা নহে। সর্ব্বত্র দেহে 'আমি ইহা জানিতেছি' এইরূপে দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু প্রমাতৃত্ব রূপে উপলব্ধ হয়। আর, দেহাদির স্থান ভেদে প্রমাতার আকার ভেদ দেখা যায় না। অতএব একরূপ, অনুপচয়াত্মক, প্রমাতা ও ব্যাপক বলিয়া আত্মা নিত্য। কিন্তু দেহ উপচয়াত্মক দেহির কর্ম্মফল ভোগহেতু অনেক রূপ এবং ব্যাপ্য বলিয়া বিনাশশীল। সেই হেতু দেহ বিনাশ-স্বভাব বলিয়া এবং আত্মা নিত্যস্বভাব বলিয়া এই উভয়ই শোকের বিষয় নয়। যুদ্ধে নিজের এবং পরের শস্ত্রপাতাদি জাত যে সকল আঘাত অবর্জ্জনীয় তাহা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত নিষ্কাম যুদ্ধ নামক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

(১৯) যে এই উক্তস্বভাব আত্মাকে প্রতিহন্তা ও হননহেতু মনে করে, আর যে ইহাকে অন্য কোনও হেতু কর্ত্তৃক হত মনে করে, তাহাদের উভয়েই জানে না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আত্মা নিত্য বলিয়া ইহা হননের হেতু হয় না এবং এই যুক্তিতেই এই আত্মা হতও হয় না। হন্তি ধাতুর অর্থ আত্মার কর্ম্মরূপ শরীরের বিয়োগকরণ। "ন হিংস্যাদ্ভূতানি" "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন অবিহিত শরীরবিয়োগকরণ বিষয়ক।

(২০) আত্মা নিত্য ও অপরিণামী বলিয়া জন্মমরণাদি অচেতন দেহধর্ম্ম তাহাতে নাই, উক্ত হেতু সকলের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে। ইহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। যে জন্মমরণ সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলের দ্বারাই অনুভূত হইতেছে সেই জন্মমরণ কদাচ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা কল্পারম্ভে জন্মিয়া কল্পান্তে পুনরায় হইবে এরূপ নহে। আগম জ্ঞাতব্য প্রজাপতি প্রভৃতি দেহে কল্পাদিতে জন্ম ও কল্পান্তে মরণ আত্মাকে স্পর্শ করে না। এইজন্য সর্ব্ব দেহগত আত্মা অজ, আর এই কারণেই নিত্য, শাশ্বত, প্রকৃতির ন্যায় স্থূল সূক্ষ্ম পরিণামযুক্ত নহে। এই হেতু পুরাণ, আর পুরাণ হইলেও নূতন, সর্ব্বদা অপূর্ব্ববৎ অনুভাব্য। এইজন্য শরীর হত হইলেও এই আত্মা হত হয় না।

(২১) এইরূপে অবিনাশী, অজ ও অব্যয় বলিয়া এই নিত্য আত্মাকে যিনি জানেন তিনি দেব, মনুষ্য, স্থাবর শরীর সকলে অবস্থিত আত্মা সকলের মধ্যে কোন আত্মাকে কি প্রকারে হনন করান, অথবা তাহাকে কি প্রকারে হনন করেন, কিরূপেই বা নাশ করান অর্থাৎ নাশের প্রয়োজক হন। এই সকল আত্মাকে বিনাশ করাইব এবং বিনাশ করিব এইরূপ অনুশোচনা আত্মস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞানমূলক, ইহা বলাই অভিপ্রায়।

(২২) যদি বল নিত্য আত্মা সকলের শরীর বিশ্লেষ মাত্র হইলেও রমণীয় ভোগসাধনরূপ শরীরের বিয়োগ শোকের কারণ হয়, তবে বলি, ধর্ম্মযুদ্ধে শরীর ত্যাগকারীদিগের ত্যক্ত শরীর অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর শরীর প্রাপ্তি হয়, ইহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পরে নূতন বস্ত্র গ্রহণ যেমন হর্ষের কারণ, এ স্থলেও তাহাই বোধ হইতেছে।

(২৩।২৪) পুনরায় "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্" পূর্ব্বোক্ত অবিনাশিত্বকে সহজে বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দৃঢ় করা হইতেছে। শস্ত্র, অগ্নি, জল ও বায়ু আত্মাকে ছেদন, দহন, ক্লেদন ও শোষণ করিতে সমর্থ নয়। আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বতত্ত্বব্যাপী, তত্ত্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতরাং ঐ সকল তত্ত্বের দ্বারা অব্যাপ্য; যে ব্যাপ্য নহে তাহার ছেদন, দহন, ক্লেদন ও শোষণ করা অসম্ভব। অতএব এই আত্মা নিত্য, স্থির স্বভাব, অপ্রকম্প্য ও পুরাতন।